মানালীর মালঞ্চে

শঙ্কু মহারাজ

অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন, কলিকাতা ৯

MANALIR MALANCHEY

A Travelogue on Kulu Valley

By

SONCU MOHARAJ

Published by
Amar Sahitya Prakashan
7 Tamer Lane, Cal. 9



প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬৪

প্রকাশক :
এন. চক্রবর্তী
অমর সাহিত্য প্রকাশন
৭ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

আলোকচিত্র :
সুজয়া গুহ ও অসিত বসু

মানচিত্রের ব্লক :
দে'জ পাবলিশিং-এর সৌজন্যে

মুদ্রাকর :
শ্রীএককড়ি ভড়
নিউ শক্তি প্রেস
১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন
কলিকাতা ৬

এই লেখকের কয়েকখানি বই—

হিমতীর্থ-হিমাচল

তমসার তীরে তীরে

বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা

নীল দুর্গম

পঞ্চপ্রয়াগ

গহন-গিরি-কন্দরে

গিরি-কান্তার

গঙ্গাসাগর

কেঁদুলীর মেলায়

চতুরঙ্গীর-অঙ্গনে

মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজ, বন ও মহাবন পর্ব)

মন-দ্বারকায়

পুণ্যতীর্থ-প্রভাস

লীলাভূমি-লাহুল

রাজভূমি-রাজস্থান

অমরাবতী-আসাম

ও

পঞ্চবটী

কয়েক বছর আগে মণিমহেশ ও মানালী অর্থাৎ হিমাচলের চাম্বা ও কুলু উপত্যকার ওপরে 'উত্তরঙ্গা' দিশি' নামে একখানি বই লিখেছিলাম। প্রকাশক বললেন—মুদ্রণ ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বইখানি আর একখণ্ডে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কারণ তাহলে বইখানির দাম সাধারণ ক্রেতাদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। তাই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে আমাকে দুই উপত্যকার ওপরে দুখানি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদনা করে দিতে হল। চাম্বা উপত্যকার ওপরে রচিত 'হিমতীর্থ-হিমাচল' মাস তিনেক আগে প্রকাশিত হয়েছে। কুলু উপত্যকার ওপরে এই 'মানালীর মালঞ্চে' এবারে প্রকাশিত হল।

এই গ্রন্থে আমি রোতাং গিরিবর্ত্ম, বশিষ্ঠকুণ্ড, মানালী, নাগর, কুলু, বজৌরা, মণিকরণ ও যোগীন্দর-নগর পরিক্রমার কথা বলেছি। বলেছি বৈজনাথ, কাংড়া ও জালামুখীর কথা। বলেছি গাড়োয়ালের সুদুর্গম শৃঙ্গ মানা (২৩,৮৬০') আরোহণের কাহিনী।

হিমাচল প্রদেশের এই অংশটি হিমালয়ের সবচেয়ে সুন্দর ও বৈচিত্র্যময় অঞ্চলের অন্যতম। প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক এই অঞ্চলে ভ্রমণে যান। তাঁদের প্রয়োজনে নতুন মানচিত্র, আলোকচিত্র ও দিনপঞ্জী সন্নিবেশিত করা হল। বইখানি ভ্রমণ-পিপাসু পাঠক-পাঠিকার তৃষ্ণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করলে, আমার সকল শ্রম সফল হবে। ইতি—

লেখক



ভয়ঙ্কর ও সুন্দর রোতাং

রাজবাড়ির বারান্দা থেকে নাগর

কার কথা বলব? আমার, মানসীর, না হিমাচলের?

আমার কথা থাক। মানসীর কথা দিয়েই শুরু করা যাক। আর তার কথা বললে যে হিমাচলের কথাও বলা হবে। আমার কাছে মানসী আর হিমাচল এক হয়ে আছে।

মানসী হাসে। কিন্তু এ হাসি যেন কান্নারই রূপান্তর। এমন করুণ হাসি বড় বেশি দেখি নি। আমি চুপ করে থাকি। মানসী কথা বলে, 'কি হবে আমার কথা শুনে? তার চেয়ে হিমাচলের কাহিনী বলুন।'

'হিমাচলের কাহিনী তো যে-কোন জায়গায়, যে-কোন সময় শোনাতে পারব। কিন্তু আপনার কথা শোনার সময় ও সুযোগ হয়তো আর নাও পেতে পারি।'

'না পেলেই বা দুঃখের কি? কত মানুষের কথাই তো আপনার অজানা রয়ে গেল। না হয় আমি তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলাম।' একবার থামে মানসী। তার পরে কণ্ঠস্বরকে সহজ ও স্বাভাবিক করে বলে ওঠে, 'অযথা সময় নষ্ট করবেন না তো। এবারে আমার আর ওপরে যাওয়া হবে না। এখান থেকেই ফিরে যেতে হচ্ছে কলকাতায়। তাই শুনতে চাইছি হিমাচলের কাহিনী। শুনতে-চাইছি মণিমহেশ আর রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা।'

'ফিরে যাচ্ছেন কেন?' প্রশ্ন করি।

'আসার সময় বাবার শরীরটা ভাল দেখে আসি নি। কাল বাবাকে নিয়ে খারাপ স্বপ্ন দেখেছি। তার বুকের ব্যথাটা বেড়েছে, সে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই ভাবছি এখান থেকেই ফিরে যাব। এ সংসারে যে বাবা ছাড়া আমার আর কেউ নেই।' মানসী আবার হাসে। তেমনি করুণ হাসি।

আমি চুপ করে থাকি। নিঃশব্দে পথ চলি আর ভাবি মানসীর কথা। মাত্র কিছুক্ষণ আগে পরিচয় হয়েছে তার সঙ্গে। লাহুল উপত্যকা দেখে আজই বিকেলে ফিরে এসেছি মানালী। যাবার সময় ঠিক ছিল না ফিরে আসার দিন। তাই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে যেতে পারি নি। টুরিস্ট রিসেপশান অফিসার বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই তিনি আশ্রয়ের বন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু মানালী বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেখলাম—টুরিস্ট অফিস বন্ধ। বিস্মিত হয়েছিলাম, তখনও পাঁচটা বাজে নি। আমার অভিযোগের উত্তরে জনৈক ভদ্রলোক জানালেন, আজ রবিবার। লজ্জা পেলাম। হিমালয় পরিক্রমাকালে দিন ও তারিখ ঠিক থাকে না।

রিসেপশান অফিসারের সঙ্গে দেখা হল না। আশ্রয় মিলল না এখানে

টুরিস্ট-বাংলো ও টুরিস্ট-হাট্‌স ছাড়াও আছে ফরেস্ট ও সিভিল রেস্ট হাউস। কিন্তু সে দুটিতে বাস করার অনুমতি আনতে হয় কুলু থেকে। আর আছে দুটি হোটেল—সানসাইন অরচার্ড গেস্ট হাউস ও শো ভিউ হোটেল। প্রথমটি অতিশয় ব্যয়বহুল, দ্বিতীয়টিতে ঠাঁই নেই। তাই অসহায় অবস্থায় মালপত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বাসস্ট্যাণ্ডে। আর সেখানেই দেখা হল মানসীর সঙ্গে।

তখন কিন্তু বুঝতে পারি নি সে বাঙ্গালী। স্ল্যাক্‌স পরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল কয়েকটি পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে। কিন্তু ওরা আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিল, আমি নিরাশ্রয় পর্যটক। তাই ওরা আমার আছে এসে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কি টুরিস্ট ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় উঠবেন ?'

'তাই তো ভাবছি।' অবস্থাটা বললাম ওদের। ওরা বলল, 'কাল টুরিস্ট অফিস খুললে ঘর পেয়ে যাবেন। কিন্তু আজ রাতটা কোথায় কাটাবেন ?'

মানসী সহসা বলে উঠেছিল, 'আপনি ইচ্ছে হলে আমাদের সঙ্গে রাতটা কাটিয়ে দিতে পারেন।'

'কোথায় ?' আমি হালে পানি পাই।

'কাছেই। মানালী স্কুলের হলে। আমরা সেখানেই আছি।'

আমি সম্মত হয়ে গেলাম। নেই মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল। আর জায়গাটা না দেখে কানা-মামাই বা বলি কেমন করে ?

মানসীর সঙ্গীরা আমার মালপত্র ধরাধরি করে নিয়ে গিয়েছে মানালী স্কুলে। আমার প্রশ্নের উত্তরে একটি ছেলে জানিয়েছে, তারা সবাই চণ্ডীগড় কলেজের ছাত্র। হাইকিং করতে এসেছে। কাল রোতাং গিরিবর্ত্ম দেখতে যাবে।

কথায় কথায় একটি ছেলে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন ?'

'এখন লাহুল উপত্যকার সদর কেলং থেকে। এর আগে ডালহাউসী, খাজিয়ার ও চাম্বা হয়ে মণিমহেশ গিয়েছিলাম।'

'সে কথা নয়।' ছেলেটি বলেছিল, 'মানে আমি জানতে চাইছি আপনি কোথাকার লোক ?'

খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। চুল দাড়ি আর পোশাকের কৃপায় পরিচয় হারিয়ে গেছে। হেসে জবাব দিয়েছিলাম, 'কলকাতার।'

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বিস্মিত করে বাংলায় বলে উঠেছিল মানসী, 'আপনি বাঙ্গালী ?'

'হ্যা। আপনি ?'

'আমার নাম মানসী মুখোপাধ্যায।'

'আপনি কোথায থাকেন, চণ্ডীগড় ?'

'না। কলকাতায।'

'আপনি এদের সঙ্গে ?'

'আমিও আপনারই মতো এদের অতিথি। কাল বিকেলে এখানে এসে দেখি শনিবার বলে টুরিস্ট অফিস বন্ধ হযে গেছে। এইভাবেই ওরা আমাকেও পথ থেকে স্কুলে নিয়ে গেছে।'

'আপনার সঙ্গে আর কে কে আছেন ?'

'কেউ নেই। আমি একা। তাই একাই হিমালযের পথে বেড়িয়েছি।'

ওর কথা শুনে আমি কথার খেই হারিযে ফেলেছিলাম। তাই তখন আর কোন কথা বলতে পারি নি। তবে মানসীর কথা ভেবে বিস্মিত বোধ করেছিলাম। বযসে সে কলেজের ছেলেদের চেয়ে বড। তাকে দিদি বলেই ডাকছে। তবু সে সুন্দরী যুবতী। একটি বাঙ্গালী মেযে কেমন করে এতগুলো অপরিচিত পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে এভাবে অসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এক ঘরে রাত্রিবাস করছে !

বাসস্ট্যাণ্ডের অনতিদূরেই স্কুল। বেশ বড় বাড়ি। সারি সারি ঘর। দুদিকে বারান্দা। সামনে খেলার মাঠ। ছেলেরা ভলিবল খেলছিল।

সিঁড়ি দিযে বারান্দায় উঠেই ডান দিকে হলঘর। সেই ঘরে ঠাঁই নিয়েছে চণ্ডীগড় কলেজের ছেলেরা। ঘরের এক পাশে কয়েকখানি বেঞ্চি জড়ো করে রাখা হয়েছে। বাকি অংশে এক দিকের দেযাল ঘেঁষে ছেলেদের বিছানা। অপর দিকের মাঝামাঝি জায়গায় একটি মাত্র শয্যা। পাশেই একটা কালো ট্রাঙ্ক। ট্রাঙ্কের ওপরে আয়না চিরুনি ও প্রসাধন সামগ্রী। বিছানার ওপরে খানকয়েক শাড়ী ও মেয়েদের জামা ইত্যাদি। ওপাশে জলের বোতল ক্যামেরা ও একটি বৃহদায়তন লেডিজ ব্যাগ।

নিজের বিছানার পাশেই আমার মালপত্র নামাতে বলে মানসী। ছেলেরা হাসে। বলে, 'আজ আর দিদিকে পায় কে ? আজ সে নিজের জন পেয়ে গেছে। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না দিদি।'

'ভুলে তো যাই নি ভাই। কোনদিন ভুলতে পারব না তোমাদের। আর

কোট এসে সেদিনই ডালহাউসী আসি। সেখান থেকেই আমার এই হিমাচল পরিক্রমা আরম্ভ হয়েছে।"

মানসী বলে, "কিন্তু আপনার সঙ্গীরা কোথায়?"

"স্পিতি উপত্যকায়।"

"আপনি সেখানে না গিয়ে এখানে চলে এলেন কেন?"

"প্রত্যক্ষ কারণ অনেকগুলি আছে। তবে পরোক্ষ কারণ হয়ত নিয়তি।"

"মানে?"

"যদি বলি, আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার সৌভাগ্য হবে বলে!"

"বহুবচনের আড়ালে সত্যকে লুকোতে চাইছেন কেন?"

"পাছে আপনি আপত্তি করেন তাই।"

"ইস, বিনয়ের অবতার! যাক গে, ওসব বাজে কথা রেখে বলে ফেলুন তো আসল কারণটা।" মানসী যেন আদেশ করে।

হাসতে হাসতে বলি, "যাবার পথে নাগর, কুলু, মণিকরণ ও যোগীন্দর নগর দেখে পাঠানকোট ফিরব বলে আমি আর স্পিতি উপত্যকার সদর কাজা যাই নি। ওরা কাজা থেকে রাহালা হয়ে এখানে এসে সোজা পাঠানকোট চলে যাবে। সেখানেই ওদের সঙ্গে মিলিত হব আমি।"

"তাহলে আপনারা একসঙ্গেই কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন?" মানসী বলে।

"আপনি যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?"

"না।"

"কেন?"

"সেকথা না শুনে রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা বলুন, বাধিত হব।"

"তাহলে আমাকে শুরু করতে হয়।"

"বেশ তাই বলুন।" মানসী বলে।

অগত্যা আমাকে শুরু করতে হয়—

সেদিন সকাল দশটায় মানালী থেকে রাহালার বাস ছাড়ল। পুল পেরিয়ে বিপাশার অপর তীরে এলাম। পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র ও বশিষ্ঠকুণ্ড ছাড়িয়ে বাস চলল এগিয়ে। বিপাশা বয়ে চলেছে পথের পাশে পাশে। মানালীর পরে সে আরও সুন্দর, আরও উচ্ছল, আরও মুখর। নূপুর-কলিত ছন্দে সে অবিরাম চলেছে বয়ে।

হিমাচলের পুণ্যতোয়া বিপাশা। বিপাশা পাঞ্জাবের পঞ্চনদীর অন্যতমা। মাণ্ডি থেকে সে নেমে গেছে জ্বালামুখীর দক্ষিণে—নাদুয়ানে। তার পরে

পাঞ্জাবের সমতলভূমির ওপর দিয়ে প্রবাহিতা হয়ে খেমকরণের পূবে এন্দ্রিসার শতদ্রুর সঙ্গে মিশেছে—তার ২৯০ মাইল পরিক্রমা পূর্ণ করেছে।

বিপাশা যুগে যুগে দেশবিদেশে বহু নামে পরিচিতা। গ্রীকরা বলেন, হাইফাসিস বা হাইপানিস অথবা বিপাশিস। বৈদিক যুগে তাকে বলা হত বিপাশ। বেদাঙ্গ-গ্রন্থ নিরুক্তে বলা হয়েছে উরুঞ্জিরা। ঋগ্বেদের সাতটি নদীর অন্যতমা বিপাশা। তবে সেখানে একে বলা হয়েছে আর্যিকীয়। এখন সে বিয়াস নামেই পরিচিতা।

বিপাশ শব্দের অর্থ কূলবিপাতন অর্থাৎ যে নদী নিজেই নিজের কূল খনন করে, পথের বাধা দূরে সরিয়ে মুক্তধারায় পরিণত হয়।

বাসপথের বাঁয়ে বিপাশা, ডাইনে পাহাড় আর সামনে হিমতীর্থ হিমাচল। পাহাড়ের গায়ে নানা ধরনের রঙীন ফুল—বেগুনী ফুলই বেশি। এই ফুল দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা মদ তৈরী করে।

ফুল নয়, আমি বিপাশাকেই দেখছি বারে বারে আর ভাবছি স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের বর্ণনা—

'Beas cutting its way through sheer rock and forming a chasm two or three hundred feet deep·· foaming and tossing with tremendous force and impetus.'

স্যার ফ্রান্সিস মানালী থেকে পায়ে হেঁটে রাহালা গিয়েছিলেন। কিছুকাল আগেও রোতাং দর্শনার্থী ও লাহুল-স্পিতির যাত্রীদের পায়ে হেঁটেই এই নয় মাইল পথ পেরোতে হত। এখন দৈনিক দুবার করে বাস যাতায়াত করে। তাছাড়া বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের জীপ ও লরি সারাদিন যাওয়া-আসা করছে। জায়গা থাকলে সামান্য গোপন দক্ষিণার বিনিময়ে ঠাঁই পাওয়া যায়।

মানালী থেকে চার মাইল এসে নেহরু কুণ্ড। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বড়ই প্রিয় ছিল মানালী। সময় পেলেই তিনি দু-চারদিন কাটিয়ে যেতেন মানালীর ফরেস্ট রেস্ট হাউসে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসতেন এখানে। এই কুণ্ডের জলপান করতেন। এর জল স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই উপকারী।

আমাদের বাস থামে না এখানে। আঁকাবাঁকা চড়াইপথে এগিয়ে চলে।

কিছুক্ষণ বাদে ফরেস্ট মেকানাইজেশান প্রোজেক্টের নির্মীয়মাণ রোপওয়ে এবং নিউজপ্রিন্ট প্রোজেক্টের জন্য নির্বাচিত স্থান, অবশেষে আবার বিপাশাকে পেরিয়ে রাহালা পৌঁছই।

পাহাড়ের পাদদেশে ৮৫০০ ফুট উঁচু সংকীর্ণ একটি উপত্যকা—রাহালা।

পাশেই প্রবাহমানা বিপাশা। প্রায় সমস্ত সমতলভূমি জুড়েই অসংখ্য ছোট-বড় নানা রংয়ের সরকারী ও বেসরকারী তাঁবু। বাসপথটি ওপার থেকে একটি ষাট ফুট লম্বা পুল পেরিয়ে এপারে এসে শেষ হয়ে গেছে। বাসপথ শেষ হয়েছে কিন্তু পথ ফুরোয় নি। পাহাড়ের গা বেয়ে সংকীর্ণতর একটি পথ উঠে গেছে উপরে। পথের দুধারে গুটিকয়েক চা ও খাবারের দোকান—ওরা বলে হোটেল। পকোড়া, বেসমের মিষ্টি, রুটি তরকারি ডাল ও ভেড়ার মাংস পাওয়া যায়। যে হোটেলটি আমাদের কাছে সবচেয়ে ভাল লাগল, তার নাম 'পর্বত হোটেল'। রাহালা ওদের গ্রীষ্মকালীন ব্যবসা কেন্দ্র, শীতকালে ওরা চলে যাবে দু মাইল দূরে কোঠি গ্রামে। বাপ-মা ও ছেলেমেয়েরা মিলে হোটেল চালাচ্ছে। মেযে দুটির ব্যবহার ভাল, দেখতে সুন্দরী, বয়সে যুবতী। অতএব এ হোটেলে ভিড় লেগেই আছে।

প্রথম নজরে রাহালাকে মনে হয় মেলা—তাঁবুর মেলা। তাঁবুর দোকান, তাঁবুর গুদাম, তাঁবুর অফিস। ওপারের পাহাড় ভেঙে রোতাংয়ের বাসরাস্তা তৈরী হচ্ছে। ডিনামাইট ফাটছে, বুলডোজার চলছে। অদূর ভবিষ্যতে মানালী থেকে বাস যাবে খোকসার। প্রায় সারা বছর চালু থাকবে এই পথ। শীতকালে পথকে বরফমুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে। কয়েক বছর হল এ পথ তৈরি হযে গিযেছে। এখন (১৯৭৭) মানালী থেকে 'বাস'-এ চড়েই রোতা পেরিয়ে পৌছানো যায় লাহুলের সদর কেলং কিংবা স্পিতির সদর কাজা।

এখন (১৯৬৬) মে থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই পথ চালু থাকে। প্রায় পাঁচ মাস লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার সঙ্গে রাহালার কোন যোগাযোগ থাকে না। শুনেছি শীতকালে হেলিকপটারে ডাক পাঠাবার প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করছেন। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এ প্রস্তাব কার্যকরী হবে। তবে এখন শীতকালে কেবল বেতার মারফৎ যোগাযোগ থাকে। যাতায়াত ও মালপত্র পাঠানো গ্রীষ্মের ছ-সাত মাসের মধ্যেই সেরে নিতে হয়। শীত এসে যাচ্ছে। কাজেই রাহালা এখন কর্মব্যস্ত। শতাধিক ঘোড়া প্রতিদিন ওপরে যাচ্ছে আর আসছে। যাবার সময় মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে ও আসার সময় প্রায়ই খালিপিঠে ফিরছে। কারণ চাল থেকে শুরু করে কেরোসিন ও যন্ত্রপাতি—সব কিছুর জন্যই লাহুল-স্পিতি আমাদের মুখাপেক্ষী। সামান্য কিছু গম, রামদানা, ভুট্টা, আলু, শাকসব্জী ও বার্লি ছাড়া লাহুল-স্পিতির নিজস্ব কোন উৎপন্ন দ্রব্য নেই। সরকারী দপ্তরসমূহ তাদের কর্মচারীদের

প্রয়োজনীয় রসদ পাঠাবার ব্যবস্থা নিজেরাই করে থাকেন। তাই রাহালায় তাঁদের গুদাম আছে।

রোতাংয়ের পথ জীপ চলাচলের উপযোগী প্রশস্ত হলেও প্রস্তরাকীর্ণ চড়াই। জীপের চেয়ে ঘোড়ার পিঠে মাল পাঠানো নিরাপদ। প্রয়োজনের তুলনায় ঘোড়ার সংখ্যা কম। ফলে ঘোড়াওয়ালারা রাহালায় সবচেয়ে সচ্ছল ও ক্ষমতাসম্পন্ন।

আমরা বেলা সাড়ে এগারোটায় রাহালায় এসেছি। দুপুরের আগে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করা উচিত। কারণ তারপরেই সেখানে তুষার-পাত শুরু হয়। হাওয়া বইতে আরম্ভ করে। তুষারপাতের চাইতেও বিপজ্জনক এই হাওয়া। এ বছর জুলাই মাসে (১৯৬৬) কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক ডঃ ঋষিগোপাল ভাটিয়া এই হাওয়ার কবলে পড়ে নিখোঁজ হয়েছেন। তিনি মে মাসের মাঝামাঝি তিব্বতী ও বর্মী কথ্যভাষাসমূহের উপর গবেষণার জন্য লাহুল ও স্পিতিতে এসেছিলেন। ফেরার পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে। অনুসন্ধানী দল পাঠিয়েও তাঁর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

দুপুরের আগে রোতাং অতিক্রম করতে পারবো না বলে আজ আমরা রাহালাতেই রয়ে গেছি। ভেবেছিলাম রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু টাঙাতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আর দরকার হয় নি। বাসের বন্ধু মাস্টারজীর মধ্যস্থতায় আলাপ হয়েছে নবম আর্মড্ পুলিস ব্যাটালিয়নের সাব-ইন্সপেক্টর শ্রীপ্রীতম সিং ভট্টির সঙ্গে। পুলিস বাহিনীর রসদ ও সাজসরঞ্জাম পাঠাবার জন্য রাহালাতে পুলিসের একটি গুদাম আছে। শ্রীসিং এই গুদামের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। ভদ্রলোক অতিশয় অতিথিবৎসল। তিনি সানন্দে তাঁর তাঁবুতে আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। তারপর তিনি নিজেই আমাদের ঘোড়া ঠিক করে দিলেন। ঘোড়াওয়ালা অগ্রিম নিয়ে চলে গেল। কথা রইল সে কাল ভোর সাড়ে পাঁচটায় এসে আমাদের ঘুম ভাঙাবে।

আজ আর হাতে কোন কাজ নেই। বেরিয়ে পড়ি পথে। সুজয়া বলে, 'অসিতবাবু, চলুন না একবার সেই স্নেক-কলোনি ঘুরে আসা যাক।'

'স্নেক-কলোনি?' বুঝতে পারেন না অসিতবাবু।

'হ্যাঁ,' সুজয়া বলে, 'জানেন না বুঝি, এখানে একটা সর্প-উপনিবেশ আছে।'

'আছে নয়,' আমি বলি, 'ছিল বলতে পারো।'

'কেন সাপগুলি কি নেই নাকি এখন?' সুজয়া জিজ্ঞেস করে।

'আছে কিনা জানি না, তবে অনেক দিন তাদের কথা কেউ বলে নি।" উত্তর দিই।

'ব্যাপারটা কি? একটু খুলে বলুন তো।' অসিতবাবু সুজয়ার দিকে তাকায়।

সুজয়া বলে, 'পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে, রাহালা থেকে মাইল আধেক দূরে একখানি পাথরের আড়ালে একটি সর্প-উপনিবেশ ছিল। সেই সাপগুলিকে স্থানীয় অধিবাসীরা দেবজ্ঞানে ভক্তি করতেন। প্রতিদিন তাঁরা তাদের দুধ-কলা খেতে দিতেন। আর আশ্চর্য, খাবার এনে সামনে রাখলেই তারা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে খেয়ে নিত। খাওয়া শেষ হলে আবার ভেতরে চলে যেত।'

'কতগুলি সাপ ছিল?' অসিতবাবু প্রশ্ন করেন।

'সাধারণত দু-তিনটা বের হত, তবে কখনও কখনও আট-দশটি পর্যন্ত দেখা গেছে।' সুজয়া জবাব দেয়।

'কাউকে কামড়াত না?'

'না'। আমি বলি, 'আর সম্ভবতঃ সেগুলি ছিল বিষহীন পাহাড়ী সাপ।'

॥ দুই ॥

কাল ঘুমোতে রাত একটা বেজে গিয়েছিল, তবু আজ ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙল চণ্ডীগড়ের ছেলেদের কথাবার্তায়। ওরা আজ প্রথম বাস ধরে রাহালা যাবে। রোতাং গিরিবর্ত্ম দেখে আজই ফিরে আসবে এখানে।

কাল ওদের জন্যই জেগে থাকতে হয়েছে আমাদের। আমরা ফিরে আসার পরে গানের আসর তথা ক্যাম্প-ফায়ার আরম্ভ হয়েছিল। ও-রকম আসরে বাঙ্গালী ছেলেরা সাধারণতঃ যে ধরনের গান গায়, তেমন গান নয়। ওরা সবাই সিনেমার গান গেয়েছে। জিন্দিগী আর মহব্বতের মহিমা কীর্তন করে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে। তার পরে আমাদের অনুরোধ করেছে অংশ নিতে। এজাতীয় আসরে কখনও অনুরোধ উপেক্ষা করতে নেই। তাই কাজী নজরুলের একটা কবিতা আবৃত্তি করেছি। আর মানসী গেয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত। বেশ ভাল গান গায় মানসী।

আমাদের কোন তাড়া নেই। সকাল দশটায় টুরিস্ট-অফিস খুলবে। তবু ছেলেরা চলে যাবার সময় উঠে বসতে হয়। মানসী তেমনি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। এতো হট্টগোলেও ঘুম ভাঙছে না, আশ্চর্য !

ছেলেরা বেরিয়ে যাবার পরে আমিও বেরিয়ে আসি ঘর থেকে। ঘরে মানসী একা।

বাথরুম সেরে ফিরে আসি ঘরে। মানসী এখনও ঘুমোচ্ছে। ঘুমাক। কাল অনেক রাতে শুয়েছে।

হাতমুখ মুছে আবার এগিয়ে চলি দরজার দিকে। বারান্দায় গিয়ে বসা যাক।

"ঘরে থাকতে অসুবিধে হচ্ছে কি ?"

মানসীর প্রশ্নে থমকে দাঁড়াই। পেছন ফিরে দেখি কম্বল থেকে মুখ বের করে মৃদু মৃদু হাসছে মানসী।

হেসে বলি, "আপনার অসুবিধে না হলে আমার অসুবিধে হবে কেন ? তবে সূর্য উঠছে, ভাবছিলাম বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখব।"

"সূর্যোদয় কি আর কোনদিন দেখেন নি যে বাইরে যাবার জন্য এমন ছটফট করছেন !"

আমি আমার বিছানায় এসে বসি।

মানসী বলে, "সূর্য তো চিরকাল উদয় হবে। কিন্তু আজকের এই সকালটা কি আর এসেছে আপনার জীবনে ?"

"না।" আমি উত্তর দিই।

মানসী বলে, "আমি জানি আপনি কেন বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।"

"কেন বলুন তো ?"

"পাছে লেখকের সুনাম নষ্ট হয়।"

আমি মানসীর দিকে তাকাই।

মানসী বলে, "অবাক হচ্ছেন, না ?"

"তা একটু হচ্ছি বই কি।"

"আমি কালই আপনাকে চিনেছি।"

"কেমন করে ?"

"আমি যে সেবার নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সময় বৃন্দাবনে ছিলাম। সেখানেই আপনাকে দেখেছি।"

"আমি তো আপনাকে..."

"দেখেছেন বলে মনে হচ্ছে না! দেখেন নি। আমি দূর থেকে আপনাকে দেখেছি। মনোযোগ দিয়ে আপনার 'হিমালয় ও বাংলা সাহিত্য' প্রবন্ধ পাঠ শুনেছি।"

"তাহলে ঠিকই চিনেছেন।" আমাকে একটু হাসতে হয়।

"কাল যখন বললেন আপনি বাঙ্গালী, তখনই সন্দেহ হল। তারপরে আপনার হিমাচল পরিক্রমার কথা শুনে সন্দেহ আরও দৃঢ় হল। তাই আপনাকে নিয়ে পথে বের হলাম, হিমালয়ের কাহিনী শুনতে চাইলাম। শুনে বুঝতে পারলাম আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়। তাই আজ আর ওদের সঙ্গে আমি রোতাং গেলাম না। আপনার কাছ থেকেই তো শোনা যাবে।"

"কানে শোনা আর চোখে দেখা তো এক জিনিস নয় মানসী দেবী।"

"দেবী দেবী করছেন কেন, আমি দেবী নই, মানবী।"

"তাহলে কি বলে ডাকব?"

"কেন, নাম ধরে!"

"কোন আপত্তি হবে না তো?"

"আপত্তি!" মানসী বলে, "বরং তাকে পরম সৌভাগ্য বলে মনে করব। আপনি আমার প্রিয় লেখক। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' পড়ে আমি গঙ্গোত্রী গিয়েছি। আপনার লেখা আমার হিমালয়ের মতোই ভাল লাগে।"

"তা আমারও সৌভাগ্য। পাঠক-পাঠিকার জন্যই লেখা। তাদের ভাল লাগলেই লেখক ধন্য হয়।" একটু থামি। তার পরে আবার বলি, "সাতটা বেজে গেল, এবার উঠুন তো। মুখ হাত ধুয়ে চলুন চা খেয়ে আসি।"

মানসী হাসে। বলে, "আদেশ করলেই তো উঠতে পারি না। আমি যে মেয়ে। মহিলাদের শয্যাত্যাগের আগে পুরুষমানুষদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়।"

লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "আমার একদম খেয়াল ছিল না।" মানসী হাসতে থাকে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। একটু বাদে মানসী বাথরুমে চলে যায়। আমি ঘরে আসি। এয়ার-ম্যাট্রেসের হাওয়া ছেড়ে দিই। জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলি।

মানসী ফিরে আসে। এসেই বলে, "ভদ্রলোককে যে আর একবার বাইরে যেতে হয়! ভদ্রমহিলা বেশ পরিবর্তন করবে।"

"দুঃখিত। আমার একদম খেয়াল ছিল না।"

"এতো কম খেয়াল হলে তো মেয়েদের নিয়ে ঘর করা যায় না। আধ ঘণ্টায় দু'বার ভুল হল।"

"আর হবে না।"

"বেশ, দেখা যাবে।"

আবার বেরিয়ে আসি বারান্দায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যকে দেখি। অনেকক্ষণ হল সূর্যোদয় হয়েছে। তার সোনালী কিরণধারায় স্নান করছে মানালী—সুন্দরী মানালী আরও সুন্দর হয়েছে।

প্রভাতী রোদের পরশ লেগেছে শিশিরস্নাত ঘাসবনে আর এই বারান্দায়। রোদ পড়েছে ওদের গায়ে, যারা কাল রাতে এসে আশ্রয় নিয়েছে এখানে। ওরা লাহুল ও স্পিতি উপত্যকার মেহনতী মানুষ। শীত আসছে। তাই নেমে এসেছে নিচে। ওরা কেউ বা এখানে থাকবে, কেউ বা নেমে যাবে আরও নিচে। শীতকালটা কাটাবে কোনমতে। তার পরে আবার ফিরে যাবে ঘরে—হিমাচলের পাহাড়ে পাহাড়ে, দুর্গম গিরি-কান্তারে।

"এখন আসতে পারেন।" মানসী ঘরের ভেতর থেকে বলে।

আমি ঘরে আসি। মানসী একখানি সিল্কের শাড়ী পরেছে। বেশ দেখাচ্ছে ওকে। মানসী বলে, "আপনি কি পোশাক পাল্টাবেন?"

"না।"

"তাহলে চলুন।" মানসী ব্যাগ হাতে নেয়। আমরা ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। মানসী দরজায় তালা লাগায়। আমরা পথে নেমে আসি। নীরবে পথ চলতে থাকি।

বড় রাস্তায় এসে একটা চায়ের দোকানে বসি। চা খেয়ে বেরিয়ে আসি পথে। জিজ্ঞেস করি, "কোথায় যাবেন?"

মানসী ঘড়ি দেখে বলে, "টুরিস্ট-অফিস খুলতে এখনও দু'ঘণ্টা বাকি।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে চলুন না বিপাশার পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ বসা যাক।"

"বেশ তো চলুন। বসে বসে হিমাচলকে দেখা যাক।"

"শুধু দেখব না, সেই সঙ্গে শুনব।" মানসী বলে, "শুনব রোতাং-এর কথা।"

"ভাল লাগবে না। কাল রাতে হিমাচল ছিল ঘুমিয়ে। আজ জেগে থাকা হিমাচলের সামনে বসে তার কাহিনী কি ভাল লাগবে আপনার?"

"না লাগলে আপনার কি!" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"আমার কিছু নয়, আপনার সময় নষ্ট হবে।"

"হোক্ গে, আমি নষ্ট করতেই চাইছি। সংসারে সবাইকে সমান হিসেবী হতে হবে, তার কি মানে আছে?"

আর কথা না বাড়িয়ে মানসীর সঙ্গে চলতে থাকি। বাসপথ দিয়ে হেঁটে আসি বিপাশার পুলের ধারে। পথ থেকে নেমে এসে নদীতীরের একখানি পাথরের ওপর বসি। মানসী পাশে বসে বলে, "এবার বলুন রোতাং গিরিবর্ত্মের কথা।"

একটুকাল চুপ করে থেকে আমি শুরু করি—

কথা ছিল পরদিন সকালে রাহালাতে ঘোড়াওয়ালা এসে ঘুম ভাঙাবে। আমাদের ঘুম ভাঙল যথাসময়ে, কিন্তু কোথায় ঘোড়াওয়ালা? কিছুক্ষণ শুয়ে থেকে ঘোড়াওয়ালার প্রতীক্ষা করলাম। তার পরে বিরক্ত হয়ে শয্যাত্যাগ করি। হাত-মুখ ধুয়ে ফিরে আসি তাঁবুতে। না, ঘোড়াওয়ালা আসে নি। অসিতবাবু বলেন, 'চলো, চা খেয়ে আসা যাক।'

ভূতের মুখে রামনাম। না করে উপায় কি? প্রচণ্ড শীত পড়েছে। নেশার জন্য চায়ের প্রতি আসক্ত হন নি আমাদের নেতা, প্রাণের প্রয়োজনে চা খেতে চাইছেন। আমরা সানন্দে সঙ্গী হই।

বড় আশা নিয়ে ফিরে আসি তাঁবুতে। কিন্তু হায়, কোথায় ঘোড়াওয়ালা! তার পাত্তা নেই। আমরা নিজেরাই মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা শুরু করি। তাঁবুর বাইরে বের করি, সাজিয়ে রাখি। সে এলে যাতে আর সময় নষ্ট না হয়।

সব কাজ শেষ হয়ে যায়, কিন্তু আসে না ঘোড়াওয়ালা।

প্রীতম সিং অন্য ঘোড়ার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাধ্য হয়ে বসে থাকি। বেলা বেড়ে চলে।

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হয়। সে আসে। আর এসেই অনুযোগ করে, 'সে কী, আপনারা এখনও এখানে?'

'তুমি আসো নি......'

আমার আসার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক কী? যখন দেখলেন আমার দেরি হচ্ছে, তখন আপনাদের রওনা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। মাল আমি যেভাবেই হোক পৌঁছে দিতাম। ছি ছি, অযথা এত দেরি করে ফেললেন! মৌসুম খারাপ হয়ে গেলে আপনাদের কষ্ট হবে। যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে। আপনারা হাঁটতে শুরু করুন। আমি মাল নিয়ে আসছি।'

সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা রওনা হয়েছি রোতাংয়ের পথে। প্রীসিং

আমাদের এগিয়ে দিয়েছেন পুলিস চেক্-পোস্ট পর্যন্ত। চেক্-পোস্ট রাহালার সীমারেখা।

বাঁ দিকে পাহাড়। পাহাড়ের পাশ দিয়ে পাথর-বোঝাই প্রশস্ত পথ ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠেছে। আর পাহাড়ের গা দিয়ে সোজা উঠে গেছে পাকদণ্ডী—ভেড়াওয়ালারা ভেড়ার পাল নিয়ে সেই পথ বেয়ে নিচে নামছে। 'সুই সুই' করে শিষ দিচ্ছে। আর তালে তালে ভেড়ার গলার ঘণ্টা বাজছে। বড় ভাল লাগছে শুনতে। আমরা এগিয়ে চলেছি প্রশস্ত পথে।

জীপ যাতায়াতের পথ। তবে পথের চেহারা দেখে বিশ্বাস করা কঠিন যে এ পথে জীপ যেতে পারে। সারা পথ জুড়েই ছোট-বড় পাথর। মানুষের ভারেই সেগুলো নড়েচড়ে উঠছে। বেশ চড়াইপথ। তাহলেও এ পথে জীপ চলে। সেটা পথের গৌরব নয়—জীপ ও চালকের কৃতিত্ব। অবশ্য সেই জীপে বসে থাকতে পারাও কম কৃতিত্বের নয়। তৎকালীন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল শ্রীধরম-বীর জীপে করে একবার এই পথে কেলং রওনা হয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কারণে তাঁর জীপযাত্রা সফল হয় নি। পরে তিনি হেলিকপটার যোগে কেলং পৌঁছে শানসা বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। তাঁর আগে কোন রাজ্যপাল কেলং যান নি। যাই হোক নতুন রাস্তা হয়ে গেলে আর হেলিকপটারের প্রয়োজন হবে না। আমাদেরও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চড়াই উৎরাই করে রোতাং পেরুতে হবে না। বাসে বসেই কেলং কিংবা কাজা পৌঁছনো যাবে। কষ্ট কমবে, সময় বাঁচবে কিন্তু পথের আনন্দ যাবে ফুরিয়ে। দুঃখকষ্ট আর গৌরবময় অনিশ্চয়তাই হিমালয় পথিকের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

আমরা রাহালা থেকে অনেক ওপরে উঠে এসেছি। রাহালাকে এখান থেকে দেখাচ্ছে একখানি পটে আঁকা ছবির মতো। নানা রংয়ের তাঁবুগুলো যেন এক-একটি খেলাঘর। আর বিপাশা? স্থির, অচঞ্চল, আঁকাবাঁকা একটি রুপোলি রেখা। কিন্তু এখানে বিপাশা নেই। সে যেন কোথায় পালিয়ে গেছে। অথচ আমরা চলেছি বিপাশার উৎস দর্শনে। তাই কি সে যেতে চাইছে পালিয়ে?

বিপাশাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছি তার গান। পথের পাশে বিপাশা না হয় নাই বা রইল, দূর থেকে তো তার স্বর আসছে ভেসে। পালিয়ে গেলেও বিপাশা চলেছে আমাদের সঙ্গে। আমরা তার উপস্থিতি অনুভব করছি। হিমালয়ের পথে চোখের চেয়ে কান বেশি অনুভূতিসম্পন্ন।

রোদ উঠেছে নিচে আর ওপরে। সোনালী রোদে ঝলমল করছে রাহালা,

আর ওপরের ঐ তুষারধবল শিখরমালা। কিন্তু রোদ নেই এখানে। এখানে কেবল পাহাড়ের ঘন ছায়া।

রাহালাকে এখনও যাচ্ছে দেখা। ইতিমধ্যে সে তার ঝলমলে রূপ হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আরও বেশি মায়াময়ী হয়েছে। কুয়াশার ছোঁয়া লেগেছে পেছনের পাহাড়ের গায়ে, তার সবুজ বনে, সোনালি ক্ষেতে, আর রুপোলি ঝরণায়। বিরাট একখানি ক্যানভাসের ওপরে বিশ্বপ্রকৃতি অনন্ত সুন্দরের মূর্তি এঁকেছে। আমরা অনন্ত কালের নীরব দর্শক—তৃপ্ত দর্শক।

প্রস্তরময় পথ। অসমতল। আঁকাবাঁকা খাড়া চড়াই। যেখানে পাথর নেই সেখানে নরম মাটি। বৃষ্টি ও বরফগলা জলে স্যাঁতসেঁতে। ভেড়া চলে চলে পথ কর্দমাক্ত ও পিচ্ছিল। স্বভাবতই আমরা ক্লান্ত। কিন্তু পথের পাশে বসে একটু বিশ্রাম নিলেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

এদিকে আমাদের অন্যমনস্কতার সুযোগে বিপাশা বহুদূরে পালিয়ে গেছে। তার চলার শব্দ পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছি না। তবে এ বিচ্ছেদ সাময়িক। তার সঙ্গে আবার হবে দেখা। জানি সে যেখানেই থাকুক, সেও চলেছে একই লক্ষ্যে। সে চলেছে তার পথে, আমি চলেছি আমার পথে। আমরা দুজনেই চলেছি রোতাং 'গিরিবর্ত্মে'। আমি পদপরিক্রমার প্রয়োজনে, আর বিপাশা প্রাণধারণের প্রয়োজনে। আমি চলেছি অনন্ত সুন্দরের কাছে, আর বিপাশা চলেছে তার জন্মদাত্রীর কাছে। রোতাং গিরিবর্ত্মের ওপরে বিয়াসঋিখি— বিপাশার উৎস। আমি যাচ্ছি সেই উৎস দর্শনে। বিপাশার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে সেখানে।

দু ঘণ্টা একটানা চড়াই ভাঙার পর মারী পৌঁছলাম। রাহালা থেকে আড়াই মাইল। উচ্চতা বেশি নয়—বড় জোর হাজার বারো ফুট। কিন্তু শীতের জন্যে বিখ্যাত এই জায়গাটি। কথিত আছে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংয়ের একদল সৈন্য একদিন সন্ধ্যায়, লাদাক থেকে লাহুল হয়ে এখানে এসে পৌঁছান। সামনে অন্ধকার রাত। অচেনা উৎরাই পথ। অথচ এ জায়গাটা সমতল। আর অগ্রসর হওয়া উচিত নয়। তাঁরা এখানেই রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাত চিরস্থায়ী নয়। সে রাতের অবসান হয়েছে। কিন্তু তাঁদের অনেকেই আর উষার আলো দেখতে পান নি। প্রচণ্ড শীত ও তুষারপাতের ফলে তাঁরা এখানেই মারা গিয়েছেন। সেই থেকেই এই জায়গাটির নাম হয়েছে মারী।

মরণস্মরণী মারী আজ জীবনসরণীতে পরিণত। রোতাং পথযাত্রীরা আজ মারীতে এসে জীবনের স্পর্শ পান। জায়গাটি শুধু সমতল নয়, অবস্থানটিও সুন্দর। রাহালা ও রোতাং থেকে দূরত্ব প্রায় সমান। তাই এখানে গড়ে উঠেছে নির্মাণ বিভাগের গুদাম ও কয়েকটি হোটেল। বড় দুটির নাম চাম্বা ও নেপালী হোটেল। আমরা চাম্বা থেকে এসেছি। কাজেই রাস্তার পাশে পিঠের বোঝা রেখে চাম্বা হোটেলে প্রবেশ করি।*

মারীর পরে পথ কিছুটা সমতল। পাথরও অনেক কম। কিন্তু তাতে পথিকের কষ্ট কমে নি। নরম মাটির কর্দমাক্ত পথ। ডানদিকে তুষারাবৃত পাহাড়। বাঁদিকে পাহাড়ের গায়েও বরফের ছিটেফোঁটা। তবে পথে বরফ নেই। আজ নেই বলে এমন নয় যে কোনদিন থাকে না। এ বছরও (৪ঠা মার্চ, ১৯৬৬) সাতজন যাত্রী তুষারপাতের ফলে মৃত্যুবরণ করেছেন এই পথেরই ওপর। আবহাওয়ারও কোন স্থিরতা নেই এ পথে।

নতুন পথ তৈরি হচ্ছে ওপর দিয়ে। মাঝে মাঝেই ব্লাস্টিং হচ্ছে। কিন্তু সে অনেক দূরে। পুরনো পথেও নির্মাণ বিভাগের কর্মীরা কাজ করছে। কোন পাহাড়ী পথই চিরস্থায়ী নয়। সব সময়ে তার ওপর ধস নামছে কিংবা সে ধসে যাচ্ছে। তাই কর্মীরা সর্বদা কর্মরত।

কর্মীদের আকস্মিক হুঁশিয়ারিতে থামতে হল। ওরা আমাদের এগিয়ে যেতে বারণ করছে। সামনে পাথর পড়ছে ওপর থেকে। অগত্যা ওদের নির্দেশে পথ ছেড়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। এইভাবেই স্থানীয়রা ভেড়ার পাল নিয়ে ওঠা নামা করে। এতে পথ সংক্ষিপ্ত হয়। তবু আমরা ওপরে ওঠার সময় সন্তর্পণে পথ এড়িয়ে চলেছিলাম। খাড়া চড়াই বেয়ে ওঠা বড়ই কষ্টকর। ফলে পথ সংক্ষিপ্ত হলেও সময় বেশি লাগে। ভেবেছিলাম কেবল নামার সময় এই পথ ব্যবহার করব।

কিছুক্ষণ বাদে একটা যান্ত্রিক শব্দ কানে আসতেই নিচের দিকে তাকাই। একখানি সরকারী জীপ চলেছে আমাদের ফেলে আসা পথ দিয়ে। চলেছে বোধ করি মাইল পাঁচেক বেগে। অসম্ভব দুলছে। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে পাশের খাদে পড়ে যেতে পারে। ঐ দোদুল্যমান জীপে বসে থাকার চেয়ে চড়াই ভাঙা অনেক কম কষ্টকর। তবে এতক্ষণে বিশ্বাস হল যে এই দুর্গম পথে সত্যই জীপ চলতে পারে।

যারা ঘোড়সওয়ার হয়ে রোতাং পরিদর্শনে চলেছেন, তাদের হাল দেখেও

* লেখকের 'হিমতীর্থ-হিমাচল' দ্রষ্টব্য

বড় দুঃখ হচ্ছে। শরীরটাকে শক্ত করে, খাদের দিকে না তাকিয়ে কোন রকমে ঘোড়ার গায়ের সঙ্গে লেগে আছেন। অনভ্যাসের জন্য সারা শরীর ব্যথায় টনটন করছে। থামতে পারছেন না, নামতে পারছেন না, বসে থাকতেও পারছেন না। অথচ বসে থাকতে হচ্ছে। এর চেয়ে চড়াই ভাঙা অনেক সহজ।

আমরা চলেছি মজলিশী চালে। যেখানে ইচ্ছে বসছি, যতক্ষণ খুশি দেখছি। তার পর আবার গল্প করতে করতে এগিয়ে চলেছি। আমাদের পথের আশেপাশে ঘাস ও কাঁটাবন। মাঝে মাঝে শ্যাওলাও রয়েছে। পাহাড় যেন আমাদের জন্য নরম গালিচা বিছিয়ে রেখেছে।

অবশেষে একসময় আরোহণের পালা শেষ হল। এক ফালি সমতল প্রান্তরে উপনীত হলাম। দুপাশে পাহাড়। মাঝখানে সমতল। পাহাড়ের গায়ে বরফ। প্রান্তর বরফাবৃত নয়। তবে এখানে ওখানে বরফ রয়েছে জমে। এই প্রান্তরটিই রোতাং গিরিবর্ত্ম।

বাঁদিকের পাহাড়গুলি খুবই কাছে। ডানদিকেরগুলো খানিকটা দূরে। গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে চলে গেছে দুটি পথ—একটি সেকালের, আরেকটি একালের। শেষেরটি শেষ হয় নি। কিন্তু হলে বোধ করি আর কারও এত আনন্দ হবে না এখানে দাঁড়িয়ে। পর্যটকরা মোটরে করে পৌঁছবেন এখানে। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখবেন, কয়েকটা ছবি নেবেন। তার পর পাশের হোটেল থেকে এক কাপ কফি কিম্বা চা খেয়ে আবার মোটরে উঠবেন। দুর্গম পথের প্রান্তে পৌঁছবার আনন্দের আস্বাদ অজানাই রয়ে যাবে তাঁদের।

'তাঁরা ইয়ংহাজব্যাণ্ডের সেই উক্তির সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারবেন না —'And when you are first at that height (Rohtang Pass), and when you are walking and not riding, and when you are walking through snow and not on hard ground, and when the sun is beating down on you as if it meant to penetrate right inside your aching head, and when the glare upward from the snow is almost as bad as the sun itself, and when in addition to everything else there is a piercing wind blowing and bitingly cold, you do feel sickness of some kind or other, whether it's a mountain or not.'

আজও আমাদের মাথার ওপরে মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ। চারিদিকে

রুপোলি চূড়োয় চকচকে রোদ। রোদ পড়েছে রোতাংয়ের পথে, আর তার সবুজ ঘাসে, সাদা তুষারের কালো মাটিতে। কিন্তু রোদ নেই দূরের আকাশে। সেখানে চলেছে কুয়াশার লুকোচুরি খেলা। তবে পাহাড়গুলোকে বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। যেন তাদের গায়ে কেউ লাল রঙের আলপনা এঁকে রেখেছে। বন জঙ্গল ঝরণা পাথর ও বরফের ভিন্ন ভিন্ন রঙ। আবার সামনের ও পেছনের পাহাড়গুলোর রঙ এক রকম নয়। কিন্তু কোনটিই তার নিজস্ব রঙ নয়। কুয়াশার ফিলটারে সবার রঙ পাল্টে গেছে। পাল্টায়নি কেবল রুপোলি রেখাগুলি। রেখা নয় ঝরণা। পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকেবেঁকে নিচে নেমে বিপাশায় বিলীন হচ্ছে। বহুবর্ণময় এই বিচিত্র চিত্রের দিকে তাকিয়ে আমি সব কিছু ভুলে গেলাম। মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ পরে জানি না। সম্বিৎ ফিরে আসে অসিতবাবুর কথায়, 'চলো একটা হোটেলে ঢুকে চা খেয়ে নেয়া যাক। বিয়াস রিখি দেখে সন্ধ্যের আগেই পৌঁছতে হবে ওপারে, কোকসারে। দুটো বাজে। আর দেরি করা উচিত হবে না।'

চমকে উঠি। তাই তো! সবাই সাবধান করেছে—রোতাংয়ের আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই। বেলা যতই পড়ে আসে, ততই তার মেজাজ বিগড়ে যায়। কিন্তু কোথায়! রোতাং তো আজ শান্তশিষ্ট সুবোধ বালকের বেশে বরণ করল আমাদের। তাহলেও আর দেরি করি না। এগিয়ে চলি হোটেলের দিকে।

পথের দুপাশে কয়েকখানি পাথরের ঘর। ওপরে ত্রিপলের ছাউনি। এগুলো স্থায়ী আবাস নয়, অস্থায়ী হোটেল। গ্রীষ্মকালে পদযাত্রীদের পরম প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ভবন। ১৩,৪০০ ফুট উঁচু গিরিবর্ত্মের ওপরে হোটেল। সত্যিই বিচিত্র বৈকি!

॥ তিন ॥

এলাম ট্যুরিস্ট অফিসে। অফিস খুলেছে, অফিসার আসেন নি। আমি এবং মানসী সোফায় বসে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে থাকি।

কিছুক্ষণ বাদে ট্যুরিস্ট অফিসারের আবির্ভাব ঘটল। আমরা নাম বললাম। তিনি খাতা খুললেন। কলম বের করলেন। ট্যুরিস্ট বাংলোয় ঘর মঞ্জুর হল।

কিন্তু মন ভরল না মানসীর। সে বলে বসল, "আমাদের দুজনকে

পাশাপাশি হুটো ঘর দিন না।"

অফিসার প্রথমে আমার দিকে তাকালেন, তারপরে মানসীর দিকে। একটু মৃদু হাসলেন। তাঁর মনোভাব সুস্পষ্ট। আমি মাথা নত করি। কিন্তু তাঁর দিকে তাকিয়ে থেকেই মানসী আবার বলল, "পাশাপাশি হুটো ঘর পেলে আমাদের একটু সুবিধে হয় আর কি।"

অফিসার আবার হাসেন। কিন্তু মানসী গম্ভীর। সে তাকিয়ে থাকে অফিসারের দিকে। এবারে মুখ ফিরিয়ে নিলেন তিনি। আবার খাতা খুললেন।

আমার ঘরের পাশে ঘর পায় মানসী। সে উঠে দাঁড়ায়। সবিনয়ে ধন্যবাদ জানায় অফিসারকে। আমরা বেরিয়ে আসি ট্যুরিস্ট অফিস থেকে।

বাইরে এসে বলি, "কি দরকার ছিল পাশাপাশি ঘর নেবার? ভদ্রলোক কি ভাবলেন বলুন তো?"

"কি ভাববেন আবার। যা সবাই ভাবেন, তাই ভাবলেন।" মানসী নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"না না, এটা ঠিক হল না। আমার বড্ড লজ্জা করছে।"

"আপনি যে দেখছি ভারী লাজুক। কিন্তু শুনেছি, লজ্জা থাকলে নাকি লেখক হওয়া যায় না।"

"লেখকদের সম্পর্কে আপনার ধারণাটা তো দেখছি খুবই ভাল। তবু জেনে রাখুন, আমি মোটেই নির্লজ্জ নই।"

"না হলেই ভাল। আমাকে যে পাশের ঘরে বাস করতে হবে।"

মানসীর কথায় হেসে উঠতে হয় আমাকে। শেষের দিকে মানসীও আমার সঙ্গে হাসতে থাকে।

মালপত্র নিয়ে ট্যুরিস্ট বাংলোয় রওনা হলাম, বাসপথকে ডানদিকে রেখে আমরা উঠে আসি ওপরে। চড়াই হলেও চওড়া মোটর পথ। পোস্ট অফিসকে বাঁদিকে রেখে আপেল বাগানের পাশ দিয়ে এসে পৌছই ফরেস্ট রেস্ট হাউসের সামনে। জওহরলালজী মানালী এলে এখানে থাকতেন।

ফরেস্ট রেস্ট হাউস ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। দেওদার বনের ভেতর দিয়ে পথ। খানিকটা এসে ডানদিকে পায়ে-চলা পথ। সেই পথ দিয়ে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে পৌছই ট্যুরিস্ট-বাংলোর সামনে। বেশ বড় একটি একতলা বাড়ি। সামনে রেলিং-ঘেরা বারান্দা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠেই সামনে ড্রয়িংরুম ও ডাইনিং-হল। হু'পাশে সারি সারি ঘর। এক

প্রান্তের দু'খানি ঘর পেয়েছি আমরা।

বেশ বড় ঘর। মেঝেতে কার্পেট পাতা। চেয়ার-টেবিল-খাট-আলনা ও দেওয়াল-আলমারি সবই রয়েছে। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুম। এক কথায় চমৎকার ব্যবস্থা।

জিনিসপত্র গোছগাছ করে স্নান সেরে পোশাক পালটে নিলাম। তারপরে মানসীকে সঙ্গে নিয়ে খেয়ে এলাম হোটেল থেকে। মানসী নিজের ঘরে যায়। কিন্তু একটু বাদেই বাইরের দরজায় এসে করাঘাত করে, "আসতে পারি?"

"স্বচ্ছন্দে।"

মানসী ভেতরে আসে। দরজাটা ভাল করে খুলে দিয়ে একখানি চেয়ার টেনে বসে।

জিজ্ঞেস করি, "দরজাটা ওভাবে খুলে দিলেন কেন?"

"যাতে লেখকের সুনাম নষ্ট না হয়। দেখলাম কয়েকজন বাঙ্গালী রয়েছেন এখানে।"

"তাহলে এলেন কেন?"

"না এসে পারলাম না বলে।" সঙ্গে সঙ্গে মানসী জবাব দেয়।

আমি চুপ মেরে যাই।

মানসী আবার বলে, "আপনি যে কেমন করে এমন একা একা ঘুরে বেড়ান, বুঝতে পারছি না।"

"কেন?"

"আপনি মোটেই স্বাবলম্বী নন।"

"আমি তো সবই গুছিয়েই রেখেছি।"

"ছাই রেখেছেন।" মানসী উঠে দাঁড়ায়। সে আমার জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লেগে যায়। বুঝতে পারছি কাজ পেয়ে কাজের মায়া ছাড়তে পারছে না। তাই নতুন করে গোছগাছ করছে। এও বুঝতে পারি, ওকে বাধা দেয়া বৃথা। তাই চুপ করে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কাজ শেষ হয়ে যায়। সে আবার এসে সামনের চেয়ারখানায় বসে। বসেই বলে, "আচ্ছা, আমাকে কি আপনার খুব গায়েপড়া মেয়ে বলে মনে হচ্ছে?"

"তা একটু হচ্ছে বৈ কি।" হাসতে হাসতে বলি।

"হোক্ গে।" মানসী বলে। "তবু আমি আপনাকে অমন অগুছাল হয়ে থাকতে দেব না।"

"দিলেই কিন্তু ভাল করতেন।"

"কারণ?"

"আপনি তো আর চিরকাল পাশের ঘরে থাকবেন না। অভ্যেস খারাপ হয়ে গেলে বিপদে পড়ব।"

"বিপদে পড়বেন কেন, তখন তো আর আমি দেখতে আসব না।" একটু থেমে মানসী আবার বলে, "এ আলোচনা এখন থাক্। রোভাং-য়ের কথা শেষ করে ফেলুন।"

"বললাম তো তখন।" আমি বলি।

সে প্রশ্ন করে, "তারপরে কি হল?"

না। একে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। তাই আর কথা না বাড়িয়ে বলতে শুরু করি—

সামনের হোটেলটিতে ঢুকে পড়ি। ঘরখানি বেশ বড়। একটিমাত্র ছোট দরজা। কোন জানলা নেই। ভেতরটা অন্ধকার। এক কোণে দুটি স্টোভ জ্বলছে। তারই আলোতে যা একটু আধটু আবছা দেখাচ্ছে। রহস্যময় পরিবেশ।

ভেতরে ঢুকতেই কোমল কণ্ঠের আহ্বান ভেসে আসে, 'বৈঠ যাইয়ে।'

মা ও মেয়ে চা করছে ও পকোড়া ভাজছে। তাদেরই কেউ আমাদের আহ্বান জানালেন। চারখানি বেঞ্চি। বুঝলাম এর দুখানি চেয়ার আর দুখানি টেবিল। একখানি বেঞ্চিতে সাহেবী পোশাক পরা জনা পাঁচেক ভদ্রলোক বসে আছেন—চা-বিস্কুট খাচ্ছেন। আমরা অপর বেঞ্চিখানিতে আসন গ্রহণ করি। তার পরে চা ও পকোড়ার অর্ডার দিই।

হঠাৎ ওদিক থেকে ইংরেজীতে প্রশ্ন আসে, 'দেশলাই আছে?'

বিস্মিত হই। দেশলাইয়ের জন্য নয়। এই উচ্চতায় এই পরিবেশে চায়ের পরে ধূমপান খুবই স্বাভাবিক। বিস্মিত হই কণ্ঠস্বরে। প্রশ্নটি নারীকণ্ঠের। রোদ থেকে এসেছি। তার ওপর পোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই। কাজেই একটু আগে যাদের ভদ্রলোক বলে মনে হচ্ছিল, তাঁদের সবাই ভদ্রলোক নন, ভদ্রমহিলাও আছেন। ভাবলাম ভদ্রমহিলা তাঁর সঙ্গীর জন্য দেশলাই চাইছেন। কিন্তু তাঁর দিকে তাকাতেই সব সন্দেহের অবসান হল। ভদ্রমহিলার হাতে চুরোট।

সবিনয়ে বলি, 'ম্যাডাম, ক্ষমা করবেন। দেশলাই সঙ্গে নেই, আছে ঘোড়ার পিঠে।'

'সে কি! আপনারা স্মোক করেন না?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনারা মাউন্টেনিয়ার্স?'

'আজ্ঞে না।'

'তাহলে এখানে এসেছেন কেন?'

'একটু বেড়াতে।'

'আমি মাউন্টেনিয়ার। আমার নাম মিস্ মালিনী প্যাটেল। মানালী থেকে বেসিক মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নিয়েছি।'

'আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আপনাদের সঙ্গে, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। আবার কি দুর্ভাগ্য দেখুন যে সামান্য একটা দেশলাই দিয়ে পর্যন্ত আপনাকে সাহায্য করতে পারলাম না। তবে যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমি আপনাকে একটা পরামর্শ দিতে পারি।'

'কী?'

'ঐ স্টোভের আগুনে চুরোটটা ধরিয়ে নিন।'

'বাই জোভ্!' যেন ইউরেকার বদলে ব্যবহার করলেন শব্দ দুটি। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এটাই আমাদের এতক্ষণ খেয়াল হয় নি।' ছেলেটির হাতে চুরোটটি দিয়ে মিস্ মালিনী আদেশ করেন, 'যাও ধরিয়ে নিয়ে এসো।' তার পরে তিনি নিজেদের পরিচয় দিতে শুরু করেন—মিস্ মালিনী আমেদাবাদের এক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা, বর্তমানে জনৈক অকৃতদার বন্ধুর সঙ্গে মানালীতে বাস করছেন। সহযাত্রী ভদ্রলোকও তাঁর বন্ধু। তিনি তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকন্যা নিয়ে মিস্ মালিনীর সঙ্গে পাহাড়ে চলেছেন —কেলং যাচ্ছেন। ভদ্রলোক আমেদাবাদের একজন ব্যবসায়ী। মেয়েটি বি. এস-সি পাস করে সেখানকার এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। আর ছেলেটি হায়ার সেকেণ্ডারী পাস করে এ বছর কলেজে ঢুকেছে। নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে মিস্ মালিনী বললেন, 'আমি মাউন্টেনিয়ার। হিমালয়ান এক্সপিডিশানই আমার জীবন। কত ঘুরলাম, তবু মন ভরল না। আশ মিটল না।'

ইতিমধ্যে ছেলেটি চুরোট ধরিয়ে টানতে টানতে মিস্ মালিনীর সামনে এসে হাজির হয়। বিস্মিত হই। বাপ-মায়ের সামনে ধূমপান—তাও কিনা এই বয়সে!

মিস্ মালিনী চুরোটটা হাতে নিয়ে ছেলের বাবাকে দেখিয়ে বলেন,

'আমার এই বয়-ফ্রেণ্ডটি একেবারে বৈচিত্র্যহীন। কোন নেশাটেশা নেই। তাই আমি ওর ছেলেকে চুরোট ধরিয়ে দিয়েছি। এখানেই শেষ নয়। ছেলে-মেয়েরা কয়েকদিন থাকবে আমার কাছে। আমরা আজ খোকসার যাচ্ছি, কাল কেলং যাব। সেখানকার ডেপুটি কমিশনার আমার বয়-ফ্রেণ্ড। তাই কয়েকদিন থাকব তার কাছে। আর সেই ফাঁকে মেয়েকে চুরোট আর ছেলেকে ড্রিঙ্কস্ ধরিয়ে দেব।' হা হা করে হাসতে থাকেন মিস্ মালিনী। মা বাবার সঙ্গে ছেলেও হাসিতে যোগ দেয়। মেয়েটিও মুচকি হাসে। অতএব আমাদেরও হাসতে হয়।

মিস্ মালিনীর বয়স বোধ করি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু কেশবিন্যাস ও কসমেটিক্সের অপর্যাপ্ত ব্যবহারের মধ্যে বয়স কমাবার একটা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা প্রকট হয়ে উঠেছে। তবে তিনি খুব বেশি সফল হন নি। যৌবনকে বাঁধতে পারেন নি। কিন্তু যৌবনের যাতনাটুকু রয়ে গেছে। চুরোট আর ড্রিঙ্কস্যের প্রতি এই আকর্ষণ সেই যাতনারই বহিঃপ্রকাশ। হয়তো বা এই পর্বতপ্রীতিও।

চুরোটপ্রীতি যে কারণেই হয়ে থাক, মিস মালিনীর চুরোটপান পর্বটি বেশ বসিয়ে উপভোগ করছিলাম আমরা। সে কি টান। ইন্দ্রনাথের (শ্রীকান্ত) সেই একটানে সিগারেট শেষ করার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তবে দুর্ভাগ্য আমাদের, বেশিক্ষণ উপভোগ করার সুযোগ পেলাম না। আমাদের চা শেষ হবার আগেই মালিনী উঠে দাঁড়ালেন, 'বাই বাই' বলে সদলবলে বেরিয়ে গেলেন হোটেল থেকে। আমরা হাতজোড় করে নমস্কার করি। দুর্ভাগ্য আমাদের, তিনি তা দেখতে পেলেন না।

বাইরে তিনটি ঘোড়া অপেক্ষা করছিল। স্বামী, স্ত্রী ও মেয়ে অশ্বারূঢ়া হলেন। ছেলেটির সঙ্গে মিস্ চললেন পদব্রজে—তিনি মাউণ্টেনিয়ার।

ওদের সঙ্গে বাহুলে আবার আমাদের দেখা হয়েছিল। দিন দুয়েক আমরা একসঙ্গে ছিলাম। ফলে মিস্ মালিনীকে আরও গভীর ভাবে জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমাদের।* কিন্তু সেই বিচিত্র কাহিনী আজ নয়। আজ কেবল রোতাং-য়ের কথা বলি। আর সেই সঙ্গে সংক্ষেপে বলে রাখি রোতাং গিরিবর্ত্মের পরপারে লাহুল ও স্পিতি পথের কথা।

রাহালা থেকে রোতাং পাঁচ মাইল। গিরিবর্ত্মটি প্রায় আড়াই মাইল দীর্ঘ।

* লেখকের 'লীলাভূমি লাহুল' দ্রষ্টব্য।

আর গিরিবর্ত্মের অপর প্রান্ত থেকে খোকসার ছ মাইল। অর্থাৎ লাহুল-স্পিতি পর্যটকদের কেবল এই সাড়ে তেরো মাইল দুর্গম পথ হাঁটতে হয় এখন।

বর্তমানে লাহুল ও স্পিতি উপত্যকায় ভ্রমণ অনেক সহজ হয়ে গেছে। রোতাং পেরিয়ে ওপারে গেলেই চন্দ্রা নদীর তীরে গ্রামফু গ্রাম। সেখান থেকে একটি মোটরপথ গেছে খোকসার হয়ে কেলং। আরেকটি গেছে চাতরু বটাল লোসার হানসে কিওতো লাতারচা কিবার ও কিযে হয়ে রংরিখ। এই পথে পড়ে কুমজুম গিরিবর্ত্ম। ১৫৩০০ ফুট উঁচু এই গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে জীপ চলে। সকালে খোকসার থেকে যে জীপ ছাড়ে তা নব্বই মাইল দুর্গম পাহাড়ী পথ পেরিয়ে সন্ধ্যের সময় বংরিখ পৌছয়। সেখানে কোন, হোটেল বা সরাই নেই। কাজেই যাত্রীদের সঙ্গে তাঁবু থাকা দরকার। রংরিখ থেকে স্পিতি মহকুমার সদর কাজা প্রায় পাঁচ মাইল। অদূর ভবিষ্যতে এই পথেও গাড়ি চলবে।

গ্রামফু থেকে চন্দ্রার তীর দিয়ে খোকসার মাইল দুয়েক পথ। খোকসার লাহুল-স্পিতি উপত্যকার প্রধান বাস স্টেশন। উচ্চতা ১০,৮০০ ফুট। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বোধ করি অবস্থানের জন্যই এমন হয়েছে। ঠাণ্ডার কথা বাদ দিলে খোকসার একটি চমৎকার উপত্যকা। রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। নিচে বয়ে যাচ্ছে চন্দ্রা, ওপরে তিনদিকে তুষারাবৃত শৃঙ্গমালা। মাঝখানে একটি সংকীর্ণ উপত্যকা। আছে দুখানি ঘর নিয়ে ডাকবাংলো, নির্মাণ বিভাগ ও মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের অফিস। আর আছে দুটি হোটেল ও একটি ডাকবাক্স। কোন ডাকঘর নেই। উপত্যকার শেষে চন্দ্রার ওপরে লোহার পুল। পুলের গোড়ায় পুলিস পাহারা। নদীর ওপারে উঁচু জমিতে কয়েকখানি বাড়িঘর।

খোকসার থেকে কেলং ৪০ মাইল। বাসে ঘণ্টা চারেক সময় লাগে। চন্দ্রা ও ভাগা নদীর তীর দিয়ে পথ। পথে পড়ে শিশু গোন্দলা ও তাণ্ডি। কেলং লাহুল উপত্যকার প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। উচ্চতা প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট। কিন্তু অবস্থানের জন্য এটি উপত্যকার উষ্ণতম স্থান। তাই এখানেই সদর করা হয়েছে।

চায়ের দাম মিটিয়ে হোটেলের বাইরে বেরিয়ে আসি। ভেতরে বসে টের পাই নি। বাইরে আসতেই বুঝতে পারি, যাঁরা দুপুরের আগে রোতাং পেরোবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তাঁরা মিথ্যে বলেন নি। ইতিমধ্যে রোতাং রূপ পালটেছে। স্বরূপ প্রকাশ করার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। নীলাকাশ

অদৃশ্য হয়েছে। অদৃশ্য হয়েছে সেই সুন্দর ছবিখানি। কে যেন চারিদিকের সব কিছু সাদা চাদরে ঢেকে দিয়েছে। দূরের পাহাড় তো দূরের কথা, কাছের পাহাড়গুলি পর্যন্ত ঢাকা পড়েছে কুয়াশা আর তুষারপাতের আড়ালে।

হ্যাঁ, তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। এতক্ষণ ছিল শিলাবৃষ্টির মতো। এখন যেন পেঁজা তুলো। আর সেই সঙ্গে বইছে হাওয়া।

বিশ্বের বহু বিখ্যাত পর্বতারোহী অতিক্রম করেছেন এই গিরিবর্ত্ম। এঁদের মধ্যে স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড ও মেজর জেনারেল ব্রুসের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্যার ফ্রান্সিস রোতাং ও লাহুল সম্পর্কে বলেছেন—'a fairly level stretch. Ahead was wide expanse of dazzling snow and above this, straight in front of me was a jagged line of rock and spiky peaks.'

জেনারেল ব্রুস ১৯১২ সালের ৩রা জুন এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তার পরে বহুকাল কেটে গেছে। মানুষ রোতাংয়ের প্রভূত পরিবর্তন সাধন করেছে। কিন্তু তাতে তার সৌন্দর্য আর স্বভাব পালটায় নি। আজও সে তেমনি সুন্দর, আজও সে তেমনি ভয়ঙ্কর।

তবে আমাদের জনৈক লাহুলী সঙ্গী জানালেন—এ হাওয়া সে হাওয়া নয়। কাজেই আমরা নিশ্চিন্তে অগ্রসর হতে পারি বিপাশার উৎস বিয়াস কুণ্ড বা বিয়াসরিখির দিকে।

ডানদিকে একটা উঁচুতে বিয়াসরিখি। গিরিবর্ত্মের উচ্চতম স্থান। সেখানে পাথর বাঁধানো ছোট একটি কুণ্ড ও একটি পাথরের মন্দির আছে। পাঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের সৈন্যদল কুলু উপত্যকা অধিকার করার পরে সেনাপতি লেহনা সিং এই মন্দিরটি নির্মাণ করে দেন। তিনি খানিকটা নিচে আরও একটি কুটির নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু বহুকাল হল সেটি ধ্বস হয়ে গেছে।

উৎস হিসেবে এটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। এর চাইতে অনেক বৈচিত্র্যময় উৎস দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। তবু আমরা চলেছি। চলেছি বিপাশাকে আরেকবার দেখব বলে।

বিপাশার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা শরতের এক স্বপ্নভরা সন্ধ্যায়। আঁকা-বাঁকা পাহাড়ী পথের পাশে কখন যে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলতে শুরু করেছিল তা ঠিক টের পাই নি। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়েছিলাম মাণ্ডির

একটু আগে। দেখা হওয়া মাত্র সে আমার সকল অবসাদের অবসান করল। আমার হৃদয় ও মন শান্ত হল। আমি কেবল তার দিকে চেয়ে রইলাম। চেয়ে চেয়ে দেখলাম তার মন-মাতানো রূপ। আর কান পেতে শুনলাম তার হৃদয়-জুড়ানো গান। তার যৌবন-চঞ্চল নৃত্যের ঝঙ্কারে আমি অপ্সরীদের স্পর্শ পেলাম।

সেই বিপাশার পাশে পাশে পথ চলেছি এতদিন, আজ তার সঙ্গে একবার শেষ দেখা করব না? তার শুভেচ্ছা নিয়ে যাব না?

॥ চার ॥

"ছি, ছি, আপনার দেরি করিয়ে দিলাম!" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মানসী বলে।

"না না, এখনও সময় আছে। অনায়াসে ঘুরে আসা যাবে। হয়তো একটু রাত হবে ফিরে আসতে। হোক না, ক্ষতি কি?" আমি বলি।

"একাই যাচ্ছেন তো?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, সঙ্গী পাবো কোথায়?"

"যদি কেউ সঙ্গী হতে রাজী হয়?"

"সানন্দে সঙ্গে নেব।"

"তাহলে শাড়িটা পালটে আসি?"

আমি মাথা নাড়ি। মানসী তাড়াতাড়ি চলে যায় নিজের ঘরে। হোটেল থেকে ফিরে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য সে নিজের ঘরে গিয়েছিল। তারপরেই এসে বসেছে আমার ঘরে। বসে বসে গল্প করেছে আর গল্প শুনেছে। গল্পের মাঝে যে কয়েকটা ঘণ্টা কেটে গেছে কেউ টের পাই নি। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খেয়াল হয়েছে মানসীর। আমি তাকে বলেছিলাম, বিকেলে মাউণ্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট, শেরপা গাইড স্কুল ও বশিষ্ঠ কুণ্ড দেখতে যাব।

আমার অনুমানকে মিথ্যা প্রমাণ করে আমার আগে তৈরি হয়ে আসে মানসী। হেসে বলে, "সে কি, এখনও হয়নি আপনার?"

"এই হয়ে এলো বলে।" আমি তাড়াতাড়ি করি। মনে মনে ভাবি—যে মহামুনি 'পথি নারী বিবর্জিতা' উপদেশটি দিয়ে গেছেন, তিনি মানসীর মতো মেয়ের সংস্পর্শে আসেন নি।

কয়েক মিনিট বাদে বেরিয়ে পড়ি পথে। ছায়া-ঘন পথ বেয়ে পাশাপাশি চলছি দুজনে। কেন যেন মানসী কোন কথা বলছে না। আমি আর চুপ করে থাকতে পারি না। বলি, "এমন গম্ভীর কেন ?"

গম্ভীর স্বরেই জবাব দেয় মানসী, "ভাবছি।"

"কার কথা ?"

"আপনার।"

চমকে উঠি। মানালীর নির্জন পথ। অস্তাচলগামী ক্লান্ত সূর্যের ম্লান আলোয় মোহময়ী পথ। এ সময়ে এমন কথা।—

তবু স্বাভাবিক স্বরে বলি, "আমার কথা না ভেবে নিজের কথা বলুন।"

"নিজের কথাই তো বললাম।" মানসী হাসে।

"এ কথা শুনতে চাইছি না। আমি জানতে চাইছি—আপনি কেন এমন একা একা হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এই উৎকট শখের কারণ কি ?"

"শখ নয়, বলুন নেশা।"

"বেশ। কিন্তু নেশার কারণ কি ?"

"ভালোবাসা। আমি হিমালয়কে ভালবাসি। তাই বার বার তার কাছে ছুটে আসি। হিমালয়ের পথ তো কেবল আমার অবকাশ যাপনের বিলাসভূমি নয়, আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থ।"

"তাহলে হিমালয়ের পথে দাঁড়িয়ে আমার কথা ভাবছেন কেন ?"

"ভাবছি কারণ, যাদের লেখা পড়ে আমি হিমালয়ের প্রতি আকৃষ্টা হয়েছি, আপনি তাদের অন্যতম। কি সৌভাগ্য আমার, আজ আপনার পাশে পাশে পদচারণা করছি হিমালয়ের পথে।"

কি বলব ? চুপ করে থাকি। নীরবে নেমে আসি তে-মাথার মোড়ে। বাঁদিকের পথ ধরে চলতে থাকি ধীরে ধীরে।

হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "আপনি নিশ্চয়ই জোসেফাইন স্কারের 'ফোর মাইলস হাই' বইখানি পড়েছেন ?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা মেজর বেনন্ কি এখনও বেঁচে আছেন ?"

"না, তাঁর ছেলেরা বেঁচে আছেন। তাদের পদবী বেনন হলেও তারা কিন্তু হিন্দু। তবে তাঁর কথা কেন ? লর্ড কারজনের কাহিনী শুনতেন ?"

"না। মেজর জেনারেল ব্রুস ও স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ডের কথা শুনতাম।"

"তাঁদের কথা কিছু কিছু আমিও বলতে পারি, অবশ্য যদি আপনি শুনতে রাজী থাকেন।"

"খুব বিনয় করা হচ্ছে, না? আর কথা না বাড়িয়ে বলতে শুরু করুন দেখি।"

পথ চলতে চলতে বলতে শুরু করি—

স্যার ফ্রান্সিস এডওয়ার্ড ইয়ংহাজব্যাণ্ডকে হিমালয় অভিযানের পথিকৃত বলা যেতে পারে। ১৮৮৫ সালে তিনি গিলগিট এজেন্সীর প্রতিষ্ঠা করে তৎকালীন সীমান্ত রাজ্য হুঞ্জা ও নাগিরের প্রথম সমীক্ষা করেন। তবে হিমালয়ের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছিল আরও আগে। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর। বৃটিশ সম্রাটের ড্রাগন গার্ড বাহিনীর তিনি একজন লেফটেন্যান্ট—রাওয়াল-পিণ্ডিতে কর্মরত। ওপর থেকে নির্দেশ এলো, ছুটি নিতে হবে। উনিশ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছেন—সবাইকে ছেড়ে এসেছেন। কোথায় ছুটি পেলে ঘরে যাবেন, প্রিয়জনের মাঝে ছুটি কাটাবেন তা নয়, তিনি রওনা হলেন হিমালয়ের পথে। অমৃতসর হয়ে পাঠানকোট এলেন—শুরু হল হিমালয়ের পথে পদচারণা। ধরমশালা কাংড়া বৈজনাথ ও সুলতানপুর অর্থাৎ কুলু হয়ে রোতাং গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে সেবারে তিনি লাহুল পর্যন্ত গিয়েছিলেন।

ইয়ংহাজব্যাণ্ড ১৮৮৭ সালে কারাকোরাম গিরিশ্রেণীর ১৮০০০ ফুট উঁচু দুর্লঙ্ঘ্য গিরিবর্ত্ম মুজটাঘ অতিক্রম করে বালতোরো হিমবাহ ও বালতিস্থান হয়ে কাশ্মীরে আসেন। তাঁকে কারাকোরাম সমীক্ষার জনক বলা হয়। ইতিপূর্বেই তিনি গোবি মরুভূমি পেরিয়ে ইয়ারখন্দে গিয়েছিলেন।

১৮৮৯ সালে ইয়ংহাজব্যাণ্ড সালতোরো গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। ১৮৯০ সালে তিনি জর্জ ম্যাকার্টনীর সঙ্গে পামীর পরিদর্শন করেন। ১৯০৩-৪ সালে তিনি তিব্বতে যান। ১৯০৯ সালে কাশ্মীর হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দর পরিক্রমা করেন।

তিনি ১৯২০ সালে রয়াল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে এভারেস্ট কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন। তাঁরই আন্তরিক আগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রথম এভারেস্ট অভিযান সম্ভব হয়।

"সত্যিই বিস্ময়কর!" আমি থামতেই মানসী বলে ওঠে।

"এর থেকেও বড় বিস্ময় কি জানেন?"

"কী?"

"এরা আমাদের মতো কেবল হিমালয়-শিখরে পতাকা প্রোথিত করেই

পর্বতাভিযাত্রীর কর্তব্য শেষ করেন নি। অনাবিষ্কৃত হিমালয়কে আবিষ্কার করে, সেই আবিষ্কারের কথা ও কাহিনী অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন আমাদের জন্য। অথচ দুর্ভাগ্যের কথা, আমরা তাঁদের সেই মহান আদর্শ অনুসরণ করতে পারছি না।"

"সত্যি।" মানসী মন্তব্য করে। সে বলে যায়, "এ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে পনেরোটি পর্বতাভিযান পরিচালিত হয়েছে কিন্তু বই লেখা হল মাত্র দু'খানি।" একবার থামে মানসী। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে, "অবশ্য আমার দিক থেকে দুঃখের কিছু নেই, দু'খানি বইয়ের একখানির লেখকের সঙ্গে আজ হিমালয়ের পথে পদচারণা করছি আমি—সত্যি আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে·····আপনাকে আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না।"

"দরকারও নেই। তবে আপনার আনন্দে আমিও আনন্দিত হলাম।" একটু থেমে আবার বলি, "কিন্তু আমরা এখন যাঁর আলোচনা করছি, সেই অমর অভিযাত্রী ইয়ংহাজব্যাণ্ড তাঁর অসংখ্য অভিযান ও সংখ্যাতীত কাজের মাঝেও কতগুলো বই লিখেছেন জানেন?"

"কখানা?" মানসী প্রশ্ন করে।

"তা কম করেও খান বিশেক।"

"আপনি সবগুলো পড়েছেন?"

"না। তবে তাঁর কয়েকখানা বই আমি পড়েছি, যেমন—'The Epic of Mount Everest', 'Everest : the Challenge', 'Wonders in the Himalaya', 'India and Tibet', 'Kashmir', 'Peking to Lasha'—ইত্যাদি।"

"তিনি কি কেবল হিমালয়ের ওপরেই লিখেছেন?"

"না, না—সমাজনীতি, ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, এমন কি রম্যরচনা পর্যন্ত লিখেছেন।" আমি চুপ করি।

কিন্তু আমাকে চুপ করে থাকতে দেয় না মানসী। সে বলে ওঠে, "এবার তাহলে জেনারেল ব্রুসের কথা বলুন।"

আমি শুরু করি—

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বোলর্স গ্রানভিল ব্রুসের কথাও সর্বকালের হিমালয় অভিযাত্রীরা পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। ১৯২১ সালের প্রথম এভারেস্ট অভিযানে তাকেই নেতার পদে বরণ করা হয়েছিল, কিন্তু প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে

তিনি এই অভিযানে যোগদান করতে পারেন না। হাওয়ার্ড বিউরি এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

ব্রুস অবশ্য ১৯২২ সালের এভারেস্ট অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ১৯২৪ সালের তৃতীয় এভারেস্ট অভিযানের নেতা নির্বাচিত হন। কিন্তু পদযাত্রার প্রথম দিকেই তিনি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত জেনারেল ই. এফ. নর্টন এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। এই অভিযান-কালেই জর্জ এল. ম্যালোরী ও এনড্রু আরভিন চিরকালের মতো হারিয়ে গেছেন।

ব্রুস গুর্খা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন। ভারতের প্রতিরক্ষায় পর্বতারোহণের প্রয়োজনীতা উপলব্ধি করে তিনি তাঁর সৈন্যদের পর্বতারোহণ শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। তাঁর সেই সব গুর্খা পর্বতারোহীরা সেকালের বহু অভিযানে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিলেন। ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ, এরিক ই. শিপটন, হিউ রাটলেজ, এইচ. ডাবলু. টিলম্যান ও ডাঃ টি. জি. লংস্টাফের মতো তিনিও মনে করতেন যে পর্বতারোহণ কেবলমাত্র শারীরিক কৌশল নয়, একটি সুকুমার কলা।

জেনারেল ব্রুস পঁয়ত্রিশ বছরের অধিককাল হিন্দুকুশ ও হিমালয়ের দুর্গম গিরি-কান্তারে পদচারণা করেছেন। ১৮৯০, ১৮৯৪, ও ১৮৯৫ সালে তিনি কাশ্মীরের বহু অপরাজিত পর্বতশিখরে আরোহণ করেন। নাঙ্গাপর্বত ও ত্রিশূল সহ হিমালয়ের বহু উল্লেখযোগ্য সমীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। ১৯১২ সালে ব্রুস প্রথম মানালী আসেন। তখনই তাঁর সঙ্গে মেজর বেননের পরিচয় হয়।

"সত্যি এরাই প্রকৃত হিমালয়-প্রেমিক। অমন দুঃসহ কষ্ট সহ্য করে তাঁরা যদি হিমালয়ের পথে পথে না বেড়াতেন, তাহলে আজও হয়তো হিমালয়ের অনেক অংশ আমাদের অজানাই রয়ে যেত।" মানসী মন্তব্য করে।

"ব্রুস কিন্তু কি বলেছেন জানেন?"

"কী?"

"বলেছেন, 'I have not been able to do more than pierce these vast ranges, as one might stick a needle into bloster, in many places; for no one can lay claim to a really intimate knowledge of Himalaya'……?"

জেনারেল ব্রুসও নিশ্চয়ই অনেক বই লিখে গেছেন!" মানসী বলে।

"ইয়াংহাজব্যাণ্ডের মতো সংখ্যায় অত না হলেও লিখেছেন বৈকি, তাঁর

'Twenty Years in the Himalaya', 'Himalayan Wonderer', 'The Land of Gurkhas', 'Kulu and Lahoul' ও 'The Assult on Mount Everest—1922' প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশ্ব-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।"

কথা বলতে বলতে আমরা বিপাশার পুল পেরিয়ে এসেছি। বাঁদিকে রাহালা ও ডানদিকে নাগরের বাসপথ। গতকাল রাহালা থেকে মানালী এসেছি আমি। আগামীকাল সকালে নাগর যাব।

আমরা রাহালার পথে এগিয়ে চলেছি। বিপাশার তীর দিয়ে পথ। বাঁ দিকে বিপাশা, ডানদিকে পাহাড়। আধ মাইল এসে সরু একটি পায়ে-চলা পথের ধারে পৌছলাম। পথটি পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে। এইটেই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের পথ। আশ্চর্য! পথের ধারে একটা সাইনবোর্ড পর্যন্ত নেই। জন-বিরল পথ। অনেক সময়েই জেনে নেবার মানুষ পাওযা যায না। বাসপথ থেকে শিক্ষাকেন্দ্র দেখাও যাচ্ছে না। কাজেই নতুন লোকের পক্ষে খুঁজে পাওযা কঠিন। আমি সেদিন রাহালা যাবার পথে রাস্তাটা দেখে গিয়েছিলাম। তাই আজ চিনতে পারলাম।

পায়ে-চলা সেই সরু চড়াই পথটি ধরে আমরা উঠে এলাম ওপরে। এটি সংক্ষিপ্ত পথ। মোটর পথটি এসেছে অনেকটা ঘুরে।

কযেক কাঠা সমতল জায়গা। কযেকটি ছোট ছোট বাড়ি আর বাগান নিয়ে শিক্ষায়তন। ১৯৬১ সালে চণ্ডীগড়ে প্রথম শিক্ষাযতন প্রতিষ্ঠিত হয। পরে নিয়ে আসা হয় এখানে, এই চিখিয়ারীতে। ১লা নভেম্বার (১৯৬৬) থেকে এই শিক্ষায়তনের নাম হয়েছে—Western Himalayan Institute of Mountaineering & Allied Sports.

মোটেই জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান নয় এই শিক্ষায়তন। এখানকার বেসিক কোর্সের শিক্ষাকাল দার্জিলিং ও উত্তরকাশীর চেযে কম। ফি-ও অল্প। কিন্তু এখানকার শিক্ষা খারাপ নয়। খাওয়া থাকাও ভাল। অবস্থানের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে। মানালী শিক্ষাকেন্দ্রের অবস্থানই কর্তৃপক্ষের প্রধান সহায়। এখান থেকে মাত্র এক দিন হেঁটেই পৌছনো যায় পর্বতারোহণ শিক্ষার মূল-শিবির বিয়স কুণ্ডে। আর শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গেই রয়েছে শৈলারোহণ শিক্ষা দেবার কয়েকটি আদর্শ স্থান।

তিনটি বেসিক ও দুটি এ্যাডভান্স মাউন্টেনিয়ারিং কোর্স ছাড়াও একটি করে এ্যাড়ভেঞ্চার, ইন্‌স্ট্রাকটর, স্কি, ও রক্ ক্লাইম্বিং কোর্স হয় এখানে। বেসিক কোর্স পঁচিশ দিনের ও এ্যাডভান্স কোর্স চল্লিশ দিনের। শিক্ষার্থীদের যথাক্রমে

আড়াইশ' ও চারশ' টাকা করে ফি দিতে হয়। দু'জন ইনস্‌ট্রাক্‌টর আছেন এখানে।

দেখা হল ইনষ্টিটিউটের ইন্‌সট্রাক্‌টর শ্রীজ্ঞানচাঁদের সঙ্গে। বিখ্যাত পর্বতারোহী তিনি। কয়েকটি অভিযানে অংশ নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। কিন্তু পত্রালাপ আছে। নাম বলতেই চিনলেন আমাকে। মানসীর সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিলাম। বলতে হল, মানসী আমার পূর্ব পরিচিতা। কাল মানালীতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়েই বললাম কথাটা। অসিতবাবুরা স্পিতি থেকে ফেরার পথে একটা দিন কাটাবে মানালীতে। সেদিন নিশ্চয়ই তারা আসবে এখানে। দেখা হবে জ্ঞানচাঁদের সঙ্গে। মানসীর কথা শুনে তারা কি ভাববে কে জানে?

জ্ঞানচাঁদের সঙ্গে আমরা শিক্ষায়তন পরিক্রমায় বের হই। অফিস থেকে হোস্টেল ও ক্লাসরুম দেখে মিউজিয়ামের সামনে আসি। দুর্ভাগ্য আমাদের মিউজিয়াম বন্ধ। দ্বারোয়ান চাবি নিয়ে বাজারে গেছে। কখন আসবে ঠিক নেই।

মিউজিয়াম মানে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানি মাঝারি আকারের টিনের ঘর। জানালা দিয়ে যতটা সম্ভব দেখে নিলাম। চারিদিকের দেয়ালে টাঙানো রয়েছে কয়েকখানি ছবি। এক পাশে বড় একটা টেবিলের ওপরে সাজানো আছে পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম। আর মেঝের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে হিমতীর্থ-হিমাচলের একটি মাটির মডেল। ভারী সুন্দর। এইটি দেখার জন্য অন্তত প্রত্যেক পর্যটকের একবার এখানে আসা উচিত।

আমরা ফিরে চলি। জ্ঞানচাঁদ আমাদের এগিয়ে দেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেন, "ঠিক কথা আমূলের কি খবর, সে কেমন আছে?"

আমূল মানে নীলগিরি অভিযানের নেতা, পঞ্চচুলি ও চন্দ্রপর্বত বিজয়ী অমূল্য সেন। বলি, "অমূল্য ভাল আছে। আপনি তাকে চেনেন দেখছি।"

"চিনব না কেন?" জ্ঞানচাঁদ বলেন, "আমরা যে প্রি-এভারেস্ট অভিযানে সহযাত্রী ছিলাম। তাছাড়া প্রায় প্রত্যেক পর্বতারোহীই আমূলকে জানে।"

কথায় কথায় জ্ঞানচাঁদ বলেন, "হিমালয় তো কেবল দেবতাত্মা নয়, সে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার। তাই হিমালয়ের দিকে শত্রুর এমন প্রখর নজর। এতকাল সে ছিল আমাদের সীমান্তরক্ষী, এখন তাকে রক্ষা করার জন্য সীমান্তরক্ষীর প্রয়োজন হচ্ছে। এজন্য যেমন পর্বতারোহণ শিক্ষার প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন হিমালয়ের সঙ্গে সুপরিচিত হওয়া। দুঃখের কথা আমরা

পর্বতশিখরে আরোহণ করছি কিন্তু পর্বতের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি না। হিমালয়কে জানতে হবে। তার রহস্য উদ্ধার করে—তাকে আবিষ্কার করতে হবে। তারপরে হিমালয়ের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে সকল ঐশ্বর্য আহরণ করে এই দরিদ্র দেশের দারিদ্র্য মোচন করতে হবে। তবেই সার্থক হবে প্রকৃত পর্বতারোহণ।"

থামলেন জ্ঞানচাঁদ। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই মানসী বলে ওঠে, "বিশেষ করে গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলের বিশদ বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। কারণ গঙ্গোত্রী ও তার শাখা হিমবাহদের নিয়ে হিমালয়ের বৃহত্তম ও বিশ্বের বিচিত্রতম হিমবাহ অঞ্চল। এই হিমবাহ-অঞ্চলের তিন দিক থেকে সৃষ্ট হয়েছে ভাগীরথী অলকানন্দা ও মন্দাকিনী। এই তিন নদীর মিলিত ধারাই গঙ্গা। যে বিগলিত-করুণা গঙ্গা সমগ্র উত্তর ভারতের প্রাণধারা।"

মানসীর ভাষা ও বক্তব্যে খুশি হন জ্ঞানচাঁদ। গর্ববোধ করি আমি।

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন জ্ঞানচাঁদ। বলেন, "ঠিক কথা, মিস্টার রায় মানে নিতাই রায় আপনাদের খোঁজ করছিলেন।"

"নিতাই রায়, মানে যিনি নীলগিরি পর্বতে আরোহণ করেছেন?" মানসী মাঝখান থেকে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" জ্ঞানচাঁদ বলেন।

"তিনি এখানে এসেছেন নাকি?" মানসী প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। তিনি তো আমাদের এ্যাডভান্স কোর্সে গেছেন। পরশুদিন ওঁরা পাহাড়ে রওনা হয়ে গেছেন। যে ক'দিন এখানে ছিলেন, রোজই আপনাদের খোঁজ করতে ট্যুরিস্ট অফিসে যেতেন।"

মনটা খারাপ হয়ে যায়। দুটো দিনের জন্য দেখা হল না নিতাইয়ের সঙ্গে।

নজর পড়ে মানসীর দিকে। ভাবি ভালই হল। নিতাই আমার ছোট ভাইয়ের মতো। মানসী রয়েছে আমার সঙ্গে। কত কি ভাবতে পারত সে।

জ্ঞানচাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বড় রাস্তায় নেমে আসি আমরা। রাহালার পথ ধরেই এগিয়ে চলি। কথাটা না বলে আর থাকতে পারি না। মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি নিতাইকে চেনেন নাকি?"

"হ্যাঁ।" মানসী মৃদু হেসে উত্তর দেয়।

"কে পরিচয় করে দিল?" আমি প্রশ্ন করি।

"আপনি।"

"আমি?" বিস্মিত হই। "আমি আবার কোথায় আপনার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম?"

"কেন, আমার পড়ার ঘরে।" মানসী তেমনি হাসে।

"আপনার পড়ার ঘরে? আমি? কবে গেলাম?" আমার বিস্ময় বাড়ে!

"আপনি যান নি, আপনার লেখা বই গেছে। আমি 'নীল-দুর্গম' পড়েছি, কাজেই নিতাই রায় আমার অপরিচিত নয়।"

আর কোন কথা না বলে নীরবে পথ চলতে থাকি। ভাবতে ভাল লাগছে মানসী আমার প্রিয় পাঠিকা। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে হিমালয়ে। তার সঙ্গে আমি পদচারণা করছি হিমাচলের পথে পথে।

পথের ডান দিকে দেওদারে ছাওয়া পাহাড়, বাঁয়ে উচ্ছ্বসিত বিপাশা, সামনে হিমতীর্থ-হিমাচল। মাথার ওপরে নীলাকাশ। আকাশ নয়, সুনীল চন্দ্রাতপ। তার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে দু'-একখানি ছোট ছোট মেঘ। মেঘ নয়, যেন বলাকা।

বৈকালী রোদ বর্ণালী আমেজ ছড়িয়েছে কালো পাহাড়ে, সবুজ বনে আর বিপাশার রুপোলী জলে। আকাশ নীরব, পাহাড় নীরব, এমন কি নীরব ঐ দেওদার বন। কিন্তু ওদের সবার মুখপাত্র হয়ে কথা বলছে বিপাশা। কথা নয় গান—হিমতীর্থ-হিমাচলের জয়গান।

সহসা কথা বলে মানসী। বাংলায় নয়, ইংরেজীতে। আমাকে কিছু বলে না, কথা বলে যায় আপন মনে। আমি কেবল নীরবে শুনি। মানসী বলে—

'Light-heartedly we wandered along, drinking in the Sunshine, the brilliant blue sky and scudding clouds, the tall deodars climbing towards dark rocky ridges, the lush meadows and sparkling river. Starting as a tiny spring just below Rhotang Pass the River Beas surges down the Kulu Valley, curves a tortuous passage through the foothills and emerges, muddy but triumphant, to roll accross the Indian plains.'

থামে মানসী। বলি, "আপনি দেখছি 'কোর মাইল্‌স হাই' বইখানা

খুবই ভাল করে পড়েছেন, একেবারে মুখস্থ করে রেখেছেন।"

"ভাল করে পড়েছি বই কি। দুটি মেয়ে সুদূর ইংলণ্ড থেকে ল্যাণ্ড রোভার চালিয়ে মানালী এলো। তার পরে বড়া শিগরি হিমবাহে গিয়ে একাধিক পর্বতশিখরে আরোহণ করল। এই অসাধারণ কীর্তির কাহিনী মন দিয়ে পড়ব না? তবে কি জানেন, মুখস্থ করব বলে মুখস্থ করি নি। মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু সব সময় এমন মুখস্থ বলা যায় না। মনে পড়ে না। এর জন্য পরিবেশের প্রয়োজন। এরকম পরিবেশ তো আর কখনও পাই নি। তাই এমন বলতে পারছি।"

"কি রকম?"

"এই মোহময়ী পথ, আর মনের মতো সঙ্গী। পথ আর সাথী আজ আমার মনের বন্ধ দুয়ার দিয়েছে খুলে।" মানসী থামে।

আমি নীরবে পথ চলি।

কিন্তু মন স্থির থাকতে পারে না। সে স্মৃতির সমুদ্রে অবগাহন করে। ভেবে চলি—ইয়ংহাজব্যাণ্ডের সেই প্রথম হিমালয় পরিক্রমা, প্রায় পঁচাশি বছর আগের কথা। তিনি লিখেছেন, 'Bashist,···the typical Alpine scenery with snowy mountains rising on the either side, and in front of me, at the head of the valley, a massive mountain 20,000 feet in height. The mountain sides were every where covered with Pine forests, and Pines grew even out of the steep cliffs on any little projecting piece of rock and magnificent waterfall fell from the mountain heights·· I delightedly drank it all in, and let it sink deeper and deeper within me.'

পঁচাশি বছর আগের বর্ণনা কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আজকের কথা। সেই একই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

তবে হ্যাঁ, পরিবর্তন হয়েছে বৈকি। হিমালয়ের নয়, প্রকৃতির নয়, মানুষের তৈরি জনপদের। সেকালে বশিষ্ঠই ছিল এ অঞ্চলের বৃহত্তম জনপদ। মানালীর কোন উল্লেখ নেই ইয়ংহাজব্যাণ্ডের লেখায়। বর্তমানের জনবহুল মানালী ছিল জনহীন। জনবসতি ছিল আরও ওপরে মন্দারকোটে। তাই ইয়ংহাজব্যাণ্ড এখানে এসেই রাত্রিবাস করেছিলেন।

বশিষ্ঠ অতি প্রাচীন জনপদ। কথিত আছে কোন কারণে জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে বশিষ্ঠদেব বিপাশায় ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু বিপাশার সাধ্য কি

মহামুনির প্রাণনাশ করে। পরম শ্রদ্ধাসহকারে সে তার তরঙ্গবাহু দিয়ে বশিষ্ঠদেবকে তীরে তুলে দিল, রেখে গেল এইখানে। আশ্রম নির্মাণ করে মহামুনি বাস করতে থাকলেন এই রমণীয় স্থানে। তাঁর সেই আশ্রমকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই গ্রাম। এখন গ্রামের নাম বশিষ্ঠকুণ্ড। কিন্তু কুণ্ড এখান থেকে কিছু দূরে।

গাঁয়ের পথ এসে মিশেছে বাসপথে। বাসপথে কয়েকখানি দোকান আর গাঁয়ের পথের দুধারে বাড়ি-ঘর। খানিকটা এগিয়েই বাঁ দিকে বিখ্যাত পর্বতারোহী ওয়াংদির 'শেরপা গাইড স্কুল'।

এটি কেবল পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র নয়। হিমাচলের দুর্গম পথযাত্রীদের সে সাহায্য করে। অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক ও সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তাদের পদযাত্রাকে সফল করে তোলে।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য আছে এই বিদ্যালয়ের। এখানে শীতকালে 'স্কি' কোর্স হয়।

ওয়াংদি ইয়োরোপ প্রত্যাগত অভিজ্ঞ শেরপা। সে অনায়াসে কোন পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতা করতে পারে। কিন্তু ওয়াংদি সেই বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন না করে প্রতিষ্ঠা করেছে এই শিক্ষায়তন। নিজের সমস্ত সম্বল সে নিঃশেষ করেছে এর পেছনে। ছাত্র সংখ্যা সামান্য। যা আয় তাতে খরচ কুলোতে চায় না। আর্থিক অসুবিধার জন্য বিয়ে পর্যন্ত করে নি। তবু পর্বতারোহণ প্রসারের প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয় নি।

আমাকে দেখে ভারী খুশি হয় ওয়াংদি। সে আমাদের ওপরে নিয়ে আসে। বাড়ির সামনে সুন্দর বাগান করেছে। মাসিক পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় সে এই বাড়িটা নিয়েছে।

নানা গল্প করে ওয়াংদি। আমাদের কফি ও বিস্কুট খাওয়ায়। মানসী পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম দেখতে চায়। সযত্নে সব কিছু দেখায় ওয়াংদি। তার পরে আমাদের এগিয়ে দিতে গেট পর্যন্ত আসে। বলি, "অশেষ ধন্যবাদ এবার তাহলে আসি। আমরা একবার বশিষ্ঠকুণ্ডে যাব।"

"তাই নাকি। তাহলে একটু দাঁড়ান। আমিও যাব আপনাদের সঙ্গে।"

"না না। তুমি আবার কেন যাবে? তোমার তো কাজ রয়েছে।"

"কোন কাজ নেই।" ওয়াংদি বলে, "কাল কোর্স চলে গেছে। এখন আমার অফুরন্ত অবসর। তাছাড়া আমাকে যে একবার যেতেই হবে কুণ্ডে। আজ সেখানে মহোৎসব হচ্ছে। নেমন্তন্ন করে গেছে। ওরা যে বড়ই

ভালবাসে আমাকে। ওদের সাহায্য ও সহযোগিতা না পেলে, কবে আমাকে এ স্কুল বন্ধ করে দিতে হত।"

"আচ্ছা সরকার তোমাকে কোন সাহায্য করেন নি?"

"এখন পর্যন্ত না। তবে পাঞ্জাব সরকার রাজী হয়েছিলেন বিয়াসের তীরে কয়েক বিঘা জমি দিতে। কিন্তু সরকার যে বদলে যাচ্ছে। মানালী হিমাচল প্রদেশে চলে যাচ্ছে। তখন আবার কি হবে, কে জানে! যাক্ গে, আমি এখুনি আসছি।"

ওয়াংদি চলে যায় ভেতরে। মানসী এক মনে ওয়াংদির বাগান দেখছে। কাছে গিয়ে বলি, "কি, কবরীতে কুসুম রচনা করার মতলব হচ্ছে নাকি?"

"হলেই বা দিচ্ছে কে?"

"কেন এই অধম। নাই বা হলেম কবি। তবু তো করজোড়ে কামনা করতে পারি—আমি তব মালঞ্চের হবো মালাকর।"

একটি ফুল তুলে মানসীর হাতে দিই। মৃদু হেসে ফুলটি খোঁপায় গোঁজে মানসী। বিপাশার পরপারে পাহাড়ের পেছনে সূর্য অদৃশ্য হয়। সে যেন মানসীর কবরী রচনা দেখার জন্যই এতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল।

একটু বাদে ওয়াংদি ফিরে এলো। বলল, "চলুন যাওয়া যাক।"

আমরা রাস্তায় এলাম। এগিয়ে চললাম গাঁয়ের ভেতরে।

মানসী এতক্ষণ ওয়াংদির সঙ্গে সামান্য কথা বলেছে। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এবারে পথে নেমেই সে ওয়াংদিকে বলে, "না জানিয়ে আপনার বাগান থেকে একটা ফুল নিয়েছি।"

"জেনে খুশি হলাম।" ওয়াংদি বলে, "ফুলটা সৎ কাজে লাগল।"

"তা এখনও কাজে লাগাবার আসল মানুষটিকে নিয়ে আসছেন না কেন?" মানসী হাসে।

"আমার যে অনেক কাজ। এই বিদ্যালয়কে বড় করে তুলতে হবে, পর্বতারোহণকে জনপ্রিয় করতে হবে, হিমালয়ের মানুষদের জীবনে উন্নতি আনতে হবে।"

"যাঁকে নিয়ে আসতে বলছি, তিনি তো এসব আদর্শ রূপায়ণে আপনাকে সাহায্যও করতে পারেন।"

"তা পারে, তবু ভয় হয়। যদি সে আমার মতো দুঃখ-কষ্ট সইতে না পারে।"

"এ আপনার ভুল ধারণা মিস্টার ওয়াংদি। এ দেশের মেয়েরা স্বামীর

সঙ্গে বনবাসিনী হয়েছে, যমরাজের সঙ্গে বিবাদ করেছে। আমি বলছি, বিয়ে করলে আপনার ভালই হবে।"

ওয়াংদি কোন জবাব দেয় না। বোধহয় বুঝতে পেরেছে মানসীর সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করার যোগ্যতা নেই তার। তাই সে মানসীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।

আর মানসী। সেও হাসছে, আত্মপ্রসাদের হাসি। বিশ্বের নারীজাতির প্রতিনিধিত্ব করে ওয়াংদিকে পরাজিত করেছে সে।*

মানসী কিন্তু চুপ করে থাকে না। সে ওয়াংদিকে জিজ্ঞেস করে, "আপনার স্কুলে মেয়েরা ট্রেনিং নেয়?"

"দু'জন নিয়েছেন। তবে মেয়েদের জন্য আলাদা কোন কোর্স নেই। তাঁরা একজন ভাই ও একজন স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন।"

অনেকক্ষণ চুপ করে আছি। চুপ করে ওদের কথাবার্তা শুনছিলাম। এবারে মানসীকে বলি। ওয়াংদি যাতে বুঝতে পারে, তাই ইংরেজিতেই বলি, "মাউণ্টেনিয়ার হবার সদিচ্ছা আছে কি?"

"থাকলে ক্ষতি কি? কি বলুন মিস্টার ওয়াংদি?"

ওয়াংদি কোন উত্তর দেবার অবকাশ পায় না। আমরা কুণ্ডের সামনে পৌঁছে গেছি। গ্রামবাসীরা সবাই সমবেত হয়েছে এখানে। ভেতরে ও বাইরে বেশ ভিড়। তাদেরই কয়েকজন আমাদের দেখে ছুটে এলেন কাছে। ওরা সবাই ওয়াংদির পরিচিত। নমস্কার বিনিময়ের পরে ওয়াংদি আমাদের সঙ্গে ওদের পরিচয় করে দেয়। ওরা অনুরোধ করেন, "আজ আমাদের বাৎসরিক উৎসব। দয়া করে যদি একটু প্রসাদ নেন বড়ই বাধিত হব।"

"না, না। তোমাদের ও-সব রান্না খেতে পারবেন না এরা।" ওয়াংদি আপত্তি করে, "এরা কলকাতার লোক।"

আমি চুপ করে থাকি। কিন্তু মানসী হিন্দীতে বলে ওঠে, 'কেন খেতে পারব না, খুব পারব। আমরা আপনাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম।"

গ্রামবাসীরা খুশি হন। তাঁরা আমাদের নিয়ে চলেন ভেতরে।

মানসী আমার কাছে এসে আস্তে আস্তে বলে, "আপনার কোন আপত্তি নেই তো?"

---

* জানি না মানসীর বক্তব্য ওয়াংদির মনে সেদিন কোন প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা তবে ওয়াংদি শেষ পর্যন্ত বিয়ে করেছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, কিছুদিন আগে ওয়াংদি অকালে স্বর্গারোহণ করেছে।

"থাকলেই বা কি এসে যাচ্ছে? আপনি যে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন।"

"তা যা বলেছেন। পড়েছেন মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।"

সংকীর্ণ একটি তোরণ পেরিয়ে আমরা বাঁধানো অঙ্গনে উপস্থিত হই। পথের পাশেই অঙ্গন। অঙ্গনের ডানদিকে কুণ্ড—উষ্ণকুণ্ড। ১৪ ফুট দীর্ঘ, ১২ ফুট প্রশস্ত ও ৩ ফুট গভীর একটি জলাশয়। জল থেকে ধোঁয়া উঠছে, গন্ধকের গন্ধ আসছে। শুনেছি এই স্বাদহীন জলে কয়েকদিন নিয়মিত স্নান করলে বাত সেরে যায়। গলগণ্ড রোগেরও নাকি মহৌষধ এই কুণ্ডবারি। তবে আক্রান্ত হবার পরেই রোগীকে নিয়ে আসতে হয়।

স্নানের ঘাট দু অংশে বিভক্ত। মেয়েদের অংশ দেয়াল-ঘেরা। সামনের অংশ ছেলেদের স্নানের জন্য। কুণ্ডের পরে মন্দিরপ্রাঙ্গণ। সেখানে একদল মেয়ে-পুরুষ ও ছোট ছেলে-মেয়েরা খেতে বসেছে।

জনৈক গ্রামবাসী বলেন, "এইমাত্র বৈঠক পড়েছে। চলুন এই সঙ্গে আপনারাও বসে যাবেন।"

"না।" মানসী আপত্তি করে। "আমি স্নানটা সেরে নিই।"

"স্নান!" কেউ কিছু বলার আগেই আমি বলে উঠি, "এই অসময়ে স্নান করবেন কি?"

"পুণ্যস্নানের কি সময় অসময় আছে নাকি?" মানসী উত্তর দেয়।

"কিন্তু কাপড-চোপড?" জিজ্ঞেস করি।

"আছে, মশাই আছে।" বলে কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের থলিটা দেখিয়ে দেয় মানসী।

অনেকবার ভেবেছি, ঝোলাটায় কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠে নি। বশিষ্ঠকুণ্ডে আসব শুনেই স্নানের জন্য তৈরি হয়ে এসেছে মানসী। যাক্ গে, স্নান করে যদি সে শান্তি পায়, করুক না। শান্তির জন্যই নাকি তার হিমাচল পরিক্রমা।

"তাহলে যান, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিন।" আমি বলি।

"যাক্ অনুমতি পাওয়া গেল। বড় ভয় ছিল, পাছে আপনি আপত্তি করেন।" মানসী খুশি হয়। ভ্যানিটি ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে একটু মুচকি হেসে চলে যায় দেয়ালের ও-ধারে।

ওর শেষ কথাগুলো বারবার কানে বাজছে। মানসীর ভয় ছিল, আমি স্নানের অনুমতি দেব না। আমার অনুমতির কি প্রয়োজন তার? কেবল কি সঙ্গে এসেছি বলে?

"চলুন আমরা ওদিকে গিয়ে দাঁড়াই।" ওয়াংদি বলে।

তাই ভাল। ওয়াংদির সঙ্গে কুণ্ডের তীর দিয়ে মন্দিরচত্বরে এসে দাঁড়াই। গ্যাসের কয়েকটা আলো জ্বলছে। জন পঞ্চাশ মেয়ে পুরুষ ও শিশু খেতে বসেছে। তাদের চীৎকার ও কর্তৃপক্ষের হাঁকডাকে চারিদিক মুখরিত। বিরাট বিরাট হাঁড়ি কড়াই ও গামলায় করে ভাত ডাল তরকারি ও মিষ্টান্ন রাখা হয়েছে। লাল লাল মোটা চালের ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল, বহুবর্ণের বিচিত্রদর্শন তরকারি আর দুধমাখা ভাতের মতো মিষ্টান্ন। কিন্তু তাই পরম সমাদরে পেট পুরে খাচ্ছে সবাই। কি আনন্দ, কি উৎসাহ, কি উদ্দীপনা! কত সহজ এদের জীবনযাত্রা। কত অল্পে সন্তুষ্ট হয় এরা। অথচ সেটুকুও পায় না।

গ্রামের মানুষরা সবাই মিলে আয়োজন করেছে এই মহোৎসব। মোড়ল নিজে তদারক করছেন। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এলেন। ওয়াংদি পরিচয় করিয়ে দিল। হাতজোড় করে নমস্কার করলেন। আমি কলকাতার মানুষ হয়ে আজ বশিষ্ঠ কুণ্ডের এই মহোৎসবে যোগদান করেছি, এ নাকি নেহাতই ঠাকুরের কৃপা। বারবার বৃদ্ধ ধন্যবাদ জানান তাঁর ঠাকুরকে।

কিছুক্ষণ বাদে মানসী আসে। বৃদ্ধ আমাদের নিয়ে চলেন মন্দিরে। দেবী ভগবতীর সুন্দর মূর্তি রয়েছে একধারে। আমরা কায়মনোবাক্যে হিমালয়ের মানুষদের জন্য প্রার্থনা করি তাঁর কাছে। বলি—মা তুমি এদের দুঃখ দূর কর। এরা যেন সুখী হয়। যেন চিরকাল এমন সহজ সরল ও আনন্দময় থাকে।

মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে বশিষ্ঠদেবের মূর্তি—কাঠের মূর্তি। এমন কি উপবীত ও হাতের পদ্মটি পর্যন্ত খোদিত কিন্তু মাথার পাগড়িটা কাপড়ের। ফুল দিয়ে সাজানো।

মূর্তির পায়ের কাছ থেকে বেরিয়ে আসছে জলধারা। গিয়ে পড়ছে কুণ্ডে। বশিষ্ঠদেবের চরণামৃত জগতের পাপ ও তাপ দূর করছে। আমরা সশ্রদ্ধ চিত্তে মহামুনিকে প্রণাম করি।

॥ পাঁচ ॥

প্রসাদ পেয়ে আমরা বেরিয়ে আসি পথে। ওয়াংদিকেও বসতে হয়েছিল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু সেও আমারই মতো খেতে পারে নি, ফেলে দিয়েছে। অথচ আশ্চর্য। মানসী কিছুই ফেলে নি, সবকিছু খেয়ে নিয়েছে। আনন্দের সঙ্গেই খেয়েছে। আমাদের ফেলতে দেখে ধমক দিয়েছে। তবে তাতে তার লাভ হয় নি কোন।

স্কুলের সামনে এসে বিদায় নেয় ওয়াংদি। তাকে শুভরাত্রি জানিয়ে মানসীর সঙ্গে এগিয়ে চলি মানালীর দিকে। মেটে জ্যোৎস্নায় মৃদু আলোকিত পাথুরে পথ। বিপাশার গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চলেছি আমরা।

হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "আপনি তো বেশ মানুষ, খুব ফাঁকি দিচ্ছেন।"

"কি রকম ?" কিছুই বুঝতে পারি না।

"সেই কখন রোতাং যাবার কথা বলেছেন। তার পরে হিমাচল প্রসঙ্গটা একেবারে শিকেয় তুলে রেখেছেন।"

"সে প্রসঙ্গটা কি এখন শুরু না করলেই নয়। প্রবহমানা বিপাশার পাশে পাশে পথ চলছি আমরা। নীলাকাশে চাঁদ উঠেছে। হিমাচল পড়েছে ঘুমিয়ে। এই পরিবেশে আপনার ঐ সব মামুলী বর্ণনা শুনতে ভাল লাগবে ? তার চেয়ে নীরবে পথ চলা ভালো নয় কি ? এমন পরিবেশ যে বড় একটা পাওয়া যায় না।"

"দেখবেন মশাই, দোহাই আপনার", মানসী হাত জোড় করে, "আবার প্রেম-ট্রেম নিবেদন করে বসবেন না যেন। নির্জনে নারীকে সঙ্গে পেলে আপনাদের তো আবার ও ইচ্ছেটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।"

থমকে দাঁড়াই। মানসীর দিকে তাকাই। কি বলছে সে, কি বলতে চাইছে সে ? এমন সাহসই বা তার হল কেমন করে ? কি ভেবেছে আমাকে ?

মানসী থামে নি। সে এগিয়ে চলেছে।

না। সেও থেমেছে কয়েক পা এগিয়ে। পেছন ফেরে মানসী। বলে, "থামলেন কেন ?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী এগিয়ে আসে কাছে। জিজ্ঞেস করে, "অসন্তুষ্ট হলেন ?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "আমি এমনি বলেছি

কথাটা। কিছু ভেবে বলি নি। আমার অন্যায় হয়েছে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।" শেষের দিকে ওর কণ্ঠস্বর বড়ই করুণ শোনায়।

আমি কোন কথা বলি না। তবে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করি।

মানসী আমার পাশে আসে। চলতে চলতে বলে, "আমি জানি আপনি তেমন নন। নইলে কি আর এমন ভাবে আপনার সঙ্গে মিশতে পারতাম। আপনি আমার প্রিয় লেখক, আমার পরম শ্রদ্ধেয়।" একবার থামে মানসী। তার পরে অসহিষ্ণু স্বরে বলে ওঠে, "চুপ করে আছেন কেন? বলুন কিছু মনে করেন নি আমার কথায়? আমাকে ক্ষমা করেছেন? বলুন, শিগগীর বলুন।"

"ক্ষমা ··"

"হ্যাঁ।"

"এতে ক্ষমা করার কি আছে?" আমি বলি।

"আছে বৈকি। আমি যে অন্যায় করেছি।"

"না, আপনি কোন অন্যায় করেন নি। আমি আপনার যত শ্রদ্ধেয়ই হয়ে থাকি, আমি তো মানুষ। আমাকে সাবধান করে দেবার অধিকার আপনার আছে বৈকি?"

"না, নেই।" মানসী বলে, "আপনি বলুন, আমাকে ক্ষমা করেছেন কিনা?"

"অন্যায় করেন নি, তবু ক্ষমা করব?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ, করলাম।"

"সত্যি বলছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে অমন গম্ভীর স্বরে কথা কইছেন কেন? একবার হাসুন, একবার, একটুখানি…"

ওর কথায় হাসি পায় আমার। আমি হেসে ফেলি। খুশি হয় মানসী।

"কোথায় গিয়েছিলেন…?"

থামতে হল আমাকে। কেবল কথা নয়, চলা। থামতে হয় মানসীকে। বশিষ্ঠকুণ্ড থেকে আমরা ফিরে চলেছি মানালী ট্যুরিস্ট বাংলোয়। চলতে চলতে মানসীকে হিমাচলের কথা বলছিলাম। ইতিমধ্যে যে আমরা পৌঁছে গেছি মানালী বাসস্ট্যাণ্ডে, খেয়াল হয় নি। হবে কেমন করে, বলার নেশায়

পেয়ে বসলে মানুষের কি আর কোন খেয়াল থাকে? কিন্তু মানসী? সে তো নীরবে কেবল শুনছিল। তার খেয়াল হয় নি কেন? তবে কি শোনার নেশাও কম গভীর নয়?

খেয়াল হয় জনৈক পথচারীর প্রশ্নে—কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা?

কাল রাতে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল, তাদেরই কয়েকজন ছাত্র বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরই একজন প্রশ্ন করেছে। তন্ময়তার জন্য লজ্জা পাই। হেসে বলি, "গিয়েছিলাম বশিষ্ঠকুণ্ডে। তোমরা রোতাং দেখে এলে?"

"হ্যাঁ। তবে সবাই পৌঁছতে পারি নি ওপর পর্যন্ত। দেরি হয়ে গেলে বাস পাবে না বলে, তারা ফিরে এসেছে মারী থেকে। তবে আমরা কজন গিয়েছিলাম।" একটি ছেলে উত্তর দেয়।

আর একজন বলে, "আপনারা ট্যুরিস্ট-বাংলোয় জায়গা পেয়েছেন শুনলাম।"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে, "বেশ ভালো জায়গা, পাশাপাশি ঘর।"

"তাহলে তো বেশ স্থবিধাই হয়েছে।"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে।

আমি চুপ করে থাকি।

"আমরা কাল সকালে চণ্ডীগড় রওনা হচ্ছি। ফেরার পথে আপনারা যদি চণ্ডীগড় আসেন, ভারী খুশি হব।" ঠিকানা লিখে একটি ছেলে মানসীর হাতে দেয়।

আর একটি ছেলে হঠাৎ বলে ওঠে, "আরে তাই তো, ভাগ্যিস মনে পড়েছে। আপনার একখানা চিঠি এসেছে ট্যুরিস্ট অফিসে।" সে পকেট থেকে ইনল্যাণ্ড লেটারটা বের করে আমাকে দেয়। তারপর বিদায় নেয় ওরা। একটি রাতের পরিচয়, কিন্তু কোনদিন ওদের ভুলতে পারব কি?

আমরা হোটেলে চলি। রাত পৌনে নটা বাজে। একেবারে খেয়ে নিয়ে বাংলোয় ফিরব।

হোটেলে এসে চিঠিটা খুলি।

"কেমন আছেন?" হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে।

"কে?"

"যে লিপি পাঠিয়েছে?"

"ভালো।" আমি ওর দিকে তাকাই। ওর চোখে দুষ্টু হাসি।

আমি হেসে ফেলি।

মানসী গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করে, "হাসছেন কেন?"

"আপনাকে দেখে।"

"মানে?"

"চিঠিটা কলকাতার নয়, এমন কি কোন মেয়ের পর্যন্ত নয়।"

"কে, কোথা থেকে লিখেছে তাহলে?"

"লিখেছে প্রাণেশ—মানা অভিযানের বাইশ হাজার আটশ' ফুট উঁচু পঞ্চম শিবির থেকে।"

"প্রাণেশ মানে আপনার 'নীল-দুর্গম' বইয়ের প্রাণেশ চক্রবর্তী?"

"হ্যাঁ।" একটু থেমে বলি, "আহত হলেন বোধহয়?"

"আহত হব কেন?"

"কোথায় প্রিয় বান্ধবী আর কোথায় প্রাণেশ চক্রবর্তী। আহত হবার মতো নয় কি?"

"তাহলেও আহত হই নি। কারণ এ চিঠিটার মূল্য সে-সব চিঠির চেয়ে অনেক বেশি। যাক্ গে বলুন, কি লিখেছে?"

"আবহাওয়া খুবই খারাপ। ওরা মানা শীর্ষের এক হাজার ফুটের মধ্যে। তবু পাঁচ দিন বসে আছে পাঁচ নম্বর শিবিরে। বড় জোর আর তিন-চার দিন। তার মধ্যে যদি আবহাওয়ার পরিবর্তন না হয়, তাহলে ওদের নেমে আসতে হবে। ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু দুর্গম মানা শীর্ষ এবারও রয়ে যাবে ভারতীয় পর্বতারোহীদের পদক্ষেপের বাইরে।"

"কত তারিখে চিঠি লিখেছে?"

"ষোলোই সেপ্টেম্বর।"

"আজ চব্বিশে।" মানসী বলে, "তাহলে তো ইতিমধ্যে যা হবার হয়ে গেছে।"

"তা হয়েছে।"

"কিন্তু জ্ঞানচাঁদ তো কিছুই বললেন না!"

"আমিও তাই ভাবছি। আমরা না হয় হিমালয়ে এসেছি। কাগজ পড়ছি না, রেডিও শুনছি না। কিন্তু তিনি তো এখানকার লোক। শিক্ষায়তনে সংবাদপত্র আসে। পর্বতারোহণ সম্পর্কীয় সংবাদ তাঁদের দৃষ্টি এড়ায় না।"

বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে। আমরা উঠে গিয়ে হাত ধুয়ে আসি। খেতে আরম্ভ করি। ইংরেজী সংবাদ শুরু হল। আমরা সংবাদ শুনতে শুনতে খেতে থাকি। বড় গোলমাল হচ্ছে। আরও অনেকে খাচ্ছেন। কর্মব্যস্ত বেয়ারারা ছুটোছুটি করছে। তবে রেডিও বেশ জোরে চলছে। মোটামুটি শোনা যাচ্ছে।

সচকিত হই। আমি একা নই, মানসীও মুখ তোলে। রেডিওতে বলছে—গত ১৯শে বিকেলে একজন অভিযাত্রী ও তিনজন শেরপা মানা শীর্ষে আরোহণ করেছে।

কে সেই অভিযাত্রী? বিশ্বদেব বিশ্বাস, তাপস ভট্টাচার্য, না প্রাণেশ চক্রবর্তী? যেই হোক, এ জয় সকলের।

একজন আরোহণ করলেই, সে কৃতিত্ব সারা দেশের। সমবেত প্রচেষ্টাই কেবল পর্বতারোহণে সাফল্য এনে দেয়। কি আনন্দ! মানা শীর্ষে বাঙ্গালী অভিযাত্রীরা জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছে। ভারতের বে-সরকারী পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত বৃহত্তম সাফল্য এই শীর্ষারোহণ। কিন্তু…… রেডিওতে কি বলছে?

বলছে—পরদিন পাঁচ নম্বর শিবির থেকে নেমে আসার সময় এক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে দুজন অভিযাত্রী ও তিনজন শেরপা। সামরিক কর্তৃপক্ষ আহত অভিযাত্রীদের নিয়ে আসতে বেরিলী থেকে হেলিকপ্টার পাঠাচ্ছেন। উত্তর প্রদেশ সরকার গ্রাউণ্ড রেসকিউ পার্টি পাঠাচ্ছেন।

সংবাদ শেষ হল। আর কোন সংবাদ নেই।

এ তো দুঃসংবাদ। সাফল্যের সকল আনন্দকে ম্লান করে দিল দুর্ঘটনার সংবাদ। পর্বতারোহণে সাফল্যের চেয়ে অধিকতর কাম্য নিরাপদ প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু কেমন করে দুর্ঘটনা ঘটল? যারা শিখরে আরোহণ করেছে তারাই পাঁচ নম্বর শিবিরে ছিল। তারাই পরদিন নেমে আসার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। দুজন অভিযাত্রী ও তিনজন শেরপা। কিন্তু শিখরে তো আরোহণ করেছে একজন অভিযাত্রী।

কিছুই বুঝতে পারছি না। আর খেতে ইচ্ছে করছে না। মানসীও বুঝতে পারে আমার মানসিক অবস্থা। সেও হাত গুটিয়ে বসে আছে। আমরা উঠে পড়ি। হোটেল থেকে বেরিয়ে আসি।

কোথায় যাব? কার কাছে খবর পাব? ট্রাঙ্ককল করব? টেলিগ্রাম করব? কলকাতা, দিল্লী, জোশীমঠ, বেরিলী? কিন্তু তারাই বা কেমন করে জানবে সব খবর? যা খবর পাওয়া গেছে, তা তো রেডিওতেই বলল। এর বেশি আর কোন খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যায় নি।

কিন্তু সব খবর না পেলেও, ওরা সবাই ভাল আছে, এ খবরটুকু যে অন্তত পাওয়া দরকার। না পেলে আমি যে কিছুতেই শান্তি পাব না। কে আমাকে সে খবর দেবে?

মানসী বলে, "আপনি এতো উতলা হচ্ছেন কেন? দুর্ঘটনাটা তো তেমন কিছু মারাত্মক নাও হতে পারে।"

"পাহাড়ে সাধারণতঃ তা হয় না। ওরা প্রায় প্রত্যেকেই আমার পরিচিত, আমার অতি প্রিয়। ওরা ভাল আছে না জানা পর্যন্ত আমি কেমন করে নিশ্চিন্ত হতে পারি বলুন।"

"কাল নিশ্চয়ই সে খবর পাওয়া যাবে। আমি ওদের কাউকে চিনি না কিন্তু জানি। আমিও ওদের ভালোবাসি কারণ ওরা হিমালয়কে ভালোবাসে। আমার মন বলছে ওরা সবাই ভালো আছেন। চলুন এখন বাংলোয় ফেরা যাক।"

আমার মনে পড়ে প্রাণেশের পিতা শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্তীর কথা। তাঁর ইচ্ছে ছিল না, প্রাণেশ এবার অভিযানে যায়। তিনি ওকে না করেই দিয়েছিলেন। আমি গিয়ে অনেক বলে-কয়ে রাজী করিয়েছি তাকে। প্রাণেশের যদি কিছু হয়ে থাকে, তাহলে আমি কলকাতায় ফিরে যাব কেমন করে?

"আপনি অযথা দুশ্চিন্তা করছেন। ওরা সবাই অভিজ্ঞ পর্বতারোহী, ওরা ভাল আছেন।" মানসী আবার বলে।

"আপনার কথা সত্য হলে আমার চেয়ে বেশি সুখী খুব কম লোকেই হবে কিন্তু..."

"কোন কিন্তু নয়, আপনি বাংলোয় চলুন। আমার মন বলছে আমার কথা সত্য হবেই হবে।"

॥ ছয় ॥

শেষ রাতের দিকে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। তবে তিনটে পর্যন্ত যে জেগে ছিলাম বেশ মনে আছে। জেগে জেগে ভেবেছি মানা অভিযাত্রীদের কথা। ওরা কেমন আছে? মানসী বলেছে—ভালো আছে। কিন্তু সে কথায় আমার অশান্ত চিত্ত শান্ত হয় নি। আমি চোখ বুজে দুশ্চিন্তার জাল বুনেছি। প্রহরের পর প্রহর পেরিয়েছে, আমার দুশ্চিন্তার অবসান হয় নি।

শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তাও বেশিক্ষণ ঘুমোতে পারলাম না। দরজায় শব্দ হচ্ছে। নিশ্চয়ই মানসী। স্লিপীং ব্যাগের জীপ খুলি। ঘড়ি দেখি—ছ'টা বাজে। এতো সকালে না ডাকলেই পারত। কিন্তু

সেই বা কেমন করে জানবে, আমি সারারাত ঘুমোতে পারি নি। কাল এখানে এসেই কথা হয়েছিল আজ আমরা সকাল সকাল উঠে বেড়াতে বের হব! ফিরে এসে নাগর দেখতে যাব।

চোখ ডলতে ডলতে দরজার দিকে এগোই। চোখ জ্বালা করছে।

দরজা খুলতেই মানসী হাসে। বলে, "সুপ্রভাত।" মানসী ঘরে এসে একখানা চেয়ারে বসে। তার পরে বলে, "রাতে ঘুমান নি তো?"

"কেমন করে জানলেন?"

"সত্যি কিনা বলুন।"

"হ্যাঁ।"

"যাক গে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নিন। চলুন চা খেয়ে আসি। এসে আবার তৈরি হয়ে নিতে হবে। সাড়ে নটায় বাস।"

"আমরা কি আজ নাগর যাচ্ছি?"

"তাই তো কথা ছিল। আপনি কি মত পালটেছেন নাকি?"

"না।" বিব্রত বোধ করি, "এই মানে ভাবছিলাম মানালীতে থাকলে হয়তো খবরটা পাওয়া যেত।"

"আমরা তো মানালীতেই থাকছি। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসছি। খবর সন্ধ্যের আগে আসবে না। আর টেলিগ্রাম পাঠাবার হলে তো নাগর রওনা হবার আগেই পাঠিয়ে দিতে পারবেন।" একবার থামে মানসী। তারপরে কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য এনে বলতে থাকে, "ওরা আমার অচেনা কিন্তু অজানা নয়। আমি ওদের সবার, নাম শুনেছি। ওরা হিমালয় অভিযানে এসেছেন তাই ওরা আমার পর নন। হয়তো আপনার মতো আমার অতো দুশ্চিন্তা হচ্ছে না। কিন্তু কাল রাতে আমিও ভালো ঘুমোতে পারি নি। কেবলই ওদের কথা ভেবেছি আর ঠাকুরকে ডেকেছি—তুমি ওদের রক্ষা করো। ঠাকুর আমার কথা শুনেছেন। আমি স্বপ্ন দেখেছি ওরা সবাই ভালো আছেন। অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার মাঝে হাওড়ায় ট্রেন থেকে নামছেন। আমার এ স্বপ্ন মিথ্যে হবার নয়।"

আমি আর কথা না বাড়িয়ে বাথরুমে ঢুকি।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি মানসী কোন ট্যুরিস্টের ফেলে যাওয়া পুরনো সানডে স্ট্যাণ্ডার্ড কাগজখানি খুব মনযোগ দিয়ে পড়ছে। আমি সামনে আসতেই সে কাগজখানা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে। বলে, "এই জায়গাটা পড়ে দেখুন।"

"বুঝতে পারছি, মানসী আমাকে অন্যমনস্ক করে তুলতে চাইছে। তাহলেও কাগজখানি হাতে নিই। তাকিয়ে দেখি—৫ই সেপ্টেম্বর অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিনের কাগজ। জনৈক শ্রীপি. রাজেশ্বর রাও রাষ্ট্রপতির জীবনালোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কিছু বাণী উদ্ধৃত করেছেন। কথাগুলো আমারও ভাল লাগে। শ্রীরাও লিখেছেন—

'He (Radhakrishnan) quoted from Zulu dictionary, he said that man was an animal tamed and trained by an woman. An educated daughter is the pride of the family ·· According to "Mrichhakatika" a woman is naturally learned while a man's learning is based on books · ·He argues that if love without marriage is illegal, marriage without love is immoral ·····Love is not sex. Love has its peaks which only one in a million is able to climb through mature and responsible love.'

কাগজটা ফিরিয়ে দিই মানসীর হাতে। একটু হেসে বলি, "যে ভদ্রলোক পত্রিকাটি এখানে ফেলে গিয়েছেন, তিনি যে দূরদর্শী সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"কারণ ?"

"তিনি জানতে পেরেছিলেন, আমি আসব এ ঘরে, আপনি আসবেন পাশের ঘরে। আর আপনি আমাকে এই প্রবন্ধটি দেখাবেন।"

"যতই ঠাট্টা করুন, এ-কথা কিন্তু মানতেই হবে যে রাষ্ট্রপতির বক্তব্যটি নির্ভুল।"

"মেনে নিলাম। তারপরে কি করতে হবে ?"

"অভ্রান্ত সত্যটিকে সর্বদা মনে রাখতে হবে।"

"বেশ রাখব।"

"থ্যাঙ্ক্‌ ইউ। এবারে চলুন, কাপড়-চোপড়, জলের বোতল ও ক্যামেরা নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া যাক্‌। নইলে বাস-এ জায়গা পাওয়া যাবে না।"

"হ্যাঁ। তাছাড়া প্রাণেশকে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।"

বাস ছাড়ল সকাল সাড়ে নটায়। আমি ও মানসী কুলু রাজ্যের প্রাক্তন

রাজধানী নাগর দেখতে চলেছি। একই সিট-যে পাশাপাশি বসেছি দুজনে।

পরশু পরিচয় হয়েছে আমাদের। সেই থেকে দুজনে একসঙ্গে রয়েছি। কিন্তু এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে পাশাপাশি আর বসি নি কখনও।

খারাপ লাগছে, বলতে পারছি না। তবে সংকোচ বোধ করছি সন্দেহ নেই। অথচ মানসীর মাঝে কোন শঙ্কা কিংবা সংকোচ দেখতে পাচ্ছি না। সে বেশ সহজ ভাবেই কথাবার্তা বলছে।

মানালী থেকে নাগর যাবার দুটি পথ। একটি বিপাশার ওপার দিয়ে, একটি এপার দিয়ে। আমরা ওপারের পথে যাবো আর এপারের পথে ফিরে আসব।

ফেরার কথা নয়, এখন আমরা যাবার কথাই আলোচনা করছি। কথার পরে কথার মালা গেঁথে চলেছি দুজনে।

সহসা বাস থেমে যায়, আমাদের কথাও বন্ধ হয়। তাকিয়ে দেখি একটি জনপদে বাস থেমেছে। পথের পাশে সাইনবোর্ড—জগৎসুখ।

মনে পড়ে সব। আমি ও মানসী মানালী থেকে নাগর চলেছি। মানালী থেকে রওনা হবার পরে বশিষ্ঠকুণ্ডের পথে বাস চলেছে কিছুক্ষণ। পেরিয়ে এসেছি বিপাশা।

বিপাশা পেরিয়ে বাস রওনা হয়েছে বশিষ্ঠকুণ্ডের বিপরীত দিকে। বিপাশার পাশে পাশে পথ। পথে পড়েছে হামতা নদী ও বিপাশার সঙ্গম। সেখানেই পিরিনি গ্রাম।

পিরিনি থেকে হাঁটাপথে পোঁছনো যায় চোদ্দ হাজার ফুট উঁচু হামতা গিরিবর্ত্মে। হামতা থেকে স্পিতি উপত্যকার রমণীয় দৃশ্য দেখা যায়। পিরিনি থেকে আরও আধঘণ্টা চলে আমরা পৌঁচেছি এই জগৎসুখ গ্রামে।

একালে গ্রাম কিন্তু সেকালে ছিল সমৃদ্ধ রাজধানী। সেকালের জৌলুষ গিয়েছে কিন্তু রয়েছে ভগবতীর মন্দির। সে মন্দিরের খ্যাতি আজও অক্ষুণ্ণ। স্থানীয়রা বলেন—সুন্দাদেবীর মন্দির। মা-ভগবতীকে ওঁরা বলেন সুন্দাদেবী।

মানসী বলে, "চলুন, মন্দির দর্শন করে আসা যাক্। বাড়তি পুণ্যলাভের সুযোগ হারানো উচিত হবে না। ড্রাইভার বলেছে, পনেরো মিনিট বাস থামবে এখানে।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। মানসীর সঙ্গে নেমে আসি বাস থেকে। রাস্তার

বাঁদিকে একটু ওপরে উঠে অনেকখানি সমতল জায়গা। তারই মধ্যস্থলে মূল-মন্দির। আমরা মন্দিরে এলাম।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের। দেবী দর্শন হল না। মন্দির বন্ধ। প্রভাতী পূজা শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ। মধ্যাহ্ন পূজার সময় আবার মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হবে। শুনেছি ত্রিভুজাকৃতি পাথরে খোদাই ছোট একটি দেবীমূর্তি রয়েছে ভেতরে। তাঁরই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম রেখে আমরা নেমে আসি মন্দির থেকে।

দেবী দর্শন না হলেও দেব দর্শন হল। ভগবতী মন্দিরের পেছনে শিবমন্দির। সে মন্দিরের দ্বার সর্বদাই উন্মুক্ত। ভোলানাথের মতো সহজ-সরল দেবতা যে আর নেই এ ত্রিভুবনে।

আমরা সেই অবারিত দ্বার দিয়ে উঠে এলাম ভেতরে। মূল-বিগ্রহ লিঙ্গমূর্তি। পাশে পাথরের নয়নাভিরাম মহাদেব মূর্তি।

মানসী খুশি হল। সে শিবের মাথায় জল ঢালল। ভক্তিভরে প্রণাম করল তার পরমারাধ্যকে। হয়তো বা শিবের মতো স্বামী প্রার্থনা করল।

পাশাপাশি দুটি মন্দির কিন্তু পৃথক গড়ন। একটি স্থানীয় ছাঁচে—কুলু স্থাপত্যে তৈরি, আরেকটি প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত। অথচ দুটি মন্দিরই নির্মাণ করিয়েছেন তৎকালীন কুলুর রাজা জগৎ সিং। আর তাই হয়তো এই জনপদের নাম জগৎসুখ। সেই নামেই এই প্রাচীন নগরী আজ সর্বত্র পরিচিত। তখনও কিন্তু এখানে রাজধানী ছিল না। অনেক আগেই রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল নাগরে।

জগৎসুখের প্রাচীন নাম ছিল নাসৃত। সিধ সিং বাদাপ্‌ফী নামে সমতলের জনৈক সেনানায়ক ১৫০০ খৃষ্টাব্দে এই জনপদ অধিকার করে নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করেন। তখন বিপাশার বাঁ তীরে এবং লাহুল ও স্পিতি উপত্যকা ছিল তিব্বতী সর্দারদের করতলগত। এদের মধ্যে পিট্টি ঠাকুর ছিলেন সবচেয়ে শক্তিশালী। আর বিপাশার ডান তীরে বর্তমান মানালী সহ অধিকাংশ কুলু উপত্যকা ছিল রাজপুত রাজা সিন্না রাণার অধীনে।

পিট্টি ঠাকুরের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে নানা জনশ্রুতি আছে। মনুষ্যদুগ্ধ ছাড়া তাঁর তৃষ্ণা মিটত না। তিনি নাকি নরবলি দিতেন। তাহলেও সিন্না রাণার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল ছিল। রাণা তাঁরই হাতে লাহুল উপত্যকার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন।

সিধ সিং তিব্বতীয় সর্দারদের একে একে বিপাশার বাঁ তীর থেকে

তাড়াতে থাকলেন। তার রাজ্যসীমা বিস্তৃত হতে থাকল। অবশেষে তাঁর প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন সিন্না রাণা। কিন্তু মন্দার কোট দুর্গ অধিকার করার মতো শক্তি ছিল না সিধ সিং-য়ের। তাই তিনি একজন গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করলেন। একদিন সিন্না রাণা যখন বশিষ্ঠকুণ্ডের কাছে ক্ষেত পরিদর্শন করছিলেন, তখন সেই গুপ্তঘাতক দূর থেকে গুলি করে তাঁকে হত্যা করে। রাণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে পুরনারীরা মন্দার কোট দুর্গে জহরব্রত পালন করলেন। সিধ সিং-য়ের রাজ্যসীমা বিপাশার বামতীর থেকে দক্ষিণতীরে প্রসারিত হল। তিনি অনায়াসে নিজেকে কুলু উপত্যকার রাজা বলে ঘোষণা করলেন।

সেই থেকে উনবিংশ শতকের মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অর্থাৎ সাড়ে তিনশ' বছরের অধিককাল, তাঁর বংশধরগণ কুলু উপত্যকায় রাজত্ব করেছেন। কাজেই এই জগৎসুখই বাদানী রাজত্বের সূতিকাগার। পরে অবশ্য এখান থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় নাগরে, সেখান থেকে সুলতানপুর অর্থাৎ কুলুতে।

কিন্তু নাগর বা কুলুর কথা এখন থাক। এখন জগৎসুখের কথাই ভাবা যাক্। যতটুকু সময় হাতে আছে তারই মধ্যে দেখে নিই চারিদিক।

মন্দিরের পেছনে স্কুল। সামনে একফালি মাঠ। মাঠে কয়েকটি বড় বড় গাছ। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা খেলা করছিল গাছের ছায়ায়। আমাদের দেখে তাদের খেলা বন্ধ হয়ে গেল। চারিদিক থেকে তারা এসে ঘিরে ধরল আমাদের। না, আমাকে নয় মানসীকে! তাদের আনন্দ আর ধরে না। আমরা এসেছি তাদের গাঁয়ে। গাঁয়ের গল্প করে ওরা। বলে---এখান থেকে মাত্র মাইলখানেক ওপরে অর্জুন গুম্ফা। মাস্টারজীকে বললে, ওরা আমাদের নিয়ে যেতে পারে সেখানে। ওরা মানসীর হাত ধরে। তাকে নিয়ে যেতে চায় মাস্টারজীর কাছে।

বাসের হর্ণ আসে ভেসে। ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় সমাগত। কিন্তু মানসী ওদের বলতে পারে না সে-কথা। সে চুপ করে আছে।

আমি বলি, "আমরা তো অর্জুন গুম্ফায় যেতে পারব না।"

"না না, যেতেই হবে। আমরা নিয়ে যাব আপনাদের।" ওরা সমবেত স্বরে দাবী জানায়।

মানসী বলে, "আমরা নাগরের বাসযাত্রী। বাস ছাড়বে এখুনি। আবার যদি কখনও এখানে আসি, নিশ্চয়ই তোমাদের নিয়ে অর্জুন গুম্ফায় যাব।

"আসবেন তো আবার?" ওরা জিজ্ঞেস করে।

মানসী মাথা নাড়ে। মিথ্যা অনেক সময় অপরিহার্য হয়ে ওঠে মানুষের জীবনে।

ওরা আমাদের সঙ্গে আসে। আমরা বাসে উঠি। ওরা দাঁড়িয়ে আছে করুণ নয়নে। যেন কতো কালের প্রিয়জনকে চিরকালের তরে বিদায় দিচ্ছে। মানসী মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাস চলতে শুরু করে। নাগরের বাস। আমরা মানালী থেকে নাগর চলেছি। মানসী চোখ মোছে।

বাস চলেছে এগিয়ে। পেরিয়ে এলাম খাটনল নালা: ছোট. একটি জলধারা। বনের ভেতর দিয়ে পথ। বাঁ দিকের পাহাড় বনময়, ডান দিকে পথের নিচেও বন। বনের শেষে ক্ষেত। ক্ষেতের শেষে নদী। নদী।নয়, কুলু উপত্যকার প্রাণধারা বিপাশা। বিপাশার রুপোলী রেখা বিলীন হয়েছে দিগন্তের কাছে, সেখানে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা আকাশে মিশেছে। কালো নয়, সাদা পাহাড়। তুষারমৌলি হিমালয়—হিমতীর্থ-হিমাচল।

হিমতীর্থ-হিমাচলের কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তার পাহাড় পথ আর পথচারীদের কথা। একটা গাছের ছায়ায় এসে বাস থেমেছে। গাছের গোড়ায় পাথরের মূর্তি—গাঁয়ের দেবতা। গাঁযের নাম সরসী। পথের ধারে বাড়ি-ঘর ও ক্ষেত। রামদানা ভুট্টা ও ধানক্ষেত।

ভাবনা ভঙ্গ হয়। চোখ ফিরিয়ে নিই। তাকাই আমার পাশে, মানসীর দিকে। মানসী জিজ্ঞেস করছে, "কি ভাবছেন এতো?"

"তেমন মূল্যবান কিছু নয়।" আমি উত্তর দিই।

("তাহলে চুপ করে না থেকে, আমার সঙ্গে কথা বলুন।"

"কি কথা?"

"যা ইচ্ছে।"

"কত কথা তো বললাম পরশু থেকে।"

"কিন্তু কথা তো ফুরিয়ে যায় নি। কথার যে শেষ নেই।" মানসী আমার দিকে তাকায়। ওর চোখে চোখ পড়ে। মানসী তাকিয়ে থাকে।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। বলি, "অন্তহীন কথার ফুল ফুটিয়ে কি হবে?"

"ফুলে যে মধু থাকে।"

"সব মধু তো মধুকরীর কাজে লাগে না।"

"তাতে ফুলের কি এসে যায়? সে নিজের তাগিদেই বিকশিত হয়। মধুময়ী হয়েই তার আনন্দ, মধু বিতরণ করে নয়।")

"বেশ তাই হোক।" আমি সন্ধি করি, "আমি কথার ফুল ফুটিয়ে যাচ্ছি, আপনি যদি নাও শোনেন, দুঃখ করব না।"

"আপনার আশঙ্কা অমূলক। আমার মত নিষ্ঠাবতী শ্রোতা আপনি এর আগে পান নি।"

"আশ্বস্ত হলাম।" আমি বলতে থাকি। আমার কথা নয়, হিমতীর্থ-হিমাচলের কথা—

"কুলু উপত্যকার ইতিহাস চাম্বার মতো নয়। চাম্বায় একই রাজবংশ প্রায় দেড় হাজার বছর রাজত্ব করেছে। চাম্বা তেমন বাইরের আক্রমণের সম্মুখীন হয় নি। বাইরের কোন শক্তি কখনই চাম্বাকে অধিকার করে রাখতে পারে নি। কিন্তু কুলু ও লাহুল উপত্যকা বার বার বাইরের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। এখানকার জনসাধারণ বহু বিদেশী শাসকের কাছে মাথা নত করেছে। এর কারণ কুলুর অবস্থান, আর কুলুর সম্পদ। সমতলের আর্যরা কুলুর পথে পেতে চেয়েছে পশম লবণ ও সোহাগা—মধ্য এশিয়ার অমূল্য সম্পদ। ক্ষুধার্ত তিব্বতী ও মঙ্গোলীয়রা চেয়েছে কুলুর শস্য, লাহুলের বার্লি। তাই তারা বার বার হানা দিয়েছে এ উপত্যকায়।

"ছোট ছোট দলের লুঠতরাজ সংখ্যাতীত। সেগুলির হিসেব নেই। তবে তিনটি বড় আক্রমণ হয়েছে কুলু উপত্যকায়। প্রথমটি ১১২৫ থেকে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এই সময় কুলু সম্ভবতঃ লাদাক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুলুর শাসক লাদাকের রাজাকে কর দিতেন। দ্বিতীয়বার এই উপত্যকা আক্রান্ত হয় ১৪৪০ থেকে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। সেবারে কাশ্মীরের এক বৌদ্ধ সেনাবাহিনী কুলু নগরী অধিকার করে নেয়। তৃতীয়বার কুলু আক্রান্ত হয় ১৫৩০ থেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝে কোন সময়ে।"

"শুনেছি একবার নাকি গদ্দিরা মন্দার কোট দুর্গ আক্রমণ করেছিল?" আমি থামতেই মানসী প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ, সেটি কোন বড় আক্রমণ নয়, তাহলেও উল্লেখযোগ্য কারণ চাম্বা জেলার শান্তশিষ্ট উপজাতিসমূহের অন্যতম হচ্ছে গদ্দি। এরা মেষপালন করে জীবিকা অর্জন করে। বছরের ন'মাস হিমালয়ের পথে পথে কাটায়। কখনও কারও সঙ্গে কলহ করে না। এরা অতিশয় অতিথিবৎসল। অথচ তারাই কোন কারণে সিন্না রাণার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে মন্দারকোট দুর্গ আক্রমণ করেছিল। সিন্না রাণা বহুকষ্টে সেবারে দুর্গ রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।"

একটি পাহাড়ী নদীর ধারে এসে আমাদের বাস থামে। দুজন যাত্রী নেমে যান বাস থেকে। নদীতীরের হাঁটা পথটি বেয়ে তাঁরা চলতে শুরু করেন। বাস এগিয়ে চলে নাগরের পথে। মানসী কণ্ডাক্টারকে জিজ্ঞেস করে, "ওরা কোথায় গেলেন?"

"মালানা।" কণ্ডাক্টার উত্তর দেয়।

"মালানা তো শুনেছি মণিকরণ পথের জারীগ্রাম থেকে যায়।" মানসী বলে।

"সেখান থেকে যায়, এখান থেকেও যাওয়া যায়। আরও পথ আছে।"

আমি বলি, "যাবেন নাকি সেই বিচিত্র গ্রামে? যে গ্রামবাসীরা কুলু উপত্যকার এতো কাছে বাস করেও এক পৃথক ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির ধারক।"

"যেতে তো চাই, কিন্তু নিয়ে যায় কে?"

"একা পথে বেরিয়ে তো পথের সাথীর প্রত্যাশী হওয়া ঠিক নয়।"

"পথ যেখানে দুস্তর, সেখানে যে সাথীহারা হয়ে পথ চলতে এখনও শিখি নি। যদি কোনদিন সে শিক্ষা অর্জন করতে পারি, সেদিন আর সাথীর প্রত্যাশা করব না।"

আমি আর কোন কথা বলি না। কি বলব? চুপ করে থাকি। চেয়ে চেয়ে হিমাচলকে দেখি।

॥ সাত ॥

লোকালয় শুরু হয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। পথের ধারে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট ও মন্দির। শহরের এ অংশটা মোটামুটি সমতল। এর পরেই পাহাড় —পাহাড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর বাড়ি, শৈলাবাসে যেমন হয়।

শৈলাবাস? হ্যাঁ, শৈলাবাস বৈকি। স্বাস্থ্যকর ও রমণীয় শৈলাবাস। নইলে সেকালের রাজারাই বা এখানে রাজধানী নির্মাণ করবেন কেন আর একালের শিল্পীরাই বা এখানে আসবেন কেন? বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী নিকোলাস রোয়েরিক ও তাঁর সুযোগ্য পুত্র সোয়েৎলভ নাগরকেই তাঁদের সাধনপীঠ রূপে নির্বাচিত করেছেন।

নিকোলাস রোয়েরিক ছিলেন স্বপনচারী শিল্পী। নিঃসন্দেহে তিনি বিগত যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর। হাজার হাজার ছবি তিনি এঁকেছেন

—প্রত্যেকখানি অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু তিনি তো কেবল চিত্রকর ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি চিন্তাবিদ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তিনি ছিলেন বিশ্ব-নাগরিক, সেকালের এক বিস্ময়কর প্রতিভা।

ম্যাক্সিম গোর্কি বলেছেন, **'One of the greatest intuitive minds of the age'**

অথচ আশ্চর্য! এই মহান মানুষটিকে ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের সময় পালিয়ে আসতে হয়েছিল এ দেশে। তাঁর অপরাধ তিনি সম্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অসংখ্য চিত্রের ন্যায়, বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন। আধুনিক শহর সভ্যতার বাইরে নাগরের নিভৃতকুঞ্জে বাস করেও তিনি কখনও আধুনিক জগতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন নি। প্রত্যেক প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন।

বিস্ময়কর প্রতিভার মতো অসাধারণ কর্মক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। ছোট বড় প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর সমান নজর ছিল। হিমালয়ের কোন বিখ্যাত বিশাল চিত্র কিংবা অখ্যাত কোন বিদ্যালয় পত্রিকার জন্য ছোট একটি বাণী রচনার সময় তিনি সমান মনোযোগী হতেন।

নিকোলাস রোয়েরিক আধুনিক কালের মানুষ হয়েও ছিলেন সেকালের ঋষি। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের পরম ভক্ত ছিলেন তিনি। সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে তিনি ভালোবেসেছিলেন ভারতভূমিকে আর ভারতের মানুষকে। বলেছিলেন, **'Oh, Bharata the Beautiful! Let me send Thee my heartfelt admiration for all the greatness and inspiration which fill Thy ancient wisdom, for glorious Cities and Temples, Thy Meadows, Thy Deobans, Thy sacred Rivers and Majestic Himalayas!'**

সমতল পথটুকু ফুরিয়ে গেল। আমাদের বাস পাহাড়ে উঠছে। খানিকটা ওপরে উঠে আবার সমতল। সেখানেই বাস থামল। আমরা নাগর রাজপ্রাসাদের সামনে পৌঁছে গিয়েছি। প্রাসাদের সামনে পরিচিতি—

'NAGGAR CASTLE & REST HOUSE'

সেকালের সেনানিবাস একালের পান্থশালা। কেবল সেনানিবাস নয়, রাজভবনও বটে। সামনের অংশে ছিল সেনানিবাস, পেছনে প্রাসাদ। বাইজন রাজা বাস করেছেন এখানে। তবে ঠিক এ প্রাসাদে নয়।

প্রাচীন সেই প্রাসাদ ভেঙে নতুন প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন রাজা জগৎ সিং। অথচ তিনিই পরে এখান থেকে কুলুতে রাজধানী নিয়ে যান।

১৮৪০ সালে বৃটিশ শাসক ক্যাপ্টেন 'হে' শিখদের কাছ থেকে এই প্রাসাদ গ্রহণ করে এর প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। তারপরে কিছুকাল এটি এ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের নিবাস ছিল। এখন সেই রাজভবন হয়েছে পর্যটকদের বিশ্রামভবন। পথের মানুষকে প্রাসাদে বাস করার সুযোগদানের জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ।

মানসী তাগিদ দেয়, "বসে আছেন কেন? এখানেই যে নামতে হবে আমাদের।"

"ও! হ্যাঁ।" আমি উঠে দাঁড়াই।

"আপনি বড় অন্যমনস্ক।"

"অন্যগত নই তো।"

মানসী মৃদু হাসে, "বলতে পারি না, আরও দেখতে হবে।"

আমরা বাস থেকে নেমে আসি। এগিয়ে চলি প্রাসাদের দিকে। একজন মধ্যবয়সী লোক এসে সেলাম করে। বলে, "আমি এখানকার চৌকিদার, আপনাদের সেবক।"

"কি ভাবে সেবা করবে?" জিজ্ঞেস করি।

সে জবাব দেয়, "যে ভাবে আপনাদের অভিরুচি। এখানে বিশ্রাম করবেন, খানা খাবেন।"

"তোমার এখানে জল পাওয়া যাবে তো? আমরা স্নান করব।" মানসী বলে।

"জী, মেমসাব।" চৌকিদার জবাব দেয়।

"বাথরুম আছে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"জী, সাব।"

ঘড়ির দিকে তাকাই। মানালী থেকে নাগর আসতে দু ঘণ্টা লেগেছে। মানসীকে বলি, "আপনি কি এখুনি স্নান করতে চান নাকি?"

"এখন না করলে আর কখন করব? বেলা যে বারোটা বাজে।"

"কিন্তু এখন আপনি বাথরুমে ঢুকলে যে বেড়াবার বারোটা বাজবে। আমরা তো পুণ্যস্নান করতে নাগর আসি নি, বেড়াতে এসেছি।"

"তাহলে কি স্নান করা হবে না?" মানসী করুণ কণ্ঠে বলে।

"কেন হবে না, নিশ্চয়ই হবে। তবে এখন নয়, ফিরে এসে। এখন

আমরা চা খেয়ে ঠাবা মন্দির ও রোয়েরিক আর্ট গ্যালারী দেখতে যাব। ফিরে এসে স্নান-খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম করে মানালী রওনা হব।"

"বেশ তবে তাই হবে।" মানসী সম্মতি জানায়।

প্রাসাদ-তোরণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে বহুদিন খোলা হয় না। হয়তো বা আর কোনদিন খোলা হবে না। চিরুরুদ্ধ হয়ে গেছে নাগরের প্রাসাদ-তোরণ। বিশ্রাম-ভবনে প্রবেশের জন্য সুবিরাট তোরণের কোন প্রয়োজন নেই, তার জন্য ভাঙা দেয়ালের এই ক্ষুদ্র অংশটুকুই যথেষ্ট।

আমরা প্রাসাদে প্রবেশ করি। চারিদিকে অযত্নের আভাস। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ যে কালের নিয়ম, যুগের ধর্ম। এই অভাবকে মেনে নিতে হবে।

বুঝতে পারছি প্রাসাদের এই অংশেই সেকালের সেনানিবাস ছিল। মাঝখানে পাথর বাঁধানো অঙ্গন, চারিদিকে সারি সারি ঘর—সামনে বারান্দা।

কল্পনা করি সেকালের কথা—এই পরিত্যক্ত নিবাস সর্বদা গমগম করত। কত রথী-মহারথীর পদধূলিতে প্রতিদিন ধন্য হত। তাঁরা আজ কোথায়?

সবাই বিস্মৃতিতে বিলীন হয়েছে। কিন্তু আজো আছে এই প্রাসাদ। হোক গে সে অভাবগ্রস্ত। তবু সে থাকবে আরও বহুকাল। আর এই পরিত্যক্ত প্রাসাদের পাথরে পাথরে সেদিনকার রথী-মহারথী ও রাজা-মহারাজাদের পরশ পাওয়া যাবে।

মানুষ মরে যায়, কিন্তু তার সৃষ্টি থাকে বেঁচে। সৃষ্টির মাঝেই বেঁচে থাকবে মানুষ। ধ্বংস নয়, সৃষ্টি। যুদ্ধ নয়, শান্তি।

কালো পাথরের নির্মিত নিবাস। সিমেণ্ট জাতীয় কোন মশলা ব্যবহৃত হয় নি। কাঠের কড়িবরগা ও দরজা-জানালা। সংখ্যা অবশ্য খুবই কম। জানালাগুলি খুবই ছোট এবং অনেকটা উঁচুতে স্থাপিত। মনে হচ্ছে দুর্গকে দুর্ভেদ্য করার জন্যই এ ব্যবস্থা।

এটি প্রাসাদের পেছন দিক। আগে উত্তর দিক দিয়ে প্রধান প্রবেশ পথ ছিল। ছোট একটি পর্বতশীর্ষকে সুসমতল করে নির্মিত হয়েছে এই প্রাসাদ। প্রাসাদের পুবদিকে বিপাশা। বিপাশার তীর থেকে এখানকার উচ্চতা প্রায় এক হাজার ফুট।

আমরা এগিয়ে চলি। প্রাসাদের পরবর্তী অংশে আসি। আবার তেমনি বাঁধানো অঙ্গন। ডানদিকে ছোট একটি দোতলা বাড়ি। এটি সেকালের সরাইখানা ছিল। তার পরেই সুবিরাট ও সুন্দর প্রাসাদ। আমরা প্রাঙ্গণে

পেরিয়ে কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সোজা তিনতলায় উঠে এলাম। কাঠের মেঝে। মাঝে ডাইনিং হল, চারিপাশে বড় বড় ঘর। প্রতি ঘর মূল্যবান আসবাবে পরিপূর্ণ। বাড়ির তিনদিকে ঝুলানো বারান্দা—দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। দেখা যায় নাগর নগরী—বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার পথ-পাহাড় আর বিয়াস। বিয়াসের ধবলরেখা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানেই শুরু হয়েছে হিমতীর্থ-হিমাচল—রোতাং গিরিবর্ত্ম আর লাহুলের গিরিশ্রেণী। সবুজ সোনালী সাদা আর ধূসরের মেলা। চঞ্চল ও অচঞ্চলের অন্তহীন খেলা।

ভাবতে খারাপ লাগছে, এমন রমণীয় আবাসে বাস করব না আমরা। আজই চলে যাব এখান থেকে। তবু মানসী ঘুরে ঘুরে ঘরগুলি দেখে, পরীক্ষা করে, ভাল-মন্দ বিচার করে। একখানি ঘর দেখিয়ে বলে, "আমি এখানে বিশ্রাম করব। আপনি ?"

"ডাইনিং হলে !"

"এমন সুন্দর সুন্দর ঘর থাকতে ডাইনিং হল !"

"হ্যাঁ, আমার কাছে এ প্রাসাদ যে পান্থশালা ছাড়া কিছুই নয়।"

"আপনি মশাই বড্ড বে-রসিক। কেমন করে বইগুলো লিখলেন বুঝতে পারি না।"

"কেন, আর কেউ আমার হয়ে লিখে দিয়েছে।"

"তাই হবে।" মানসী হাসতে হাসতে বলে।

চৌকিদার চা ও পকোড়া নিয়ে আসে। কথায় কথায় বলে, "আজ এখানে থেকে যান না।"

"কেমন করে থাকি। বিছানাপত্র আনি নি যে ?" মানসী উত্তর দেয়।

"গদি চাদর আর বালিশ তো প্রতি খাটেই রয়েছে। কম্বল আমি যোগাড় করে দেব। অসুবিধে হবে না আপনাদের।"

"প্রস্তাবটা মন্দ নয় কিন্তু।" মানসী বাংলায় বলে।

"ভাল।" আমি বলি।

"তাহলে আসুন, আজ থেকে যাই এখানে। এমন চমৎকার বাড়ি। আর কেউ নেই, শুধু আমরা দুজন। শান্ত সুন্দর নির্জন নিবাস, চাঁদনী রাত। খুব এনজয় করা যাবে।"

"কিন্তু চৌকিদার আমাদের থাকতে দেবে কেমন করে? কুলুর

সাবডিভিশনাল অফিসারের অনুমতি না হলে তো এখানে রাত্রিবাস করা যায় না।"

"সেটা চৌকিদারের ভাবনা। ওর ভাবনা ওকেই ভাবতে দিন না। সে যখন থাকতে বলছে, তখন সে-সব কথা ভেবেই বলেছে। আপনি থাকবেন কিনা বলুন?"

"না।"

"কেন? বে-আইনী হবে বলে?" মানসী তিক্তস্বরে বলে।

"না। প্রাণেশদের খবর পাব না বলে।"

লজ্জা পায় মানসী। "কথাটা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম।" একটু থেমে সে চৌকিদারকে হিন্দীতে বলে, "না ভাই, আমাদের আজই মানালী চলে যেতে হবে। জরুরী দরকার আছে।"

ক্যামেরা কাঁধে বেরিয়ে আসি রাজপ্রাসাদ থেকে। না, আর রাজপ্রাসাদ নয়, বিশ্রাম-ভবন—সিভিল রেস্ট হাউস। চার টাকা দিলেই একখানি ঘর পাওয়া যায় এক দিনের জন্য।

আরও দুটি বিশ্রাম-ভবন আছে নাগরে। ফরেস্ট ও নির্মাণ-বিভাগের বিশ্রাম-ভবন।

বাসরাস্তা থেকে একটি প্রশস্ত পায়ে-চলা পথ আস্তে আস্তে উঠে গেছে ওপরে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা। পথের পাশে আপেল ও পিচফলের গাছ। ফলে ফলে বোঝাই হয়ে আছে। মানসী বায়না ধরে, "দিন না কয়েকটা পেড়ে।"

"ফেরার পথে বাজার থেকে কিনে দেব।"

"আপনি বড্ড⋯"

"বে-রসিক।" সে শেষ করতে পারার আগেই আমি বলে ফেলি।

"সত্যি তাই।" জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যায় মানসী।

কাছেই একটি মন্দির রয়েছে কিন্তু সেটি না দেখে মানসী এগিয়ে চলে।

স্নিগ্ধ সুন্দর নির্জন পথ। মাঝে মাঝে ঝরণা। পাশের উঁচু জমি থেকে নেমে এসেছে। কল-কল ছল-ছল করে বয়ে চলেছে আপন পথে। কোথাও বা দু-এক ফালি ক্ষেত, কোথাও বা ঘন জঙ্গল। পথ সংকীর্ণতর হয়। আমরা পথ পরিবর্তন করি। ডানদিকে সরু একটি পথ উঠে গেছে। সেই চড়াই পথে এগিয়ে চলি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উঠে আসি বনাবৃত পাহাড়ের প্রশস্ত ও সমতল শিখরে। শিখর নয় সবুজ প্রান্তর। এখানে বন নেই। এটি নাগরের উচ্চতম স্থান। শহর আর উপত্যকাকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

সমতল শিখরের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই মন্দির। দেয়াল-ঘেরা মন্দির। তোরণের সামনে পড়ে আছে কাঠের সুবিশাল একখানি রথ। রথের তিন দিকে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি খোদিত।

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকেই পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ। ডানদিকে ভাণ্ডার, বাঁদিকে ধর্মশালা। সামনে তুলসীমঞ্চ ও কাঠগড়া। তারপরে নাটমন্দির। কাঠের দরজা, পাথরের দেয়াল, টালির ছাদ কিন্তু মাটির মেঝে। নাগরের টালির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অন্যান্য জায়গার মতো পাতলা স্লেটপাথরের ছোট ছোট টুকরো নয়, বেশ মোটা বড় বড় কালো পাথর একখানির ওপর আর একখানি সাজিয়ে ছাদ নির্মাণ করা হয়েছে। দুর্গের ছাদও এইভাবে নির্মিত।

সুশীতল মন্দির। বাস থেকে নেমে বিশ্রাম না করে চড়া রোদে চড়াই ভেঙে এসেছি। স্বভাবতই শ্রান্ত বোধ করছি। গা দিয়ে ঘাম ঝরছে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছি। পুরোহিতের পরামর্শে একটু বসি নাটমন্দিরে। শরীর শীতল হয়।

নাটমন্দিরের পরেই মূল-মন্দির—স্থানীয় নাম ঠাবা মন্দির। পাথর ও কাঠের মন্দির। কাংড়া শিল্পের অনুকরণে নির্মিত। কাঠের দরজায় সুন্দর কারুকার্য।

গর্ভমন্দিরে শ্বেত পাথরের রাধা ও কালো পাথরের কৃষ্ণমূর্তি। মূর্তি দুটি পাথরের বেদির ওপরে স্থাপিত। মাথার ওপরে রুপোর ছত্র।

মানসীর প্রশ্নের উত্তরে পুরোহিত বলেন, "পাঁচ হাজার বছরের পুরানো এ মন্দির।"

"পাঁচ হাজার?" বিস্মিতা মানসী বলে ওঠে।

"হ্যাঁ। পাণ্ডবরা নির্মাণ করেছেন।"

মানসী প্রতিবাদ করে না। সে বোধহয় বুঝতে পেরেছে প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না। পুরোহিত প্রসাদ ও চরণামৃত বিতরণ করেন। ললাটে সিঁদুরের তিলক এঁকে দেন।

আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। নাটমন্দির ও প্রাঙ্গণ পেরিয়ে প্রান্তরে আসি। উৎরাই বেয়ে জোর কদমে নিচে নামতে থাকি। কিছুক্ষণের

মধ্যেই বড় রাস্তায় পৌঁছই। বিশ্রাম-ভবনের বিপরীত দিকে পাশাপাশি চলতে থাকি।

মসৃণ উৎরাই পথ দিয়ে একটা ঝরণা পেরিয়ে আমরা ছোট একটি সমতল প্রান্তরে এলাম। প্রান্তরের মাঝে দুটি প্রাচীন মন্দির। অনেক লোকজন রয়েছেন। তাঁরা আসা-যাওয়া করছেন। তাঁদের একজনকে জিজ্ঞেস করে মানসী, "এ মন্দির দুটির নাম কি ?"

"মন্দির নয়, আশ্রম।" ভদ্রলোক উত্তর দেন। "যোগীঋষির আশ্রম ছিল এখানে। আর ঐ ওপরে যে মন্দিরটা দেখছেন, ওটাই হল গিয়ে সেই জারি মন্দির। ঐ মন্দির থেকে সুড়ঙ্গ-পথ ছিল মণিকরণের। যোগী সেই পথে প্রতিদিন মণিকরণের উষ্ণকুণ্ড থেকে স্নান করে আসতেন।"

"এখনও আছে নাকি পথটা ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"না।" ভদ্রলোক বলেন, "১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে।"

মানসী মুষড়ে পড়ে। একটু হেসে বলি, "সে সুড়ঙ্গ না থাকলেও, সে উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে পারবেন আপনি।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ। আমরা কুলু থেকে মণিকরণ যাব।"

"জয় হোক আপনার।" মানসী উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

হেসে বলি, "এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না। আমার জয় হলে আপনারও জয় অবশ্যম্ভাবী।"

"তাই তো অমন করে চেঁচিয়ে উঠলাম।"

প্রান্তরের পরে চড়াই পথ—পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠেছে। পথের ডানদিকে বনময় পাহাড়, বাঁদিকে উপত্যকা। অনেক দূরে বয়ে যাচ্ছে বিপাশা। বিপাশার তীরে তীরে সবুজ ক্ষেত। চারিদিকেই সবুজের মেলা। সবুজ দেখে দেখে যেন আমার মনটাও সবুজ হয়ে গেছে।

প্রায় মাইলখানেক বনপথ পেরিয়ে আমরা একটি বাগানে প্রবেশ করি। বাগান নয়, কুঞ্জবন। নানা ধরনের ফুলগাছ। ছোট বড় জানা-অজানা ফুলগাছ। গাছে গাছে রঙীন ফুল। শুধু ফুল নয় ফলও আছে। বাড়ির চারিদিকে সারি সারি আপেল গাছ। রঙীন আপেলের ভারে যেন নুয়ে পড়ছে।

গেটের সামনেই পরিচয়লিপি—

'ROERICH ART GALLERY'

পথ ভুল করি নি আমরা। বাগানের পাথুরে পথ পেরিয়ে বাড়ির সামনে এলাম। এটাও বাগানেরই অংশ। তবে এখানে বড় গাছ কম। দৃষ্টি প্রসারিত হল। নিচে নাগার উপত্যকা। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য। সার্থক স্থান নির্বাচন। শিল্পীর সাধনপীঠের আদর্শস্থান। কোথায় রাশিয়া আর কোথায় ভারত। ভিন্ন দেশ, ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন সংস্কৃতি। কিন্তু মানুষ?

মানুষ ভিন্ন নয়। ভিন্ন নয় মানুষের মন, তার শিল্পচেতনা, তার প্রকৃতিপ্রেম। এপারে হিমালয়, ওপারেও হিমালয়। হিমালয় দুয়ের মাঝে যেমন বিভেদের প্রাচীর তুলেছে, তেমনি রচনা করেছে মিলনের সেতু। আমাদের মতো ওরাও হিমালয়কে ভালোবাসেন। হিমালয়কে ভালোবেসেছিলেন নিকোলাস রোয়েরিক।

এই ভালোবাসার সৃষ্টি হয়েছে নিকোলাসের কর্মসাধনাকে কেন্দ্র করে। নিকোলাস জন্মেছিলেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার সেন্ট পিতার্সবুর্গে। তাঁর বাবা ছিলেন এ্যাটর্নী। বাবার ইচ্ছে ছিল ছেলে একই বৃত্তি গ্রহণ করবেন। কিন্তু স্কুলের পাট শেষ করে নিকোলাস আইনের সঙ্গে দর্শন এবং ইতিহাস পড়া শুরু করলেন। তারপরে প্রত্নতত্ত্ব এবং শিল্পকলা নিয়ে পড়লেন কিছুকাল।

শিক্ষা শেষে নিকোলাস রাশিয়ার প্রাচীন শিল্পকলার ওপরে গবেষণা আরম্ভ করলেন। সেই গবেষণার প্রয়োজনেই হিমালয়কে জানবার জন্য তিনি ১৯২৪ সালে প্রথম ভারতে আসেন। সত্য ও সুন্দরের সন্ধানে তিনি চার বছর হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ান। ফলে হিমালয় হয়ে ওঠে তাঁর প্রাণপ্রিয়। তাঁর ভাষায়— 'Himalayas! Here is the Abode of Rishis. Here resoundad the sacred Flute of Krishna. Here thundered the Blessed Goutama Buddha. Here originated all Vedas. Here lived Pandavas . . .Himalayas, Jewel of India. Himalayas Treasure of the World. Himalayas the secred Symbol of Ascent.'

তাই তিনি দেশছাড়া হয়ে এসেছিলেন ভারতে, বাসা বেঁধেছিলেন নাগরে। জীবনের শেষ উনিশটি বছর কাটিয়ে গেছেন এই রমণীয় নিকেতনে। তিনি সাত হাজারেরও বেশি ছবি এঁকেছেন হিমালয়ের ওপরে। হিমালয়কে অবলম্বন করে আর কোন শিল্পী আজ পর্যন্ত এত সুন্দর এবং এত

বেশি ছবি আঁকতে পারেন নি। এই মহাপ্রাণ শিল্পী ১৯৪৮ সালে মহাপ্রয়াণ লাভ করেছেন।

তার সুযোগ্য পুত্র সোয়েৎলভও পিতার প্রদর্শিত পথে শিল্প ও সাধনায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি চিত্রাভিনেত্রী দেবীকারাণীর দ্বিতীয় স্বামী। তাঁরা গ্রীষ্মের ছ'মাস এখানে থাকেন আর শীতের ছ'মাস বাঙ্গালোরে। সেখানে তাঁদের একটা 'এগ্রিকালচারাল' ফার্ম আছে। রাশিয়ার মানুষ এখন সোয়েৎলভকে খুবই ভালবাসেন। তাঁর লেলিনগ্রাদের বাড়িটির বর্তমান নাম 'ঈশ্বর'। সেটি নিকোলাসের স্মৃতিতীর্থ রূপে সমাদৃত।

সোয়েৎলভ এবং দেবীকারাণী এখন এখানে না থাকলেও তাঁরা আমাদের জন্য এখানে রেখেছেন কয়েকখানি অমর চিত্র। যা দেখতে আমরা আজ এসেছি এখানে।

বাড়িখানি ছোট। শুনেছি এরই তিনখানি ঘরে আর্ট গ্যালারী। কিন্তু বাড়ি বন্ধ। দরজায় তালা ঝুলছে। হতাশায় ভরে ওঠে মন। এতদূর এসেও আর্ট গ্যালারী দেখা হল না আমাদের।

মানসী কিন্তু হতাশ হয় না। বলে, "আর্ট গ্যালারী না দেখে আমি নড়ছি না এখান থেকে।" সে বাড়ির পেছনে চলতে থাকে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

বাড়ির পেছনে কেয়ার-টেকারের কোয়ার্টার্স। মানসী হাজির হয় কোয়ার্টার্সের সামনে। কেয়ার-টেকার বেরিয়ে আসেন। মানসী নমস্কার করে তাঁকে। সবিনয়ে বলে, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

ভদ্রলোকের দয়া হয়। তিনি ভেতরে গিয়ে চাবি নিয়ে আসেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আর্ট গ্যালারীর সামনে ফিরে আসি। রুদ্ধ দ্বার খুলে যায়। মনে মনে ধন্যবাদ দিই মানসীকে। তার আগ্রহেই আজ আমার নাগর আসা সার্থক হল।

সংখ্যায় বেশি নয়। প্রথম ঘরে ছ'খানি দ্বিতীয় ঘরে চোদ্দখানি ও তৃতীয় ঘরে উনিশখানি—সব মিলিয়ে পিতা ও পুত্রের উনচল্লিশখানা ছবি। ছবি তো নয়, দেবতাত্মা হিমালয়ের অনিন্দ্যসুন্দর রূপরহস্য। শুধু রঙের আশ্চর্য সমন্বয় নয়, সেই সঙ্গে ঋষির উপলব্ধি। শিল্প-সাধনার সর্বোত্তম সৃষ্টি। এ সৃষ্টি স্বর্গের চেয়ে সুন্দর, মুক্তোর চেয়ে মূল্যবান আর মানুষকে করে তুলেছে মহীয়ান।

সার্থক হল আমার নাগর দর্শন। ধন্য হে তোমরা শিল্পী—পিতা ও পুত্র।

প্রকৃতি-প্রেমিক রোয়েরিক, ভারত-প্রেমিক রোয়েরিক, হিমালয়-প্রেমিক রোয়েরিক, তোমাদের প্রণাম করি।

॥ আট ॥

বেলা দুটোর সময় আমরা নাগরসিভিল রেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। চৌকিদার সেলাম করে। বলে, "খানা রেডী। বৈঠ যাইয়ে।"

মানসী আপত্তি করে, "একটু দেরি হবে বসতে। তুমি দুটো বাথরুমে জলের ব্যবস্থা করে দাও। খানা গরম রাখো।"

চৌকিদার সেলাম করে চলে যায়। আমরা বিশ্রাম-ভবনে প্রবেশ করি। না, আর কোন দর্শনার্থী আসে নি। রাজপ্রাসাদে আমরা একা।

বাধ্য হয়ে আমাকেও স্নান করে নিতে হয়। অবশ্য স্নান সেরে মানসীকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। নাগর ৪১০০ ফুট উঁচু হলেও চড়া রোদ উঠেছে। এতক্ষণ রোদে ঘুরে গরম লাগছিল। স্নান করে আরাম বোধ করছি।

ডাইনিং হলে এসে একখানি ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিই। চৌকিদার খাবার নিয়ে আসে। মানসীর এখনও স্নান হয় নি। হবার কথাও নয়।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে মানসী আসে। সে কচি-কলাপাতা রঙয়ের একখানি শাড়ী ও রঙ মিলিয়ে জামা পরেছে। এ রঙটা আমার বড় ভাল লাগে। ভাল লাগে মানসীকে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

মানসী একটু হাসে। বলে, "অমন করে তাকিয়ে আছেন কেন? আসুন, খেতে বসা যাক। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

নিঃশব্দে এসে ডাইনিং টেবিলে বসি। চৌকিদার খাবার দেয়। আমরা খেতে শুরু করি। কেন যেন মানসীও কোন কথা বলছে না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। চৌকিদারই বা কি ভাবছে। কিন্তু কি বলব? অনেক ভেবেও বলার মতো আর কোন কথা খুঁজে পাই না। বলি, "এ শাড়ীটা তো আর কখনও পরতে দেখি নি।"

মানসী মুখ তোলে। বলে, "আজ আমার ভাগ্য ভাল বলতে হবে।"

"কেন?"

"আমার দিকে না হলেও অন্তত আমার শাড়ীর দিকে নজর পড়েছে।"

"আপনার দিকে নজর দিই না, এ কথাটি কে বলল আপনাকে?"

"এ-সব কথা মেয়েদের কারও কাছ থেকে শুনতে হয় না, আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি।"

"বোঝার মাঝে তো ভুল-বোঝারও একটা স্থান আছে।" আমি মানসীর দিকে তাকাই।

"ভুল বোঝা-বুঝির সম্পর্ক তো নয় আমাদের।" একবার থামে মানসী। সে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী স্বরে বলে, "আমার দিকে আপনার নজর নেই বলেই আমি এমনভাবে আপনার সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছি। জোর করে নজর দেবার চেষ্টা করবেন না যেন, তাহলে বান্ধবী-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।"

মানসী কি সাবধান করছে আমাকে? ঠিক বুঝতে পারি না। আর কোন কথা না বলে খেয়ে যেতে থাকি।

খাওয়া শেষে মানসী বলে, "আমি চলে যাচ্ছি আমার ঘরে, আপনি কোথায় বিশ্রাম করবেন?"

আমি ইশারায় ডেক-চেয়ারটা দেখিয়ে দিই। মানসী বেরিয়ে যায় ডাইনিং হল থেকে। আমি মুখ ধুয়ে এসে ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিই। কেবল তিনটে বেজেছে। ঘণ্টা দুয়েক বিশ্রাম নেয়া যাবে।

ঘুম ভেঙে যায়। কেউ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। চোখ মেলে তাকাই। মানসী। তাড়াতাড়ি ঘড়ি দেখি—এ যে মোটে চারটে। এখনই ডাকাডাকি করছে কেন? উঠে বসি। ওর দিকে তাকাই। সে বলে, "একবার বারান্দায় আসুন না।"

আবার জানি কি খেয়াল চেপেছে। প্রতিবাদ বা প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই। একবার যখন খেয়াল হয়েছে, তা মেটাতেই হবে। উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "চলুন।"

মানসীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি বারান্দায়। হাত ইশারা করে মানসী বলে, "ঐ দেখুন।"

কি দেখব? পাহাড় প্রান্তর না নদী?

মানসী বোধ হয় বুঝতে পারে আমার দৃষ্টির অসারতা। সে বলে, "ঐ দেখুন বিশ্রাম-ভবনের পাঁচিলের পেছনে গাছে গাছে কেমন আপেল ধরে আছে।"

হায় হরি! আপেলের রাজ্যে বসে আপেল দেখাবার জন্য মানসী আমার এমন মৌ-ঘুমটা মাটি করে দিলে! বিরক্তি বোধ করি। বলি, "এ আবার

একটা দেখার মতো কি হল ?”

আমার কণ্ঠস্বরে সে বোধ হয় একটু অপ্রস্তুত হয়। একটা ঢোক গিলে বলে, “না, মানে আপেলগুলি চমৎকার। কেমন রঙ দেখছেন না ? আমার থলিটা খালি করে দিচ্ছি, নিয়ে আসুন না কয়েকটা।”

“কার না কার গাছ, একটা বিপত্তি ঘটবে। বিদেশে এসে ··”

“আপনি বড্ড ভীতু। কি আবার বিপত্তি ঘটবে? কেউ যদি একান্তই দেখে ফেলে, দাম দিয়ে দেব। তবে কেউ দেখবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি এখানে, কোন লোক আসে না এদিকে।”

আশ্চর্য। এত বেছে ঘুমের ঘর পছন্দ করে না ঘুমিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপেলের সৌন্দর্য দর্শন করেছিল মানসী। কিন্তু এমন আপেল বোঝাই গাছ তো ছড়িয়ে আছে কুলু উপত্যকার সর্বত্র। বলি, “কি দরকার না বলে-কয়ে পরের গাছ থেকে আপেল নেবার ? তার চেয়ে বাজার থেকে কিনে নিলে হয় না ?”

“না।” মানসী যেন গর্জে ওঠে। “হয় না। চুরি করে খাওয়া আর কিনে খাওয়া এক জিনিস না।”

“কিন্তু চুরি করলে যে মার খেতে হয়, জেল খাটতে হয়, সেটা তো আপনার অজানা নয়।”

মানসী যেন অবাক হয়। বলে, “আচ্ছা আপনি একটা কি বলুন তো ? আমার মতো একজন বান্ধবীকে খুশি করতে আপনি এতটুকু ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। পৌরাণিক কাহিনীগুলো কি বৃথাই পড়েছেন ?”

হাসি পায় আমার। আমি হেসে ফেলি।

“হাসবেন না তো অমন করে। আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।” মানসী রেগে গেছে। “বেশ আপনি যখন যাবেন না, আমিই যাচ্ছি। দয়া করে এখানে একটু দাঁড়াতে পারবেন কি ? পারলে একটু দাঁড়ান। কোন লোক এদিকে এলে জোরে জোরে গান গেয়ে উঠবেন।”

আমাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মানসী চলে যায় ভেতরে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি বারান্দায়।

একটু বাদে সে খালি থলি হাতে ফিরে আসে। আমি তার দিকে হাত বাড়াই। বলি, “থলিটা দিন আমাকে।”

“সুমতি হয়েছে তাহলে।”

"না হয়ে উপায় কি? এক তো আমি থাকতে আপনি যাবেন আপেল চুরি করতে, লোকে শুনলে বলবে কি?"

"আর?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"গান গাওয়ার চেয়ে চুরি করা অনেক সহজ।"

মানসী হেসে দেয়। আমিও হাসতে হাসতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলি।

সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচের তলায়। ঘাস আর ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে পাচিলের কাছে পৌঁছই। পুরনো পাঁচিল। মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। ভাঙা দেয়ালের ভেতর দিয়ে বাইরে আসি। বাইরে ঘন জঙ্গল—কাঁটা আর বিছুটি গাছের বন। পাহাড়টা খাড়া নেমে গেছে, কিন্তু জঙ্গলের জন্য বোঝা যাচ্ছে না ঠিক কোনখানে পা দিলে নিরাপদ। মায়াময়ী প্রকৃতি। এই বনের ভেতরে সোনালী আপেল সাজিয়ে রেখে আকর্ষণ করেছে মানসীকে। সে বোধ হয় জানে মানসী আধুনিকা হলেও মানবী, ইভের উত্তর-সাধিকা।

অনুমানে পা ফেলতে হচ্ছে। একটু এদিক-ওদিক হলেই গড়িয়ে পড়ব বহু নিচে। কাঁটা গাছে পা ছড়ে যাচ্ছে। বিছুটির ঘষায় গা জ্বালা করছে। তবু আমাকে এগিয়ে যেতে হচ্ছে সোনালী আপেলের দিকে। আমি আদমের প্রতিনিধি। আমাকে সোনালী আপেল আনতেই হবে। এ আমার জন্মগত শাস্তি।

অনেক কাঁটার খোঁচা আর বিছুটির জ্বালা সহ্য করে, একাধিকবার আছাড় খেয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছলাম সেই সোনালী আপেল গাছের নিচে। না, মানসীর চোখ আছে বলতে হবে। সত্যি সোনা—যেমনি বড়, তেমনি পাকা। হাত বাড়ালেই ধরা যায়। তাড়াতাড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে থলি বোঝাই করতে থাকি। অনেক নিচে বিপাশার তীরে বাড়ি-ঘর ও ছোট একটি মন্দির। লোকজন চলা-ফেরা করছে। ওরা আবার না দেখে ফেলে। ওপরের জন্য চিন্তা করি না। ওপরে মানসী আছে। কেউ এলে সে গান গেয়ে উঠবে।

থলি বোঝাই হয়ে গেছে—কাজ শেষ। ওপরের দিকে তাকাই। কি সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি বসে পড়ি ঝোপের আড়ালে। সাপ কিংবা পোকা-মাকড় আছে কিনা, কে জানে? রোদে তেতে উঠেছে চারিদিক। সাপ থাকা মোটেই অসম্ভব নয়! কিন্তু না লুকিয়েই বা উপায় কি? মানসীর পাশে স্বয়ং চৌকিদার দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু মানসী গান গাইছে না কেন?

কতক্ষণ বসে আছি ঠিক খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখি দূরের ঝোপ-ঝাড় নড়ছে। চৌকিদার! জঙ্গল ঠেলে এদিকে আসছে। লোকটা তো

সাংঘাতিক। হাতে-নাতে ধরবার জন্য একেবারে এ পর্যন্ত ধাওয়া করেছে। পালাবার যখন পথ নেই, তখন ধরা দেয়াই ভাল। আমি উঠে দাঁড়াই।

"না না, সাহেব পড়ে যান নি মেবসাব! ঐ তো ওখানে রয়েছেন। আপনি আর এদিকে আসবেন না।"

তাই তো। দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়ে আছে মানসী। আমি ঝোপের আড়ালে বসে পড়ায় ওরা ভেবেছে আমি হয়তো বা পড়ে গেছি নিচে। যাক্ চৌকিদার তাহলে চোর ধরতে আসে নি।

কাছে এসে আমার কাঁধ থেকে থলিটা হাতে নেয় চৌকিদার। তারপরে বলে, "চলুন সাব্। ছিঃ ছিঃ, আপনার কি জরুরত ছিল এই ঝকমারি করার। আমাকে বললেই তো আমি এ আপেল পেড়ে দিতাম।"

চা খেয়ে চৌকিদারের পাওনা মিটিয়ে বেরিয়ে আসি নাগর রাজপ্রাসাদ থেকে। চৌকিদার সঙ্গে আসে রাস্তা পর্যন্ত। দু' হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। কতক্ষণেরই বা পরিচয়। তবু মায়া হচ্ছে লোকটির জন্য। সামান্য সম্বল, তবু সাধ্যমত সেবা করেছে আমাদের। দুঃখ হচ্ছে ভেবে—ওর সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না।

মানসীর মনটাও ভিজে উঠেছে। সে জিজ্ঞেস করে, "ওকে কিছু বকশিশ দিয়েছেন?"

"ঠিক বকশিশ বলে কিছু দেই নি। তবে বেশি দিয়েছি।" আমি উত্তর দিই।

"ক'ত দিয়েছেন?"

"দশ টাকা।"

"আর দশটা টাকা দেব?"

"ইচ্ছে হলে দিন। ওকে দিলে তো আর অপব্যয় হবে না।"

খুশি হয় মানসী। ব্যাগ খুলে দশ টাকার একখানি নোট চৌকিদারের হাতে দেয়। আবার সেলাম করে কৃতজ্ঞ চৌকিদার। আমরা এগিয়ে চলি নিজেদের পথে। চৌকিদার দাঁড়িয়ে থাকে দশ টাকার নোটটি হাতে নিয়ে।

চড়াই ভেঙে আমাদের বাস এসে দাঁড়িয়েছিল রাজপ্রাসাদের সামনে। এখানে খানিকটা জায়গা সমতল। তার পরেই পথটি নেমে গেছে নিচে। সেই উৎরাই পথে আমরা চলেছি এগিয়ে। পথের দু দিকেই বড় বড় গাছ।

নির্জন মসৃণ পথ।

কিছুক্ষণ বাদে আমরা নেমে এলাম সমতলে। তার মানে বিপাশার বেলা-ভূমিতে নেমে এসেছি। এক সময় পেরিয়ে এলাম বিপাশার পুল। তারপরেও পথ তেমনি ছায়াশীতল। বরং আরও শান্ত, আরও সুন্দর। যতদূর দেখা যায় আঁকাবাঁকা জনহীন পথটি গাছের ছায়ায় শুয়ে আছে কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে নি। ঘুমোতে পারে নি। সে শুয়ে শুয়ে গান শুনছে। যৌবনের গান—ঝরণার কলতান। পথের পাশে পাশে কল-কল ছল-ছল করে একটি ঝরণা যাচ্ছে বয়ে।

আমরা দুজনে চলেছি সেই পথে। নিঃশব্দে চলেছি। তবু বড় ভাল লাগছে। নীরবতার ভাষায় যে ভরে উঠেছে আমাদের মন।

হঠাৎ নজর পড়ে আমার। কেবল আমি নই, মানসীও দেখতে পেয়েছে ওদের। কিন্তু ওরা বোধ করি দেখতে পায় নি আমাদের। পথ থেকে একটু দূরে ঝোপে-ঝাড়ে ছাওয়া ঝরণার তটভূমি। সেখানেই একখানি পাথরের ওপরে বসে আছে ওরা। ঠিক বসে নেই, মেয়েটির বুকে মুখ লুকিয়ে মিলন-সুখ উপভোগ করছে ছেলেটি। এমন মিলন-মধুর গোধূলি আর এই শান্ত-সুন্দর পরিবেশ। প্রিয়ার পাশে বসে তার সুধাভরা বুকের প্রতি প্রলুব্ধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

মেয়েটি দেখতে পায় আমাদের। তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে সরিয়ে দিয়ে ঠিক হয়ে বসে। খসে পড়া ওড়নাখানি টেনে নেয় বুকে। ছেলেটি উঠে বসে। একবার আড়চোখে আমাদের দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মেয়েটির দিকে নয়, নির্ঝরিণীর দিকে। সে-ও যে বড়ই সুন্দর। কলতানে বনভূমিকে মুখরিত করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে বিযাসের সঙ্গে মিলিত হতে।

ওরা বসে থাকে, আমরা এগিয়ে চলি। আমরা পথিক—সকল কালের, সকল পথের পথিক। আমরা এগিয়ে চলি—দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, জীবন থেকে মহাজীবনের পথে।

কেন যেন চুপ করে থাকতে পারে না মানসী। সে সহসা বলে ওঠে, "ওরাও বোধ হয় আমাদেরই মতো নাগর দেখে ফিরে চলেছিল। পথের অনাবিল সৌন্দর্য দেখে বসে পড়েছে ঝরণার ধারে।

"তাই হবে।" চলতে চলতে জবাব দিই।

"ঝরণাটি সত্যি সুন্দর।"

"হ্যাঁ।"

"আমরাও বসব নাকি একটু। অনেকটা হাঁটা হল।"

আমি মানসীর দিকে তাকাই। চোখাচোখি হয়। মানসী চোখ নামিয়ে নেয়। কাছাকাছি কোথায় যেন একটা পাখি গান গেয়ে ওঠে। কিছুক্ষণের জন্য ঝরণার কলতান যায় হারিয়ে।

হঠাৎ হেসে ওঠে মানসী। বলে, "তাই বলে ভাববেন না যেন, ঐ ছেলেটি যেভাবে বসে ছিল, সেই ভাবেই বসবার অনুমতি দেব আমি। অনেকটা দূরত্ব রেখে কেবল পাশাপাশি বসব আমরা। কেউ কোন কথা বলব না। শুধু ঝরণার গান আর বনের মর্মর শুনব।"

আমারও হাসি পায়। আমিও হেসে উঠি।

মানসী চলা বন্ধ করে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "হাসছেন যে?"

হাসি থামিয়ে বলি, "ঝরণাটা সত্যি সুন্দর। কিন্তু এমন অসংখ্য ঝরণা তো ছড়িয়ে আছে হিমাচলের সর্বত্র।"

"তাহলে কি বসছি না আমরা?"

"না।"

"কেন?"

"দূরত্ব যদি বজায় রাখতেই হয়, তাহলে এখানে বসে সময় নষ্ট করা কেন? বাসেও তো পাশাপাশি বসতে হবে আমাদের।"

বাসস্ট্যাণ্ড অর্থাৎ পাতলিকুলু জায়গাটি একটি গঞ্জের মতো। বাজার আর কয়েকটি গুদাম। আপেল আর কাঠের গুদাম। নাগরের পথটি যেখানে এসে কুলু-মানালী পথে মিশেছে সেখানেই বাসস্ট্যাণ্ড। সামনে খানিকটা খালি জমি। তারপরে একটি টিলা। পথের পাশে দেওদার বন। বন-বিভাগের সম্পত্তি।

এখান থেকে মানালী যেতে এক ঘণ্টা ও কুলু যেতে আধ ঘণ্টা লাগে। দূরত্ব কিন্তু প্রায় সমান। সময়ের ব্যবধানের কারণ মানালীর পথ চড়াই। কুলু থেকে মানালীর উচ্চতা বেশি। কুলু ৭,২০০´ আর মানালী ৬০০০ফুট। আমরা এখান থেকেও কুলু চলে যেতে পারতাম।

বাস এলো প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে। আমাদের ভাগ্য ভাল। বসার জায়গা পাওয়া গেল। পাশাপাশিই বসতে পেলাম আমরা। মানসী জানলার ধারে বসল। হেসে বলি, "এবারে কিন্তু আর দূরত্ব বজায় রাখা গেল না। কারণ বাসের আসনগুলি ঝরণা তীরের পাথরগুলির মতো সুদীর্ঘ নয়।"

"দুর্ভাগ্যের কথা।" মানসী গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়। "তাই বলে বেশি ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করবেন না যেন।"

তাড়াতাড়ি একটু সরে বসি। মানসী মৃদু হাসে। বাস চলতে শুরু করে।

একটু বাদে হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "দুপুর থেকে তো দিব্যি ফাঁকি দিচ্ছেন।"

"ফাঁকি?" বিস্মিত হই।

"ফাঁকি নয় তো কি? নাগর আর পাঞ্জাবী যুবক-যুবতীর অভিসার দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে। কিন্তু যতো বোকা আমাকে ভেবেছেন, আমি ততো বোকা নই মশাই।"

"আমি আবার কখন আপনাকে বোকা ভাবলাম? আর ভাববই বা কেন? আপনি তো সত্যি সত্যি বোকা নন।"

"নই বুঝি?" মানসী আমার দিকে তাকায়।

"না।"

"তাহলে বলুন।"

"কি?"

"মণিমহেশের কথা।"

হায় ভগবান! এই জন্য এত বড় প্রস্তাবনা। হাসতে হাসতে বলি, "আপনার ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল।"

"কি আশ্চর্য!" মানসী যেন বিস্মিত। "আমার বাবাও যে ঐ একই কথা বলেন।"

"খুবই স্বাভাবিক—গ্রেট মেন থিঙ্ক এলাইক," আমি বলি, "তাহলে আপনার বাবার আশা পূর্ণ করলেন না কেন?"

"কলকাতা হাইকোর্টে মেযে ব্যারিস্টারদের তেমন পশার হয় না বলে। আর……" সহসা থেমে যায় মানসী।

"থামলেন কেন? বলুন আর…"

"আরেকজনকে ব্যারিস্টার করার জন্য নিজে ব্যারিস্টার হতে পারলাম না। বাবাকে বলে তাকেই বিলেতে পাঠিয়ে দিলাম।"

"সে কে? আপনার কি হয়?"

কোন উত্তর দেয় না মানসী। সে বাইরের দিকে তাকিয়ে একটুকাল চুপ করে থাকে। তারপরে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে মিনতিভরা স্বরে বলে ওঠে,

"প্লিজ, আর কোন কথা জিজ্ঞেস করবেন না। সে-কথা যে আমি ভুলে যেতে চাইছি তিন বছর ধরে। পারছি না বলেই তো এমন করে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। পারছি না বলেই আপনার কাছে হিমাচলের কথা শুনতে চাইছি। আপনি বলুন মণিমহেশের কথা। আমার অতীতকে ভুলিয়ে দিন। আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করুন।"

॥ নয় ॥

মানালী এসে বাস থামল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মানসী বলে, "ন'টা বাজে। চলুন, একেবারে খেয়ে নিয়ে বাংলোয় ফেরা যাক্।"

"তাই করতে হবে।" আমি বলি, "কিন্তু তার আগে একবার খবরের কাগজের খোঁজ করতে হবে।"

"পাবেন কি?"

"সকালে তো বলে গিয়েছি রেখে দিতে।"

আমরা নেমে আসি বাস থেকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি। রাস্তার ধারে দোকানটা। সামনে আসতেই দোকানী একখানি 'ট্রিবিউটন' আমার হাতে দেয়। তাড়াতাড়ি কাগজখানি মেলে ধরি। মানসী এসে পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "কিছু লিখেছে ওদের কথা?"

আমি ইশারায় ওকে খবরটা দেখিয়ে দিই। মানসী পড়তে থাকে—১৯শে সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় তিনজন শেরপাকে নিয়ে প্রাণেশ চক্রবর্তী মানা শৃঙ্গে আরোহণ করেছে। কিন্তু পরদিন পাঁচ নম্বর শিবির থেকে নেমে আসার সময় দুজন অভিযাত্রী ও চারজন শেরপা আহত হয়েছে। শেরপাদের নাম আছে—শেরিং লাকপা, ফু তেনজিং, আঙ রিতা ও সোনা। কিন্তু নাম নেই আহত অভিযাত্রীদের। তারা কে? এমন কি আহতরা কেমন আছে, সে খবর পর্যন্ত নেই।

"অসম্পূর্ণ খবর।" মানসী বিরক্তির সঙ্গে মন্তব্য করে, "এ খবর তো আমরা কাল রেডিওতেই শুনেছি।"

খবরের কাগজের প্রতীক্ষায় ছিলাম। কিন্তু কাগজ হাতে পেয়ে দুশ্চিন্তা কমল না, বরং বাড়ল। অথচ দুশ্চিন্তা ছাড়া আমি আর কি করতে পারি। ওরা কোথায় আর আমি কোথায়? আমি যে কোন ভাবেই ওদের সাহায্য

করতে পারি না।

মনে পড়ছে প্রাণেশের বাবার কথা। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধে তিনি প্রাণেশকে অভিযানে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন কিন্তু কেন যেন দুশ্চিন্তার হাত থেকে রেহাই পান নি। তবে কি পিতার মন সেদিন বলেছিল, এমনি কোন দুর্ঘটনা ঘটবে?

ওরা যেদিন কলকাতা থেকে রওনা হয়, সেদিন দুপুরে আমি আবার গিয়েছিলাম প্রফুল্লবাবুর অফিসে। টেবিলে মাথা রেখে বসেছিলেন তিনি। ডাক দিতেই মাথা তুললেন, তার চোখে জল। আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি দু হাতে চোখ মুছে নিয়ে ম্লান হাসি হেসে বললেন—বসো।

বসলাম, কিন্তু কোন কথা বলতে পারলাম না। কি বলব?

তিনিই আবার কথা বললেন একটু বাদে—ওরা তো আজ চলে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। আমি মাথা নাড়ি। তিনি চুপ করে থাকেন।

আমি আবার বলি—আপনি স্টেশনে যাচ্ছেন তো?

—না। আমার শরীরটা ভাল নেই। প্রাণেশের মা যাবে।

বুঝলাম বিদায়ের দৃশ্যটা এড়াতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কেন? নীলগিরি ও তীরশূলী অভিযানে যাবার সময় তো তিনি স্টেশনে গিয়েছেন। হাসি মুখেই ছেলেকে বিদায় দিয়েছেন।

মামুলী কয়েকটা কথা বলে সেদিন আমি পালিয়ে এসেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু তখন একবারও ভাবি নি, কোন দুর্ঘটনা ঘটলে আমি আর মুখ দেখাতে পারব না তাঁকে।

কাঁধের ওপর কোমল একটা স্পর্শ পেয়ে বাস্তবে ফিরে আসি। মানসী বলে, "রাত বাড়ছে, চলুন খেতে যাই।"

"আমার খিদে নেই। চলুন, আপনি খেয়ে নেবেন।"

"তাহলে আর খাবার হাঙ্গামায় কাজ নেই। চলুন, বাংলোয় ফিরে যাই।"

"সে কি! আপনি খাবেন না কেন?"

"যে জন্য আপনি খাচ্ছেন না।" মানসী হাসে। "ওদের চিন্তায় উপোস করে আপনি একা পুণ্যসঞ্চয় করবেন, তাও কি হয়?"

এতো দুঃখের মাঝেও হাসি পায় আমার। বলি, "আমি উপোস করছি, এ কথাটা কে বললে আপনাকে?"

"কে বলবে আবার, আমি কি একেবারেই বোকা। কিছুই বুঝতে পারি না।" একবার থামে মানসী। তার পরে কণ্ঠস্বরে সান্ত্বনার সুর মিশিয়ে

বলে, "কি হয়েছে কিছুই যখন বোঝা যাচ্ছে না, তখন এমন ভেঙে পড়ছেন কেন? হিমালয়-পথিক আপনি। আপনার তো এমন অধীর হওয়া সাজে না। চলুন খেয়ে নিয়ে ফিরে যাই বাংলোয়। জোশীমঠ ও কলকাতায় যখন টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, খবর নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন।"

"কে খবর দেবে? প্রাণেশ কি আমার জোশীমঠের টেলিগ্রাম পাবে। রণেশদা, অমূল্য, বীরেন ও স্বপন কেউ কলকাতায় নেই।"

"কোথায় গেছেন তাঁরা?"

"নানা জায়গায়। বীরেন, সুজল, হিমাদ্রি ও বরেণ্য এখন তপোবনে।"

"কেন?"

"আমাদের কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সমীক্ষা করতে।"

"অন্যান্যরা?"

"ওরাও সবাই বেড়াতে গেছে।"

"দাশুবাবু তো রয়েছেন কলকাতায়, তিনিই খবর দেবেন।"

বিস্মিত হই মানসীর কথায়। বলি, "আপনি দাশরথিকে জানলেন কেমন করে?"

একটু হাসে মানসী। বলে, "আমি গিরি কান্তার-যের যাত্রীদের জানবো না—আমি যে আপনার অনুগত পাঠিকা।"

"জেনে আনন্দিত হলেম যে, এ সংসারে আমার অন্তত একজন অনুগত পাঠিকা আছে।"

"তাহলে খেতে চলুন, পাঠিকা বাধিত হবে।"

"আপনার সত্যি ব্যারিস্টার হওয়া উচিত ছিল।" আমি হাসতে হাসতে বলি।

শেষ পর্যন্ত খেতে হল। খেয়ে নিয়ে আপেল বাগানের পাশ দিয়ে চড়াই পথ ভাঙতে থাকি ধীরে ধীরে। চাঁদনী-রাত কিন্তু মেঘে ছাওয়া আকাশ। আধো-আলো আধো-ছায়ায় মানালী মোহময়ী। ফরেস্ট ডাকবাংলো পর্যন্ত আসতে অসুবিধে হয় নি কোন। এ পর্যন্ত চাঁদের আলোর আভায় মোটামুটি পথের ঠাহর পেয়েছি। কিন্তু এখন পথের দুধারে বড় বড় গাছ। মেটে জ্যোৎস্না এখানে প্রবেশের পথ পায় নি। আঁধারে ঘেরা পথ। আঁধারের রূপ দর্শন করার মতো মানসিক অবস্থা নয় এখন। তাই অনুমানে পথ চলতে থাকি। মানসী বলে, "বড্ড অন্ধকার।"

"আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে আসুন, সাবধানে চলুন।"

কিন্তু সাবধান হবার আগেই হোঁচট খায় মানসী। এবং আমি কিছু করতে পারার আগেই সে পড়ে যায় পথের ওপরে। তাড়াতাড়ি পেছন ফিরে এগিয়ে আসি তার কাছে। অনুমানে হাত বাড়াই। আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ায় মানসী। জিজ্ঞেস করি, "চোট লেগেছে কি?"

"সামান্য।" সে উত্তর দেয়। বলে, "চলুন।" কিন্তু আমার হাত ছাড়ে না।

আমি আস্তে আস্তে চলতে থাকি।

হঠাৎ সুর করে বলে ওঠে মানসী, "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চলো সখা, আমি যে পথ চিনি না।"

জাগরণ ও সুপ্তির সংমিশ্রণে ক্লান্তিকর রাত্রির অবসান হয়। তবু শয্যাত্যাগ করি না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকি প্রাণেশের কথা—মানা অভিযানের কথা।

প্রাণেশ ২৩,৮৬০´ ফুট উঁচু মানা শিখরে আরোহণ করেছে, এর আগে বে-সরকারী অভিযানে কোন ভারতীয় এত উঁচু শিখরে আরোহণ করতে পারে নি।

কিন্তু প্রাণেশ এত বড় গৌরব অর্জন করার পরেও আমি খুশি হতে পারছি না। আমি এখনও জানি না আহত অভিযাত্রীরা কেমন আছে? কেমন করে ওদের কুশল সংবাদ পাবো?

মনের উন্মুক্ত গবাক্ষে উঁকি দেয়, আর একজনের ভাবনা—মানসী। একটু বাদেই সে আমার রুদ্ধ-দ্বারে আঘাত করবে। একরাশি হাসি মুখে ছড়িয়ে আমার ঘরে আসবে। আমাকে জিজ্ঞেস করবে—রাতে ঘুম হয়েছে? ওর মুখ দেখে বোঝাই যাবে না যে, সে কাল রাতে অমন একটা কাণ্ড করেছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখতে পাই, জানলা দিয়ে সোনালী রোদ এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে আমার ঘরে। ঘড়ি দেখি—সাতটা বাজে। আশ্চর্য! মানসী তো এখনও এলো না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ি। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে আসি। কোথায় মানসী? তার দরজা বন্ধ। তাহলে কি সে এখনও ঘুমুচ্ছে? কিন্তু এতো বেলা পর্যন্ত তো তাকে আর ঘুমোতে দেখি নি। ফিরে আসি ঘরে। বাথরুমে ঢুকি। কিন্তু দরজায় খিল দিই না—মানসী আসবে।

মানসী আসে না। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখি—মানসী নেই

আমার ঘরে। মানসীর দরজা বন্ধ। সাড়ে সাতটা বাজে। সে কি এখনও ঘুমোচ্ছে? ডাক দেব কি? না, না। সেটা ভাল দেখায় না।

পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিই। তবু দরজা খোলে না মানসী। কি হল? কি আর হবে, হয়তো ঘুমোচ্ছে। ঘুমাক, কাল ঘুমোতে পারে নি।

ঘরে তালা দিয়ে আমি বেরিয়ে আসি বাইরে। গেটের কাছ থেকে আর একবার পেছনে তাকাই। না, বন্ধ দুয়ার খোলে নি মানসী। আমি হাঁটতে শুরু করি।

কোথায় যাচ্ছি? কেনই বা যাচ্ছি? কথা ছিল সকালে একসঙ্গে চা খেতে যাবো। তার পরে দর্শন করব হিড়িম্বা মন্দির। তাহলে আমি একা পথে বের হলাম কেন? তাই বলে তো এখান থেকেই ফিরে যাওয়া যায় না। যারা আমাকে বাংলো থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছে, তারা কি ভাববে?

আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকি। না, জায়গাটা সত্যি অন্ধকার। চাঁদের আলো কেন, সূর্যের আলো পর্যন্ত আসতে বাধা পায়। কাল রাতে এখানেই পড়ে গিয়েছিল মানসী। আমি তাকে হাত ধরে তুলেছিলাম। আমার হাত ছেড়ে দেয় নি সে। আমি তাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম ট্যুরিস্ট বাংলোয়। আজ তাহলে মানালীর পথে আমি কেন একা?

তাড়াতাড়ি ফিরে চলি। যারা আমাকে বেরিয়ে আসতে দেখছে, তারা কি ভাববে? যা ইচ্ছে ভাবুক গে। তাদের ভাবনায় আমার কি এসে যায়?

গেট পেরিয়েই দেখতে পাই ওকে। পথের দিকে তাকিয়ে আমার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাসতে হাসতে এগিয়ে চলি। কেন যেন মুখ ঘুরিয়ে নেয় মানসী। ওদিকে অমন করে কি দেখছে সে?

আমি বাংলোর বারান্দায় উঠে আসি। সহসা ঘুরে দাঁড়ায় মানসী। ত্রস্ত পায়ে নিজের ঘরে চলে যায়।

মানসীর দুয়ারে এসে দাঁড়াই। একবার একটু ইতস্ততঃ করি। তার পরে দরজা ঠেলে ওর ঘরে আসি। মুখ নিচু করে বসে আছে মানসী। কোন কথা বলে না সে।

আমি মৃদু হেসে বলি, "খুব ঘুমিয়ে নিয়েছেন আজ।"

মানসী চুপ করে আছে। আমি এগিয়ে আসি কাছে। এবারে দেখতে পাই—ওর চোখে জল। মানসী কাঁদছে। কিন্তু কেন?

আমি চুপ করে থাকি। নীরবে কেটে যায় কিছুক্ষণ। জিজ্ঞেস করি, "কাঁদছেন কেন?"

আঁচলে চোখ মোছে মানসী। বলে, "আমাকে না ডেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন কেন?"

"আপনার দরজা বন্ধ ছিল বলে আর ডাকি নি আপনাকে।"

"কিন্তু কাল তো আমি ·· " অভিমানী মানসী শেষ করতে পারে না। আর সামলাতে পারে না নিজেকে। সে কেঁদে ফেলে।

সান্ত্বনার স্বরে বলি, "কাল আপনি আমাকে ডেকেছিলেন, তবু আমি আজ ডাকতে পারি নি আপনাকে।"

"কেন?"

"আমি যে সখা। সখীর মতো সহজ হওয়া সম্ভব নয় আমার।"

চোখ মোছে মানসী। সে তাকায় আমার দিকে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "লেখকের সুনাম নষ্ট হত?"

"না।" অকম্পিত কণ্ঠে জবাব দিই, "পাঠিকার দুর্নাম রটতে পারত।"

কি বলতে গিয়েও যেন থেমে যায় মানসী। একটু বাদে বলে, "তাই বলে আমাকে এভাবে একা ফেলে রেখে আপনি বেরিয়ে গেলেন।"

"আপনি তো একাই পথে বেরিয়েছেন।"

"কিন্তু আমি যে পথ চিনি না।"

বলতে চাই—চিনে নিতে হবে। কিন্তু পারি না। আমি চুপ করে থাকি।

আমার নীরবতায় খুশি হয় মানসী। সে তার স্বাভাবিক ভঙ্গীতে বলে ওঠে, "শুধু কি মানালীর পথে-পথে টহল মারা হয়েছে, না চা-ও খেয়ে আসা হয়েছে?"

"আমি তো মানালীতে একা নই যে একা চা খেয়ে আসব।"

"তা এতো বেলা পর্যন্ত নির্জলা উপোস থাকার কারণ কি?"

"আমার পথের সাথী যে উপোসী রয়েছে।"

"ধন্যবাদ। এবার তাহলে উপবাস ভঙ্গ করতে যাওয়া যাক্।"

"উত্তম প্রস্তাব।"

আবার বেরিয়ে পড়ি পথে। এবারে আর একা নই আমি। মানসী রয়েছে আমার সঙ্গে।

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে মানসী বলে, "কাল সকালে তো চলেই যাচ্ছি মানালী ছেড়ে। আজ আমরা তাই সারাদিন মানালীর পথে পথে কাটাবো।"

"লেখক সানন্দে পাঠিকার সঙ্গী হবে।"

"আর লেখক নয়।"

"তাহলে কি?"

"সখা।"

"সখী বলে ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবে তো?"

"পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।"

"পারেন নয়, পারো।"

"বেশ মেনে নিলাম।"

"খুশি হলেম।"

"কিন্তু হাসি-খুশি মন নিয়ে কোথায় যাওয়া হবে এখন?" মানসী প্রশ্ন করে।

"হিড়িম্বা তথা ডুংরি মন্দির দর্শন করতে।" আমি জবাব দিই।

"সেটি কোন্ পথে?"

"ঠিক জানি না। চিনে নিতে হবে।"

"সখা যখন সঙ্গে রয়েছে, তখন সখীর ভাবনা কি? সখাই তাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবে।"

আমরা বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। ঘন পাইন বনের মধ্য দিয়ে পথ। ভীমপত্নী হিড়িম্বার নামে উৎসর্গীকৃত আর কোথাও কোন মন্দির আছে বলে আমার জানা নেই। হিড়িম্বা ছিলেন রাক্ষসী। কুলু উপত্যকার অধিকাংশ মন্দিরের বিগ্রহই দানব কিংবা রাক্ষসের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। আজও তারা পরমসমাদরে পূজিত হচ্ছে। হিড়িম্বা মন্দির মানালীর প্রাচীনতম মন্দির। সাড়ে ছ'শ' বছর আগে নির্মিত হয়েছে।

কথিত আছে তৎকালীন রাজার আদেশে জনৈক শিল্পী এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দির দেখে বড়ই খুশি হলেন রাজা। তিনি চাইলেন, এমন মন্দির যেন আর নির্মিত না হয়। তাই তিনি শিল্পীর ডান হাতখানি কেটে ফেললেন। শিল্পী পালিয়ে গেলেন রাজ্য ছেড়ে। অকৃতজ্ঞ রাজাকে সমুচিত জবাব দেবার জন্য তিনি বাঁ হাতে খোদাই কাজ শিখতে শুরু করলেন। আপন অধ্যাবসায়-বলে কয়েক বছরের মধ্যেই শিল্পী বাঁ হাতে তেমনি কাজ করতে সক্ষম হলেন। তখন তিনি লাহুল উপত্যকার ত্রিলোকনাথ মন্দির নির্মাণ করলেন। শিল্পকর্মে সে মন্দির হিড়িম্বা মন্দিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। রাজশক্তি ব্যর্থ হল, শিল্পীর সাধনাই হল জয়যুক্ত।

বন ক্রমেই ঘন হচ্ছে। চড়াই পথ বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি আমরা। চলতে চলতে ভাবছি সেই কাহিনী—ধরে নিয়ে যেতে এসে, ধরা দিয়েছিলেন হিড়িম্বা।

জতুগৃহ দাহের পরে মা কুন্তীদেবীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব হিড়িম্বক বনে প্রবেশ করলেন। দুর্গম পথশ্রমে সবাই ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত। মা বললেন—জল না পেলে আর যে চলতে পারছি না।

ভীমসেন তখন চার ভাই ও মাকে একটা বটগাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বলে জল আনতে চললেন। দু ক্রোশ দূর থেকে নিয়ে এলেন জল। কিন্তু এসে দেখেন মা ও ভাইরা পড়েছেন ঘুমিয়ে। ভীম ভাবলেন, খানিকক্ষণ বরং বিশ্রাম করুন ওরা। তিনি জেগে রইলেন তাঁদের শিয়রে।

এদিকে নিশাচর রাক্ষস হিড়িম্ব মানুষের গন্ধ পেয়ে অস্থির হয়ে উঠল। বোন হিড়িম্বাকে নিয়ে সে উপস্থিত হল সেখানে। কিন্তু কাছে না এসে হিড়িম্বাকে বলল—চারদিন ধরে উপোসী রয়েছি। মানুষের মাংস বেশ মজা করে খাওয়া যাবে আজ। তুই ওদের ছ'জনকে ধরে নিয়ে আয় আমার কাছে।

হিড়িম্বা কিন্তু দূর থেকে ভীমসেনকে দেখেই তাঁর প্রেমে পড়ে গেলেন। আপন মনে বলে উঠলেন—

'এহেন সুন্দর রূপে, নাহি দেখি ইহলোকে,
যক্ষ রক্ষ মনুষ্য ভিতরে।
মোর ভাগ্য হেতু বিধি, মিলাইল হেন নিধি,
স্বামী করি বরিনু ইহারে॥'

তিনি কামরূপা কামিনীর রূপ নিয়ে ভীমসেনের কাছে উপস্থিত হলেন। সলাজ স্বরে প্রেম নিবেদন করলেন আর বললেন ভাই হিড়িম্বের কথা। ভীমকে তিনি তাঁর সঙ্গে পালিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। বললেন—

'আজ্ঞা কর এই ক্ষণে, লৈয়া যাব অন্য স্থানে,
পর্ব্বত কন্দর রম্যবনে।'

ভীম কিন্তু সম্মত হলেন না। বললেন—মা ও ভাইদের ছেড়ে তোর সঙ্গে কোথায় যাব?

এদিকে হিড়িম্বার দেরি দেখে হিড়িম্ব আর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে পারল না। সে এলো সেখানে। আক্রমণ করল ভীমসেনকে। মা ও ভাইরা জেগে উঠলেন। কিন্তু ভাইদের সাহায্য ছাড়াই ভীম হিড়ম্বকে বধ করলেন। ক্রুদ্ধ বৃকোদর তখন হিড়িম্বাকেও মেরে ফেলতে চাইলেন। মা ও ভাইরা বাধা দিলেন তাঁকে। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীম হিড়িম্বাকে বিয়ে করলেন। তার পরে তাঁরা নাকি হিমালয়ের বিভিন্ন রমণীয় বনে মধুচন্দ্রিমা যাপন

করেছিলেন। সেই সব বনের মধ্যে এই মানালী অন্যতমা। মানালীর যে মধুময় স্থানে ভীম ও হিড়িম্বা মধুযামিনী যাপন করেছিলেন, সেখানেই নির্মাণ করা হয়েছে হিড়িম্বা মন্দির। বীর ঘটোৎকচের সেই জন্মভূমিতে আজ উপস্থিত হয়েছি আমরা—আমি ও মানসী।

বেশ বড় কাঠের মন্দির। ৭০।৮০ ফুট উঁচু—চার স্তরের চৌ-চালা মন্দির। ৪৬ ফুট লম্বা ও ২৮ ফুট চওড়া মূল-মন্দির। দেয়ালে অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য। চারিদিকে বহু মূর্তি খোদিত। তবে মন্দির বিগ্রহশূন্য। বিগ্রহ থাকে পুজারীর বাড়িতে। প্রতি মাসের পয়লা তারিখে শোভাযাত্রা সহকারে বিগ্রহ নিয়ে আসা হয় মন্দিরে। ছোট পেতলের বিগ্রহ—ইঞ্চি তিনেক একটি হিড়িম্বা মূর্তি। সেদিন মহা ধুমধাম করে পুজো করা হয়—রাক্ষসী হিড়িম্বা দেবী রূপে মানুষের পুজা পান। পুজো শেষে আবার বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয় পুজারীর বাড়িতে।

৫০।৬০ বছর আগেও কিন্তু এ নিয়ম ছিল না। বিগ্রহ এখানেই থাকত তখন। নিয়মিত পুজো হত। ভক্তদের ভিড়ে মন্দির সব সময় গমগম করত। এককালে কুলু উপত্যকার সবচেয়ে জাগ্রতা দেবী ছিলেন হিড়িম্বা। কুলুর রাজ-পরিবারের আরাধ্যা ছিলেন তিনি। সবাই তাকে হিড়মা বলে অভিহিত করতেন।

তার পরে অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। রাজার রাজত্ব যাবার পরে ধীরে ধীরে ভক্তদের ভিড়ও এসেছে কমে। তাই আজ সে মন্দির এমন মূল্যহীন। পুজারী মন্দিরে বাস করা বন্ধ করে দিয়েছেন। কেউই থাকেন না এই বনমন্দিরে। পাছে অরক্ষিত মন্দির থেকে বিগ্রহ চুরি হয়ে যায়, তাই পুজারী বিগ্রহ নিযে গেছেন বাড়িতে—ভালই করেছেন। যে যুগে যেমন নিয়ম।

হিড়িম্বা মন্দির দর্শন করে ফিরে চলেছি আমরা। চলতে চলতে মানসী বলে, "বীর দম্পতির স্থান নির্বাচনের প্রশংসা করতে হয়—আইডিয়েল হনিমুন স্পট।"

"কেমন করে বুঝলে? অভিজ্ঞতা আছে নাকি?"

"না থাকাই বিচিত্র নয় কি?" মানসী পাল্টা প্রশ্ন করে।

বিপাক বুঝে চুপ করে থাকি।

কিন্তু চুপ করে থাকার পাত্রী নয় মানসী। হঠাৎ আমার একেবারে পাশে এসে প্রশ্ন করে, "বেশ তো জঙ্গল ঘুরিয়ে ভুলিয়ে রাখা হচ্ছে।"

"আমি নিরুপায়, ঘটোৎকচ জনক-জননী যে জঙ্গলের মাঝেই মধুচন্দ্রিমা

যাপন করেছিলেন।"

"তা তো দেখতেই পেলাম। কিন্তু দেখবার পরেও কি সেই পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে হবে, না যে প্রসঙ্গটা কাল রাতে শিকেয় তুলে রেখেছেন…"

"রেখেছেন নয়, রেখেছো।" আমি ওকে শুধরে দিই।

"আন্তরিক দুঃখিত।" মানসী বলে।

"কেবল দুঃখ প্রকাশ করলেই হবে না। অভ্যেস পাল্টাতে হবে।"

"অভ্যেস পাল্টাতে একটু সময় নেবে।"

"তাহলে চাম্বা জেলার শিবতীর্থ মণিমহেশ পথের দুর্গে ঠী প্রসঙ্গটাও শিকে থেকে যথাসময়ে নামানো হবে।"

"ঘাট হয়েছে। এই যে তুমি বলছি। এবারে বলতে শুরু করো।"

পথ চলতে চলতে মণিমহেশ যাত্রার কথা শুরু করি—*

॥ দশ ॥

কাল সকালে মানসী দরজা খোলে নি। সে আমার আমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় ছিল। আর আমি ছিলাম ওর করাঘাতের অপেক্ষায়। শেষ পর্যন্ত প্রতীক্ষা ও অপেক্ষাই সার হয়েছে। মাঝখান থেকে মানসীর অভিমান ভাঙ্গাতে আমাকে হতে হয়েছে নাজেহাল।

আজ তাই ঘুম ভাঙ্গতেই শয্যাত্যাগ করি। বাথরুম সেরে বাইরে বেরিয়ে আসি। মানসীর রুদ্ধদ্বারে মৃদু আঘাত করি।

দ্বার খুলে যায়। সে যেন আমারই আমন্ত্রণের প্রতীক্ষায় ছিল। খুশিভরা স্বরে বলে, "সুপ্রভাত।"

"সুপ্রভাত।" আমি সাড়া দিই।

মানসী বলে, "গুড বয়।"

আমি বলি, "গুড গাল।"

মানসী হাসে। আমি হাসি।

হাসি থামলে মানসী বলে, "ভাল ছেলে ও ভাল মেয়ে কি এবারে চা খেতে যাবে।"

* লেখকের 'হিমতীর্থ-হিমাচল' দ্রষ্টব্য

"গেলে তো ভালই হয়।"

"তাহলে তাই হোক্।"

আমরা বেরিয়ে আসি ট্যুরিস্ট-বাংলো থেকে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলি। তার পরে মানসীকে বলি, "আজ তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি মানালী ছেড়ে?"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে।

"ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। মানালী বড় সুন্দর।"

"সুন্দর যে চিরকাল ক্ষণস্থায়ী। এই যে আমাদের পরিচয়, হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা—এও তো ক্ষণস্থায়ী। একদিন আমাদের দুজনকেও বিদায় নিতে হবে দুজনের কাছ থেকে আর সেদিন তো খুব দূরে নয়। কিন্তু তাতে এই সুন্দর দিন ক'টির সৌন্দর্য ফুরিয়ে যাবে না। এরা চিরসুন্দর হয়ে রইবে আমাদের মনের মণিকোঠায়।"

আমি নির্বাক। মানসীও আর কিছু বলে না। সে নীরবে পথ চলে আমার পাশে পাশে।

কিন্তু বেশিক্ষণ নীরব থাকতে পারি না আমি। আস্তে আস্তে বলি, "তোমার কি এই দিনগুলির কথা মনে থাকবে মানসী?"

"থাকবে।" একবার থামে মানসী। তার পরে হঠাৎ হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই অভিযোগ করে, "কিন্তু আমাকে মানসী বলে ডাকা হচ্ছে কেন? আমি তো অমন করে নাম ধরে ডাকার অধিকার দিই নি।"

"কোন অধিকার কেউ কাউকে দেয় না মানসী। অধিকার অর্জন করতে হয়।"

চা ও জলখাবার খেয়ে কুলি ঠিক করে আমরা ফিরে আসি ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। স্নান করে মালপত্র গুছিয়ে নিই। কুলি এসে যায়। মালপত্র নিয়ে বাসস্ট্যাণ্ডে আসি। টিকেট করে বাসে উঠি। সাড়ে দশটায় বাস ছাড়ে। আমরা বিদায় নিই মানালীর কাছ থেকে। মানসীর মতে সুন্দরী মানালীর কাছে। কারও কারও মতে স্বর্গীয় কুলু উপত্যকার নন্দনকানন থেকে।

আঁকাবাঁকা মসৃণ উৎরাই পথ। পথের দু-ধারে ক্ষেত-খামার, বাড়ি-ঘর আর সবুজ বন। তারপরে পাহাড়ের কালো রেখা। আর বহুদূরে নীল আকাশের গায়ে হিমালয়ের রুপোলী আলপনা।

চারিদিকে নানা রঙয়ের ছড়াছড়ি। এই রঙের জন্যই কুলু উপত্যকা এমন সুন্দর। যাঁরাই এসেছেন এখানে, তাঁরাই কুলুর রঙ দেখে মোহিত হয়েছেন। মেজর ব্রুসের কথা মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন—

"The colouring of the Kulu Valley is almost impossible to express in words. Artists should make it their own······Kulu colour is in a class one, and this richness and brilliance gives a charm and character peculiar to itself."

ব্রুস লিখেছেন ১৯১২ সালের কথা। তারপরে জগতের কতো পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কুলু উপত্যকার সৌন্দর্য আজও অম্লান রয়েছে। কুলু আজও তেমনি রঙীন।

কিছুক্ষণ বাদে বাদে অবশ্য দৃশ্যপট পরিবর্তিত হচ্ছে। কারণ প্রকৃতি পরিবর্তনশীলা। কিন্তু তার মাঝেও কোন পরিবর্তন নেই বিপাশার। সে একই ভাবে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ছুটে। কখনও পাহাড়ের পা ছুঁয়ে, কখনও অরণ্যতটকে সিক্ত করে, কখনও বা গমের শিষে দোলা দিয়ে বিপাশা চলেছে বয়ে।

কুলুর কথা ভাবতে গিয়ে বিপাশার কথা ভাবতে বসেছিলাম। ভাবছিলাম বিপাশার কোন পরিবর্তন নেই। ভুলেই গিয়েছিলাম আমার পাশের মানুষটির কথা। বুঝতে পারছি, তাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত হয় নি আমার। কারণ সেও যে বিপাশারই মতো। কুলু উপত্যকার এই পরিবর্তনশীলা প্রকৃতি যে তারও কোন পরিবর্তন করতে পারে নি। সহসা সে বলে উঠেছে, "আচ্ছা, ছাতরারী থেকে তোমরা তো আবার ফিরে এলে ত্রুর্গেঠী, মণিমহেশের পথে বাস রাস্তার প্রান্তসীমা।"

মানসীর দিকে চোখ ফেরাই। কুলু উপত্যকাকে হারিয়ে ফেলি। মানসীর দু চোখে মৌন জিজ্ঞাসা। আমি উত্তর দিই, "হ্যাঁ।"

"তার পরে?"

"পরদিন সকালে ত্রুর্গেঠী থেকে শুরু হল পদযাত্রা—মণিমহেশ যাত্রা। আমরা ভারমৌর রওনা হলাম।"

"চুপ করলে কেন, বল না সে যাত্রার কথা। আমার তো যাওয়া হবে না কোনদিন।" মানসী বলে।

"কেন হবে না। তেমন কিছু কঠিন নয় সে পথ, দীর্ঘ তো নয়ই। মাত্র দিন পাঁচেকের হাঁটাপথ। চাম্বা ফিরে আসতে আট-নয়দিন সময় লাগে।" আমি বলি।

"তা তো বুঝলাম। কিন্তু আমার পক্ষে তো একা যাওয়া সম্ভব নয়। পথের সাথী পাব কোথায়? আমি যে সাথীহারা।"

"আপত্তি না থাকলে সাথী হতে রাজী আছি।"

"আমিও অরাজী নই কিন্তু· "

"থামলে কেন?" জিজ্ঞেস করি।

মানসী বলে, "কিন্তু তুমিই তো লিখেছ—পথের পরিচয়কে পথেই বিদায় দিতে হয়। পথের প্রীতি নাকি ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় বিষাক্ত হয়ে যায়।"

"যারা ঘরের মানুষ, কথাটা তাদের বেলায় সত্যি। কিন্তু যারা পথের মানুষ, তাদের বেলায় তো একথা খাটে না মানসী!"

"না, না অমন করে বলো না, আমি নিজেকে সামলাতে পারব না। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, আর দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই না।"

মানসীর চোখ দুটি জলে ভরে ওঠে। তাড়াতাড়ি চোখ মোছে সে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে—নিজেকে সামলে নেয়। তার পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বলে, "তার চেয়ে তুমি মণিমহেশের কথা বলো, আমি শুনি। তোমার কাছে হিমালয়ের কথা শুনতে আমার ভারী ভাল লাগে—আমি যে তোমার অনুগত পাঠিকা। সেদিন মানালীতে তোমাকে যখন আবিষ্কার করলাম, তখুনি ঠিক করলাম এ যাত্রায় আর তোমার সঙ্গ ছাড়ছি নে।"

"তাই তো আমি তোমার সঙ্গী হতে চাইছি।"

"আমি তো তোমার সঙ্গেই রয়েছি সখা। কিন্তু একসঙ্গে এই পথ-চলার পালা পাঠানকোটে সাঙ্গ করে দিতে হবে। একে আমি কিছুতেই কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব না। কলকাতা যে বড়ই কঠিন।"

"বেশ তাই হবে।"

"এবারে তাহলে মণিমহেশ যাত্রার কাহিনী শুরু কর।"

একবার বাইরে তাকাই। মসৃণ উৎরাই পথ পেরিয়ে বাস ছুটে চলেছে—চলেছে মানালী থেকে কুলুতে।

"চুপ করে আছো কেন?" মানসী তাগিদ দেয়, "ছাতরারী থেকে শুরু করো।"

"বেশ," আমি বলতে থাকি। মানসী ঠিক হয়ে বসে। আমি বলে চলি—

"মন্দির দর্শন করে ছাতরারী থেকে দুর্গেঠী রওনা হলাম। আবার বৃষ্টি নামল। কিন্তু আমরা থামলাম না। বৃষ্টি মাথায় করেই সেই পিচ্ছিল উৎরাই পথ পেরিয়ে নেমে এলাম নিচে। ছ' ঘণ্টা বাদে ফিরে এলাম দুর্গেঠী বিশ্রাম ভবনে।"

আমাকে চুপ করতে দেখে মানসী বলে ওঠে, "একি থামলে কেন ?"

"ছাতরারীর কথা শেষ হয়ে গেল বলে।"

"তুমি দেখছি বড্ড ফাঁকিবাজ। কিন্তু সংসারে সবাইকে ফাঁকি দেয়া যায় না।" মানসী একবার থামে। তার পরে বলে, "আমি ভুল বলেছিলাম তখন। আমি শুনতে চাই না ছাতরারীর কথা, আমি শুনতে চাইছি দুর্গেঠী, ভারমৌর আর মণিমহেশের কথা।"

অগত্যা শুরু করতে হয় আমাকে—

"পরদিনও খুব ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেল আমার। মুক্ত বাতায়ন দিয়ে বাইরের বিশ্বকে দেখলাম—আধো-আলো, আধো-ছায়ায় ঢাকা মোহময়ী বসুন্ধরা। তবে সে অসীমা নয়। কেবল সামনের পাহাড়টার খানিকটা আর একমুঠো আকাশ নিয়ে তার বিস্তার। তবু আমি অপলক নয়নে চেয়েছিলাম তার দিকে। মুগ্ধ আবেশে দেখছিলাম পাহাড় আর আকাশের রঙ-বদলের পালা। পাহাড়টা ছিল কালো আর আকাশটা ধূসর। পাহাড়টা ধীরে ধীরে ধূসর হচ্ছিল আর আকাশটা সাদা। এতক্ষণ পাহাড়টা যেন কালো পর্দা দিয়ে ঢাকা ছিল। সেই পর্দাখানি কেউ নিয়েছে সরিয়ে। পাহাড়ের বুকে তাই জেগে উঠেছে গিরি-শিরার অচঞ্চল ঢেউ, যেন শব্দহীন সমুদ্রের স্তব্ধ ঊর্মিমালা।

"একটু একটু করে পাহাড়টা সবুজ হল। ঝরণার মালা পরে সে হাসতে হাসতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ভেবেছিলাম আকাশটা নীল হবে, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হল না। সে আমাকে নিরাশ করল—মেঘে ঢাকা আকাশ। অভিমানী মানসীর মতো সে গম্ভীর হয়ে রইল।"

"এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।" মাঝখানে থেকে মানসী বলে ওঠে।

আমি হেসে ফেলি। মানসী আবার বলে, "পাহাড় আর আকাশের কথার মাঝে আমার কথা কেন ?"

"তুমি যে মানসী। শিল্পীর মানসলোকের কল্পনা-সুন্দরী—

'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী !
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে। বসি কবিগণ
সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা।'..."

"তাই তো আমার ওপরে পড়েছে তোমার প্রদীপ্ত বাসনা—অর্ধেক মানবী আমি, অর্ধেক কল্পনা।" আমি থামতেই মানসী বলে ওঠে।

আমি হেসে বলি, "ঠিক তাই।"

"কিন্তু আমি তো বক্তার কল্পনা-সুন্দরীর কথা শুনতে চাই নি। আমি শুনতে চাইছি, দুর্গেঠী থেকে ভারমৌর যাবার কথা।"

আর কথা না বাড়িয়ে আমি আবার বলতে শুরু করি—তবে মণিমহেশ যাত্রা নয়, অন্য কথা। বলি, "দুর্গেঠীতে পথের ডানদিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরণা নেমে এসেছে। মাদ্রাজীবাবা স্নান করছিলেন ঝরণাধারায়। মাদ্রাজীবাবার কথা বলা হয় নি তোমাকে। আগের দিন সন্ধ্যায় দুর্গেঠীর মুদি দোকানে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমাদের। তিনি হিমালয়ের প্রায় তাবৎ তীর্থদর্শন করেছেন। এখন মণিমহেশ দর্শন করে ফিরছেন। তিনি মাদ্রাজীবাবা নামে পরিচিত হলেও সন্ন্যাসী নন, জ্যোতিষী। পাঠানকোটে বাস করেন। ঠিকানা দিয়েছেন। ফেরার পথে তাঁর আস্তানায় যাবার নিমন্ত্রণ করেছেন। যাবে নাকি?"

"না।" মানসী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"কেন?"

"কি হবে হাত দেখিয়ে। আমার ভাগ্য পরিবর্তন করার সাধ্য নেই তোমার মাদ্রাজীবাবার। যাক্ গে, ও সব বাজে কথা রেখে যা বলছিলেন বলুন।"

"এ কি, থামলে কেন?" আমাকে চুপ করতে শুনে চেঁচিয়ে ওঠে মানসী।

"আপনি বললে বলে।" আমি গম্ভীর স্বরে জবাব দিই।

"সে তো তুমি থামার পরে।" মানসী বলে।

"বলবে বুঝতে পেরেই থেমে গেলাম আমি।"

"ইস্, একেবারে অন্তর্যামী। কিন্তু প্রভু! আমি তো তারপরে তুমি বলেছি, তাহলে ভারমৌরের কাহিনী শুরু হচ্ছে না কেন?"

"শুরু হবে না বলে।"

"কারণ?"

"আমরা কুলু উপত্যকার সদর সুলতানপুরে এসে গেছি।" হাসতে হাসতে বলি।

এতক্ষণে বাইরের দিকে নজর পড়ে মানসীর। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে

বলে ওঠে, "আরে তাই তো খেয়ালই যে করি নি।"

"কেমন করে করবে? তুমি তো আর তোমাতে ছিলে না।"

"তা যা বলেছো, আমিও তোমার পাশে পাশে পথ চলছিলাম—চলেছিলাম মণিময়-মণিমহেশের পথে। সত্যি বলছি, বড ভাল লাগছিল শুনতে।" মানসী বলে।

"তাই বলে, এখন আর শুরু করছি না সে পথের কাহিনী। একটু বাদেই বাস থেকে নামতে হবে আমাদের।"

"তাহলে এখন থাক্। বাকিটা পরে শুনব।"

বাস চলেছে শহরের ভেতর দিয়ে। বাঁদিকে বিপাশা, ডানদিকে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট।

শাবরা বাজাবে এসে থামল আমাদের বাস। এটি সুলতানপুরের বড় বাজার। বাস অফিস, বড বড দোকান আর আডত, শিখ গুরুদ্বার, আর্য সমাজ মন্দির ও ধর্মশালা সবই শহরের এই অংশে। কযেকজন যাত্রী নেমে যাবার পরে আবার বাস চলল।

বাজারেব পরে খানিকটা জাযগায জনবসতি সামান্য। তার পরেই একটা পুল পেরিয়ে বাস পৌঁছল শহরের দ্বিতীয অংশে। আবার শুরু হল ঘনবসতি। বাঁদিকে বাসপথের নিচে খাড়া বাজার। চড়াই পথ পেরিয়ে বাস এসে থামল ঢালপুর মযদানে।

মানসীর সঙ্গে বাস থেকে নেমে আসি। মাল-পত্র নামালাম ছাদ থেকে। তার পরে মানসীকে মাল-পত্রের পাহারায রেখে আমি চলি ট্যুরিস্ট অফিসে—আশ্রয়ের সন্ধানে।

আশ্রয পাওযা গেল, কিন্তু মানসীর জন্য আলাদা ঘর পাওযা গেল না। দুজনেই ডরমিটারীতে জাযগা পেলাম। আপত্তি করেছিলাম, কিন্তু ফল হয নি কোন।

ফিরে এসে ভযে ভযে কথাটা বলি, "ছ'খানি খাটিয়া আছে ঘরে। আপাতত আমাদের তিনজন প্রতিবেশী রযেছেন। পরে আরও একজন আসতে পারেন।"

সব শুনে মানসী চুপ করে থাকে।

আমি বলি, "কি করব বল, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু কিছুতেই তোমার জন্য আলদা ঘর পাওয়া গেল না।"

এবারে মানসী মৃদু হেসে বলে, "তাতে কি হয়েছে?"

"না, এতগুলি মানুষের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে।"

"অসুবিধে!" মানসী আবার হাসে। "রুমমেটরা যদি মানুষ হয়, মানসীর কোন অসুবিধে হবে না। মানালীতে দেখো নি, এক ঘর ভিনদেশী ছেলের সঙ্গে কেমন মহানন্দে রাত্রিবাস করেছি?"

কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি নিশ্চিন্ত হই। কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আমরা ট্যুরিস্ট-বাংলোর দিকে পা বাড়াই।

একালের হিমাচল সেকালের পাঞ্জাব-হিমালয়ের একটি অংশ। অবিভক্ত ভারতবর্ষে পাঞ্জাব-হিমালয় ছিল একটি চতুর্ভুজ সদৃশ পার্বত্য অঞ্চল—তিনশ' মাইল দীর্ঘ দেড়শ' মাইল প্রস্থ, সিন্ধু ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ। পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী প্রবাহিত হয়েছে এই অঞ্চলের ভেতর দিয়ে। ২৬,৬২০ ফুট উঁচু নাঙ্গাপর্বতসহ বহু ছোট-বড় পর্বত এই অঞ্চলে অবস্থিত।

ভারত বিভাগের পরে নাঙ্গাপর্বত সমেত পাঞ্জাব-হিমালয়ের একটি অংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অপর অংশটি রয়েছে ভারতে। প্রাক্তন পাঞ্জাব-হিমালয়ের এই ভারতীয় অংশটি এখন হিমাচল বলে পরিচিত। পাঞ্জাব-হিমালয় এখন কেবল টিঁকে আছে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে। ভারতের পাঞ্জাব এখন হিমালয়হীন।

চিরতুষারাবৃত শৃঙ্গমালা আর চিরসবুজ অরণ্য, সঙ্গীতময়ী স্রোতস্বিনী আর রমণীয় হ্রদ, অনিন্দ্যসুন্দর উপত্যকা আর কোমল তৃণভূমি নিয়ে হিমাচল। বহু বিখ্যাত শৈলাবাস রয়েছে হিমাচল প্রদেশে—শিমলা, সোলন, চেইল, নারকাণ্ডা, কুফরি, ডালহাউসী, খাজিয়ার, কসৌলী, মানালী, নাগর ও যোগিন্দর নগর প্রভৃতি। রয়েছে রেণুকা, রেওয়ালসার, গোবিন্দসাগর, ধরমশালা ও মণিমহেশের ডাল হ্রদ। রয়েছে কাংড়া, কুলু, লাহুল, স্পিতি, পার্বতী, চাম্বা, পাঙ্গী ও ভারমৌরের মতো আরও অনেক বিখ্যাত উপত্যকা।

উপত্যকার মধ্যে সবার ওপরে কুলুর স্থান। সেকালের রাজধানী সুলতানপুর, একালের সদর। এখানে আসার চারটি পথ। একটি পাঠানকোট থেকে ছোট রেলগাড়িতে যোগিন্দর নগর এসে, সেখান থেকে বাসে। এই পথে আমরা পাঠানকোট ফিরে যাব। আর একটি পাঠানকোট থেকে সোজা বাসে। এই পথে আমি সুজয়াদের সঙ্গে কুলু হয়ে মানালী চলে গিয়েছিলাম। মানসীও এই পথেই মানালী গিয়েছে। তৃতীয়টি কুলুতে এসেছে শিমলা থেকে। আর চতুর্থটি চণ্ডীগড় হয়ে। কলকাতা থেকে কুলু-মানালী আসার এইটেই সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ। ইদানীং অবশ্য বিমানে করেও কুলু

আসা যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে দিল্লী-চণ্ডীগড় ও কুলুর মধ্যে দৈনিক বিমান চলাচল করে। সুলতানপুর থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে ভুন্টাবে বিমানক্ষেত্র আছে।

সুলতানপুর এখন কুলু শহর নামেই পরিচিত। শহরের আয়তন চার বর্গমাইল, উচ্চতা ৪২০০ ফুট। এখানে বেড়াতে আসার সময় এপ্রিল থেকে জুন ও সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। এই সময়ের তাপমাত্রা ৬৪° থেকে ৮৫° ফারেনহিট।

গাছে ছাওয়া তৃণাচ্ছাদিত ঢালপুর ময়দান। এই সুবিস্তৃত সবুজ প্রান্তর কুলু শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। বিশ্বাস করা কঠিন যে এটি মানুষের তৈরি নয়, প্রকৃতির অবদান।

ঢালপুর ময়দানের একপ্রান্তে এসে থেমেছিল আমাদের বাস—মানালী থেকে মাণ্ডী যাবার বাস। বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই রাজ্য সরকারের ট্যুরিস্ট অফিস। এই ময়দানের চারিদিকেই অন্যান্য সরকারী দপ্তর।

মানালী মাণ্ডী মূল পথটি ময়দানের ভেতর দিয়ে চলে গেছে। সেই পথ থেকে চারিদিকে ছোট ছোট কয়েকটি পথ প্রসারিত হয়েছে ময়দানের বুক চিরে। তারই একটি পথ দিয়ে আমি ও মানসা চলেছি হেঁটে। চলেছি ট্যুরিস্ট-বাংলোয়। এখানে কোন হোটেল নেই কিন্তু আছে সিভিল ও ফরেস্ট রেস্ট হাউস। আছে ডাকবাংলো, ট্যুরিস্ট-হাটস ও ট্যুরিস্ট-বাংলো ক্লাস টু—যেখানে চলেছি আমরা। এই সব পর্যটক নিবাসের ভাড়া সামান্য। কিন্তু আগের থেকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা না করে রাখলে ঠাঁই পাওয়া কঠিন। কুলু ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় শৈলাবাস-সমূহের অন্যতম।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা জগৎ সিং নাগর থেকে এখানে রাজধানী নিয়ে আসেন। তার পরেই গড়ে ওঠে এই শহর। বহুকাল থেকেই কুলু পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যাণ্ড তার প্রথম হিমালয় ভ্রমণকালে লাহুলের পথে কুলু এসেছিলেন।

১৮৬৯ সালে এ উপত্যকার ওপরে প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন ক্যাপ্টেন এ. এফ. পি. হারকোর্ট। বইখানির নাম—'The Himalayan Districts of Kooloo, Lahoul and Spiti.' এই বইখানি থেকে সেকালের কুলু সম্পর্কে অনেক খবর পাওয়া যায়।

এম. সি. ফরবেস নামে জনৈক ইংরেজ ১৯১০ সালে শিমলা থেকে কুলু আসেন। তখনও কুলু পর্যটকদের স্বর্গ। ফরবেসের ভাষায়—'For an artist, whether with brush or camera, Kulu is indeed a

paradise—the villages, with their dark wide-roofed houses and carved temples under huge trees are most picturesque, the people are often extremely good-looking with their wealth of barbaric jewellery ·······in spite of flat faces and small eyes.

'In the rains flowers of Kulu must be marvellous··· · even as the winter draws on, from the hill top to valley some blossoms linger···' তাই শীতেও কেউ বলতে পারে না, শরৎ বিদায় নিয়েছে কুলু উপত্যকা থেকে। আর একথা সেদিনের মতো আজও সমান সত্য।

শ্যামল কোমল ময়দানের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি ট্যুরিস্ট-বাংলোর পথে।। এ পথটি মূল বাসপথ থেকে ডাইনে প্রসারিত হয়ে কিছুটা ওপরে উঠে গেছে। বাড়ি-ঘর সবই প্রায় ময়দানের প্রান্তে। কাজেই পথের ধারে দু-একটি সরকারী ভবন ছাড়া কোন লোকালয় নেই। মাঠ ও পথ প্রায় জনহীন। অথচ বছরের বিশেষ একটা সময়ে জনাকীর্ণ হয়ে ওঠে এই ময়দান। দশেরার সময় দশদিন ব্যাপী মস্ত মেলা বসে এখানে। সেটি কুলু উপত্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। সেই কথাই ভাবছিলাম মনে মনে। ভাবতে ভাবতে পথ চলেছিলাম।

আশ্চর্য! মানসী কি সত্যই মানসী? নইলে সে আমার মনের খবর পেল কেমন করে? চলতে চলতে জিজ্ঞেস করে, "এই ময়দানেই কি দশেরার মেলা হয়?"

"হ্যাঁ।" বিস্মিত স্বরে উত্তর দিই। "বছরে দুবার মেলা বসে এখানে। তবে দশেরার মেলাই দেখার মতো।"

"বেশ বড় মেলা বুঝি?"

"হ্যাঁ। ভারতের খুব কম জায়গাতেই দশেরা উপলক্ষে অতো বড় মেলা হয়। সারা শহর তখন উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। এটি হিমাচলের শ্রেষ্ঠ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্মেলন।

"কুলু উপত্যকা কেবল রমণীয় নয়, সে বরণীয়ও বটে—সে দেবভূমি। উপত্যকার প্রায় প্রত্যেক বড় বড় গ্রামের নিজস্ব দেবতা আছেন।

"এঁরাই দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক। প্রতিনিধি মারফৎ দেবতারা সম্পত্তি রক্ষা করেন। এক দেবতা আরেক দেবতার সম্পত্তি বে-দখল

করলে আদালতে মামলা শুরু হয়। নিজ নিজ প্রতিনিধির সাহায্যে তাঁরা মামলা চালান। দেবতারা মানুষ জজের রায় মেনে নেন। অনেক সময় জেল পর্যন্ত খাটেন।

"কুলুর দেবতারা মোটেই অসামাজিক নন। তাঁরা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেন। এক দেবতা আরেক দেবতার বাড়ি দেখা করতে এলে, সে দেবতাও সুবিধা মতো তাঁর বাড়িতে বেড়াতে আসেন। তাই কুলুর পথে প্রায়ই দেখা যাবে সুসজ্জিত বিগ্রহকে কাণ্ডিতে বসিয়ে, পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পেছনে চলেছে ভক্ত ও বাজনদারের দল।

"রঘুনাথজী হচ্ছেন সবার ওপরে। তাই দশেরার সময় উপত্যকার অন্যান্য দেব-দেবীরা রঘুনাথজীর আতিথ্য গ্রহণ করতে এখানে আসেন। শোভাযাত্রা সহকারে তাঁদের নিয়ে আসা হয় এখানে। তাঁরা সবাই ঢালপুর ময়দানে আশ্রয় নেন। প্রত্যেক দেব-দেবীর জন্য পৃথক পৃথক তাঁবুর ব্যবস্থা করা হয়।

"উৎসবের প্রথম দিন মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পুষ্পসজ্জিত রথে রঘুনাথজীর সোনার বিগ্রহ স্থাপন করেন। গান-বাজনা ও জয়ধ্বনির সঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে অন্যান্য দেবতারাও একে একে উপস্থিত হন সেখানে। দেব-সভা শুরু হয়।

"রাজপরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নেতৃত্বে গণ্যমান্যরা তিনবার দেবসভা প্রদক্ষিণ করেন। তার পরে রঘুনাথজীর যাত্রা শুরু হয়। গান-বাজনা ও জয়ধ্বনি চলতে থাকে। অন্যান্য দেবতারা রঘুনাথজীকে অনুসরণ করেন।

"তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে রঘুনাথজীর রথ এসে থামে ঢালপুর ময়দানে—উৎসব প্রাঙ্গণে। উৎসব শুরু হয়—নাচ-গান, কেনা-বেচা, আলো আর হাসিতে ভরে ওঠে এই ময়দান। সে হাসির ছোঁওয়া লাগে সারা শহরে, সারা জেলায়, সারা হিমাচলে।

"সমাপ্তি উৎসবের দিন তেমনি শোভাযাত্রা সহকারে রঘুনাথজীর রথ নিয়ে যাওয়া হয় ময়দানের শেষপ্রান্তে—বনের ধারে, বিপাশার তীরে। অন্যান্য দেবতারাও উপস্থিত হন সেখানে। মহাসমারোহে মোষ বলি দেওয়া হয়। তার পরে বনের কোন শুকনো গাছে আগুন লাগানো হয়। অর্থাৎ রাবণ বধের পরে রাবণের চিতায় আগুন দেয়া হয়। আর সেই সঙ্গে শেষ হয় উৎসব—শেষ হয় মেলা।"

"আর শেষ হল আমাদের পথ চলা। আমরা পৌঁছে গেছি ট্যুরিস্ট-

বাংলোয়।" আমি থামতেই বলে ওঠে মানসী।

আশ্রয় পেতে দেরি হল না। রিজার্ভেশান স্লিপ দেখাতেই বেয়ারা আমাদের নিয়ে আসে নির্দিষ্ট ডরমিটারীতে। বেশ বড় একখানি ঘর। আলমারি, আলনা, ড্রেসিং-টেবিল, চেয়ার—সবই আছে। আছে লাগোয়া বাথরুম আর ছ'খানি খাটিয়া। দু-সারিতে সাজানো। আমাদের রুম-মেটরা রয়েছেন ঘরে। তাঁরা তিনজন—স্বামী স্ত্রী ও মা। ভদ্রলোক আমাদের মাল-পত্র গোছাতে সাহায্য করলেন।

আমাদের পেয়ে তাঁরা খুশি হলেন। কিন্তু আমরা খুশি হতে পারলাম না। ওঁরা বাঙ্গালী। আমার সঙ্গে মানসী। মহা মুশকিলে পড়া গেল।

ট্যুরিস্ট-অফিসারকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল রুম-মেটদের নাম। তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, তাঁরা বাঙ্গালী। তখন হয়তো বলে কয়ে অন্য কোন ঘরে একটা ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু এখন যে নিরুপায়।

মানসী কিন্তু নির্বিকার। সে মালপত্র গুছিয়ে, খাটিয়া ঝেড়ে বিছানা পাতে। তার পরে বাথরুমে চলে যায়। ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করেন। কথা বলতে বাধ্য হই। ভয়ে ভয়ে জবাব দিই। আর ভাবি—কি বোকামিটাই না করেছি! প্রায় এক মাইল পথ হেঁটে এলাম মানসীর সঙ্গে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কি বলা হবে, অন্তত ঠিক করে নেওয়া উচিত ছিল। তা নয়, সারা পথে কেবল কুলুর কথা বলেছি। এদিকে যে মান-সম্মান সব যায়। আমি যা বলছি, সে যদি ঠিক ঠিক তা না বলে—তবেই হয়েছে। বাথরুম থেকে বেরুলেই তাকে নিয়ে বাইরে চলে যেতে হবে।

কেবল আমার কথা জিজ্ঞেস করেই ক্ষান্ত হন না ভদ্রলোক। নিজের কথাও বলেন—তাঁর নাম নির্মল সাহা, স্ত্রীর নাম শ্যামলী। আসানসোলে থাকেন—রেল কর্মচারী। পুজোর ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছেন। ধর্মশালা, কাংড়া, জ্বালামুখী ও বৈজনাথ দেখে পরশু বিকেলে এখানে এসেছেন। আরও তিন দিন থাকবেন। এখান থেকে মানালী যাবেন।

মানসী বেরিয়ে আসে বাথরুম থেকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াই আমি। বলি, "চল, খেয়ে আসা যাক্।"

"যাচ্ছি।" ভেজা জামা-কাপড় মেলে দিতে সে বাইরে চলে যায়। একটু বাদে ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, "তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন, যাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও। বাথরুমে সাবান ও তোয়ালে রেখে এসেছি।"

ওকে এদের সামনে একা রেখে বাথরুমে যাওয়া কোনমতেই উচিত নয়। নির্মলবাবুর মা ও স্ত্রী ওর সঙ্গে আলাপ অর্থাৎ ওকে জেরা করার জন্য তৈরি হয়ে বসে আছেন। আমি আড়ালে গেলেই প্রশ্নবান নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করবেন। তাই বলি, "আমি ডাইনিং হলেই হাত ধুয়ে নেব।"

"হ্যাঁ, তা না হলে আর নোংরামি হবে কেমন করে?"

মানসীর কথা ও কণ্ঠস্বরে ওরা সবাই হেসে ওঠেন। মানসী শ্যামলীকে বলে, "সত্যি বলছি ভাই, একদম জলের কাছে যাবে না।"

শ্যামলী এবার জোরে জোরে হাসতে থাকে। মানসী প্রসাধন শুরু করে। আমি ক্ষুণ্ণ মনে বাথরুমে প্রবেশ করি।

কোনমতে চোখে মুখে জল দিয়ে হাত ধুয়ে বেরিয়ে আসি। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। নির্মলবাবুর মা মানসীকে জেরা করছেন, "তোমাদের বিয়ে হয়েছে?"

আমার বুক কেঁপে ওঠে। ভয়ে ভয়ে মানসীর মুখের দিকে তাকাই। আশ্চর্য। মানসী হাসছে—সলাজ হাসি।

সে একবার শ্যামলীর দিকে তাকায়। বোধহয় তার মনোভাবটা বুঝতে চায়। তার পরে নির্মলবাবুর মায়ের দিকে চেয়ে লাজনম্র স্বরে বলে, "হ্যাঁ মা। তিন বছর "

"আমিও তো তাই ভাবি, নইলে কি আর এমন করে তোমরা একসঙ্গে থাকতে পারো। কিন্তু " মা থামেন।

আমি চমকে উঠি—কি বলতে চাইছেন তিনি?

মা বলেন, 'কিন্তু তোমার হাতে নোয়া নেই, সিঁথিতে সিঁদুর নেই?"

সর্বনাশ! একেবারে মূল ধরে নাড়া দিয়েছেন। এমন প্রশ্ন যে হতে পারে, মোটেই ভাবি নি। অথচ ভাবা উচিত ছিল। খুবই স্বাভাবিক প্রশ্ন। কিন্তু এখন কি বলবে মানসী—আমরা যে ধরা পড়ে গেছি।

অসহায় দৃষ্টিতে মানসীর দিকে তাকাই। আশ্চর্য! মানসী এখনও হাসছে।

তেমনি ধীর স্বরেই সে বলে, "আমাদের যে ও-সব পরতে নেই মা।"

"কেন?" বৃদ্ধা বিস্মিতা।

বিস্মিত আমিও। কি বলতে চাইছে মানসী?

'আমরা যে হিন্দু নই।" মানসী বলে।

"হিন্দু নও?" বৃদ্ধা বিচলিতা।

"না।" মানসী বলে, "আমরা খৃষ্টান।" সে বুকের ওপরে ক্রুশ আঁকে।

চমৎকার! আনন্দে আমার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার উপায় নেই। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিই।

কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠেন মা, "খেরেস্তান..."

"হ্যাঁ, মা।" মানসী শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"বৌমা!" শাশুড়ী পুত্রবধূকে বলেন, "জলের কুঁজোটা পথ থেকে সরিয়ে আমার খাটের পেছনে রেখে দাও তো।" তিনি শুয়ে পড়েন।

ছেলে ও বউ লজ্জা পান। কিন্তু লজ্জা পাই না আমি। জাত খুইয়ে মান রেখেছে মানসী।

॥ এগারো ॥

খেয়ে নিয়ে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে বেরিয়ে পড়ি আমরা। নির্মলবাবুরা ঘরেই রয়েছেন। গতকাল ওরা মণিকরণ গিয়েছিলেন, আগামীকাল নাগর যাবেন। তাই আজ বিশ্রাম করছেন। ওরা যে স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে এসেছেন।

বারান্দা পেরিয়ে ডাইনিং হলে আসি। আরও অনেকে এসে গেছেন। চায়ের ফরমাশ করে আমরা চেয়ারে বসি। এটি ট্যুরিস্ট-বাংলোর কো-অপারেটিভ ক্যান্টিন। দাম একটু বেশি হলেও খাবার ভাল। তা ছাড়া সুবিধাও অনেক। এখান থেকে বাজার প্রায় এক মাইল। অতদূরে গিয়ে খেয়ে আসা কষ্টকর। আজ দুপুরেও এখানেই খেয়েছি আমরা।

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে পড়ি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "কোথায় যাবে?"

"সুলতানপুর রাজপ্রাসাদ আর রঘুনাথজীর মন্দিরে।"

"বিজলী-মহাদেবের মন্দিরে যাবো না? অনেকের মতে সেই মন্দিরের লিঙ্গমূর্তি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। তাঁরা বিজলী-মহাদেবকে বলেন—বৈদ্যনাথ।"

"যাবো বৈ কি। শুনেছি সে মন্দিরের শিল্পকলা ও ষাট ফুট উঁচু দণ্ডটি দেখার মতো। তবে মন্দিরটি একটু দূরে—বিপাশার ওপারে, ঐ পাহাড়ের ওপরে।, তাই আজ নয়, কাল আমরা যাবো বিজলী-মহাদেবের মন্দিরে।"

"বেশ তাই হবে।" কিন্তু মানসী বলে, "মন্দিরটির এমন একটা বিচিত্র নাম হল কেন?"

"শুনেছি প্রতি বছর বর্ষাকালে অন্তত একদিন নাকি বজ্রপাত হয় মন্দিরে আর তাতে শিবলিঙ্গটি যায় ভেঙ্গে। বৃষ্টি বন্ধ হবার পরে সেই ভাঙ্গা শিবলিঙ্গকে জোড়া দিয়ে মহাসমারোহে বিজলী-মহাদেবের পুজো করা হয়।"

"ভারী অদ্ভুত তো।" মানসী মন্তব্য করে, "প্রতি বছর বজ্রপাত হয় মন্দিরের ওপরে, তাতে মন্দিরের কিছু হয় না, কেবল শিবলিঙ্গটি ভেঙ্গে যায়। কথাটা যেন কেমন ঠেকছে।"

হেসে বলি, "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।"

মানসীও হাসে। হেসে বলে, "বেশ, বিশ্বাস করলাম।"

"কাকে? বিজলী-মহাদেবকে না আমাকে?"

"দুজনকেই।" মানসী গম্ভীর স্বরে জবাব দেয়।

আমি আর কথা না বলে নীরবে পথ চলতে থাকি। ভাবি—মানসী কি সত্যি বিশ্বাস করে আমাকে?

কিছুক্ষণ বাদে মানসী জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা তখন তো কেবল কুলুর দশেরা মেলার কথাই বললে। হিমাচলে আর কোথাও বড় মেলা বসে না?"

"বসে বৈ কি।" আমি উত্তর দিই, "মেলার জন্য বিখ্যাত হিমাচল। প্রত্যেক বড় শহর ও তীর্থস্থানেই মেলা বসে। এই সব মেলার মধ্যে চাম্বার মিনজার এবং রামপুরের রেণুকা ও লাবির মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাম্বার মেলা বসে অ্যাগস্ট-সেপ্টেম্বরে আর রামপুরে নভেম্বর মাসে।"

আমি থামতেই প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে মানসী। জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা এখানে বন্য জন্তু-টন্তু মানে, ভালুক-টালুক নেই।"

হেসে বলি, "এখানে ভালুক থাকবে কেমন করে, এটা যে শহর—এখানে মানুষেরই জায়গা হচ্ছে না ঠিকমত। তবে বন-সম্পদের মতো পশু-সম্পদেও সমৃদ্ধ হিমাচল। অসংখ্য জাতের পাখি আর হরিণ, বিভিন্ন ধরনের বাঘ, ভালুক, শুয়োর, ছাগল ইত্যাদি আছে এ প্রদেশে। লাল ভালুক এখনও দেখতে পাওয়া যায় হিমাচলে। এ ছাড়া মৎস্য শিকারের আদর্শ ক্ষেত্র হিমাচল। বিপাশা ও উল নদীর ট্রাউট ও যমুনার মহাশোল ভারতবিখ্যাত।"

আমরা বাসস্ট্যাণ্ডে পৌঁছলাম। বাজার ছাড়িয়ে এগিয়ে চললাম। বাসপথ থেকে একটি সংকীর্ণ চড়াই পথ ধরতে হল। অনেকটা চড়াই পেরিয়ে

একটি জলধারা—শর্বরী ঝরণা। তার পরে পথের প্রান্তে মন্দির—রঘুনাথজীর মন্দির। অবস্থানটি মোটেই ভাল নয়। শহরের ঘন বসতির মধ্যে অবস্থিত। অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে জরাজীর্ণ প্রাসাদ।

আমরা প্রাসাদের সামনে আসি। রাজা জগৎ সিং নাগর থেকে রাজধানী নিয়ে এসেছিলেন এখানে। কিন্তু জগৎ সিং নির্মিত সে প্রাসাদ ভূমিকম্পে ভেঙে গেছে। তারপরে তৈরি হয়েছে এই প্রাসাদ। তাও আজ ভগ্নপ্রায়।

কাঠ আর পাথরে নির্মিত—দুটি মহলে বিভক্ত। প্রাসাদতোরণের ছাদে ও গায়ে কাঠের ওপরে কোথাও কোথাও সুন্দর কারুকার্য। তবে অধিকাংশই আগুনে নষ্ট হয়ে গেছে। কিছুকাল আগে একবার আগুন লেগেছিল এই প্রাসাদে।

ভেতরে ঢুকতে গিয়ে বাধা পেলাম। দারোয়ান মানসীকে দেখিয়ে আমাকে বলে, "মাঈজী যেতে পারেন, কিন্তু আপনার প্রবেশ নিষেধ। ভেতরে মেয়েরা রয়েছেন।"

আমি মানসীকে বলি, "তাহলে তুমি বরং গিয়ে দেখে এসো ভেতরটা। আমি এখানেই দাঁড়াচ্ছি।"

"আচ্ছা, তুমি আমাকে কি ভাবো বল তো?"

সংগতিহীন প্রশ্নে বিস্মিত হই। তাহলেও হেসে বলি, "কি আবার ভাবি, ভাবি মানসী—অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা।"

"না, না, ঠাট্টা নয়।" মানসী গম্ভীর স্বরে বলে, "আমি আশ্চর্য হচ্ছি, তুমি আমাকে এতটা স্বার্থপর ভাবলে কেমন করে?"

"স্বার্থপর? তোমাকে?" আমি ওর অভিযোগের কারণ বুঝতে পারি না।

"তাছাড়া কি? একসঙ্গে এসেছি, তুমি ঢুকতে পারবে না ভেতরে আর আমি একা গিয়ে দেখে আসব!"

হেসে বলি, "তোমাকে স্বার্থপর ভেবে ভেতরে যেতে বলি নি, আমি স্বার্থপর বলেই তোমাকে দেখে আসতে বলেছি।"

"মানে?"

"তুমি গিয়ে দেখে এলে আমি জানতে পারব ভেতরের কথা—লিখতে পারব প্রাসাদের বর্ণনা।"

এতক্ষণে মানসীর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু সে সম্মত হয় না আমার

প্রস্তাবে। একটু হেসে বলে, "আমি ছেলেমানুষ নই যে এই সব বাজে কথা বলে ভোলাবে। তোমার লেখার রসদ যোগাড় করার জন্য অমন স্বার্থপর হতে পারব না আমি। দরকার নেই তোমার সুলতানপুর প্রাসাদের অন্দরমহলের কথা লিখে। এবারে চলো, ফিরে যাওয়া যাক্।" মানসী ফিরে চলে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

খানিকটা পথ নীরবে পার হয়ে আসি। তার পরে মানসী বলে, "অবস্থা দেখে মনে হল, বর্তমান রাজাদের রাজপ্রাসাদ রক্ষণাবেক্ষণের সামর্থ্য পর্যন্ত নেই। অথচ শুনেছি এদের নাকি রূপার খনি আছে।"

"আছে নয়, ছিল। পার্বতী উপত্যকায় অর্থাৎ মণিকরণের কাছে।" উত্তর দিই।

"এখন বুঝি নেই?" মানসী প্রশ্ন করে।

'জায়গাটা যাবে কোথায়, জায়গাটা আছে। আগে বলত ওয়াজিরী রূপি এখন শুধু রূপি নামেই পরিচিত। মণিকরণ ছাড়িয়ে পার্বতী নদীর তীর ধরে খানিকটা উঠে গেলে ধর্মগঙ্গা ও পার্বতীর সঙ্গম। সঙ্গম পেরিয়ে মণিকরণ অঞ্চলের শেষ উষ্ণকুণ্ড। মূল-মণিকরণ থেকে প্রায় এক মাইল। পুণ্যার্থীদের ধারণা গঙ্গা পার্বতী নামে প্রবাহিতা এই পুণ্যতীর্থে। নিকটবর্তী ক্ষীরগঙ্গার তীরে হর-পার্বতী তপস্যা করেছেন। কুলু উপত্যকার দেবতারা অনেকেই মণিকরণ যাত্রায় যান। পাণ্ডবদের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত পার্বতী উপত্যকা। পাণ্ডবরা নাকি পার্বতীর ওপরে একটি পুল তৈরি করেছিলেন। তাঁরা ধানের চাষ করেছিলেন এ উপত্যকায়। আজও সেই ক্ষেতে ধান হয়।

"পার্বতী উপত্যকার রুদ্রনাগ গ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে ব্রহ্মগঙ্গা। ব্রহ্মগঙ্গা এসেছে হরেন্দ্র পর্বতের ব্রহ্মা-সরোবর থেকে। সেই সরোবরের তীরে ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন। ব্রহ্মগঙ্গা থেকে আধ মাইল এগিয়ে অগ্নিতীর্থ। সেখানেও বহু ছোট ছোট উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে।

"পার্বতী উপত্যকা এ অঞ্চলের সুন্দরতম উপত্যকাগুলির অন্যতম। বেশ ঘন বসতি—অসংখ্য ছোট বড গ্রাম গড়ে উঠেছে পার্বতী উপত্যকায়।..."

"এই তোমার এক দোষ।" মানসী বাধা দেয়, "কানের কথা জানতে চাইলে, ধানের কথা বলতে শুরু করো। জানতে চাইলেম রূপির কথা, তুমি আরম্ভ করলে পার্বতী উপত্যকার বিবরণ। পরন্তু যখন মণিকরণ যাচ্ছি, সে উপত্যকা তো চর্মচক্ষেই দেখে আসব।"

"বেশ, বলছি।" আমি হেসে দিই। "মণিকরণের শেষ উষ্ণকুণ্ড ছাড়িয়ে

ওপরে উঠে গেলে রসকুণ্ড নামে একটি অনিন্দ্যসুন্দরী ঝরণা আছে। অনেক উঁচু থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে নিচে। দূর থেকে মনে হয়, স্বর্গধারা এসেছে মর্ত্যলোকে। কেবল দেখতেই সুন্দর নয়, বড়ই মিঠে এই ঝরণার জল।

"ঝরণার কাছে একটি ছোট গ্রাম রসকুণ্ড। এই গ্রামের অনতিদূরেই সেই রূপার খনি। কুলুর রাজাদের সম্পত্তি ছিল এটি। তবে শোয়াশ' বছরের বেশি হল এখান থেকে রূপা উত্তোলন করা হয় নি।"

"কেন?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"বিশেষজ্ঞরা বলেন, রূপার পরিমাণ বড়ই কম অথচ পরিবহনের ব্যয় অত্যন্ত বেশি। খরচ পোষাবে না।"

"শোয়াশ' বছর আগে কেমন করে পোষাতো?"

"তখন পরিবহনের ব্যয় কম ছিল।" আমি বলি।

"তেমনি রূপার দামও কম ছিল।" মানসী বলে।

"অনেকের ধারণা সেকালের বিশেষজ্ঞরা আকরিক রুপো থেকে রুপো নিষ্কাশনের একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি জানতেন। যার ফলে তখন পুষিয়ে যেত।"

"আমরা এখন সে পদ্ধতি অনুসরণ করছি না কেন? বিজ্ঞান তো কতো উন্নত হল।"

"সেটাই আশ্চর্যের। তবে এ সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।"

"তা সে কথাটি না বলে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন?"

নাঃ, একে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি। এমন মাস্টারী করতে হবে জানলে……কি আর করতাম? বাধ্য হয়ে বলতে থাকি, "সিধ সিং প্রতিষ্ঠিত বাদানী রাজবংশের শেষ রাজা জিৎ সিং। তিনি ১৮০৭ থেকে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কুলুর রাজা ছিলেন। কথিত আছে হুকুম্ ও গোহন নামে তাঁর দুজন মন্ত্রী ছিলেন। এরাই রুপি খনির কাজ দেখাশোনা করতেন। তাঁদের কাছেই ছিল রুপো নিষ্কাশনের সেই গোপন সূত্র আর রাজবংশের ইতিহাস। কুচক্রীদের প্ররোচনায় রাজা তাঁদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি নাগরে চলে গেলেন এবং তাঁদের দুজনকে ডেকে পাঠালেন সেখানে।

"হুকুম্ ও গোহন জানতে পারলেন রাজা তাঁদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং হয়তো বা রাজরোষে তাঁদের প্রাণ যাবে। তবু তাঁরা এলেন নাগরে। না এসে উপায় নেই। রাজার আদেশ অমান্য করে বেঁচে থাকা যায় না। তবে তাঁরা নাগর রওনা হবার আগে রুপো নিষ্কাশনের গোপন সূত্র এবং

রাজপরিবারের ইতিহাস তাঁদের স্ত্রীদের কাছে দিয়ে বললেন—আমরা যদি ফিরে না আসি অর্থাৎ রাজা যদি আমাদের হত্যা করেন, তাহলে এগুলো পুড়িয়ে ফেলো।

"রাজার সঙ্গে দেখা করতেই রাজা তাঁদের বললেন তাঁর অভিযোগের কথা। তাঁরা অস্বীকার করলেন। রাজা বললেন—তোমরা বিশ্বাসঘাতক, তোমরা মিথ্যেবাদী, আমি তোমাদের হত্যা করব।

"তাঁরা বললেন—তাতে আপনার কোন লাভ হবে না মহারাজ, বরং লোকসান হবে। আমাদের মেরে ফেললে, রুপির খনি ও রাজপরিবারের ইতিহাসকেও হারিয়ে ফেলতে হবে।

"ক্ষিপ্ত রাজা জিৎ সিং তবু নৃশংসভাবে হত্যা করলেন হুকুম্ ও গোহনকে। তার পরে তিনি নিজে ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন রুপি।

"কিন্তু কথাটা আগেই গিয়েছিল রটে। রাজা রুপিতে পৌছবার পূর্বেই ভস্মীভূত হল রুপো নিষ্কাশনের সূত্র আর বাদানী রাজবংশের ইতিহাস।"

গল্প করতে করতে আমরা এসে পৌছই রঘুনাথজীর মন্দিরের সামনে—কুলু উপত্যকার সর্বশ্রেষ্ঠ দেবালয়ে। প্রাচীন প্রাসাদের মতো জীর্ণ না হলেও এ মন্দিরও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ভূমিকম্পে। আগে ছাদের ভেতর-দিকে লাল নীল ও সোনালী রঙের চিত্র অঙ্কিত ছিল, এখন তার সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ভূমিকম্পের করাল স্পর্শ লেগে আছে মন্দিরের সর্বত্র। মহাকালের ছায়া নেমেছে তার সারা অঙ্গে।

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করি। সামনেই উঠান। তার পরে মন্দির। রুপোর সিংহাসনে রেশমের গদির ওপরে লাল ও হলুদ রঙের পোশাক পরে বসে আছেন রঘুনাথজী। ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ মণি-মুক্তা খচিত সোনার রামচন্দ্র মূর্তি। পাশেই একখানি ছোট সিংহাসনে নরসিংহ—দেহহীন, কেবল পাথরের মুখ। আর রঘুনাথজীর সামনে লাল পোশাক পরে হাতজোড় করে বসে আছেন রামভক্ত হনুমান।

শুনেছি রঘুনাথজীর মূর্তির ওজন ৬৬ তোলা এবং তা খাঁটি সোনা নয়। অষ্ট-ধাতুর ওপরে সোনার পাতে মোড়া। দেখে মনে হচ্ছে অনুজ্জ্বল সোনালী রঙের মূর্তি। কিন্তু পুরোহিতরা বলেন, এ মূর্তির প্রকৃত রঙ লাল, তবে দিব্যদৃষ্টি না থাকলে সে রঙ দর্শন করা যায় না। তাঁরা বলেন, রঘুনাথজী খুশি থাকলে মূর্তির রঙ হয় সাদা আর রেগে গেলে হয়ে যায় কালো। এ রকম পরিবর্তন নাকি প্রায়ই হয়।

একজন পুরোহিত সামনে বসে মন্ত্র পড়ছেন। মানসী ফুলের মালা ও মিষ্টি তাঁর হাতে দিল। তিনি পুষ্পমাল্য নিবেদন করলেন শ্রীরামচন্দ্রকে। আশীর্বাদ ও প্রসাদ বিতরণ করলেন আমাদের।

মানসীর প্রশ্নের উত্তরে জনৈক পূজারী জানালেন, "একটু বাদেই আরতি আরম্ভ হবে।"

মানসী আমার মুখের দিকে তাকায়।

হেসে বলি, "আমি আপত্তি করব কেন? মন্দিরে এসেছি, আরতি দেখে যাবে। এ তো ভাল কথা।"

"তাহলে চলো ওখানটায় গিয়ে বসা যাক।"

বাংলা না জানলেও পূজারী বুঝতে পারেন মানসীর কথা। বলেন, "আমার সঙ্গে আসুন, আমি ভাল জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছি।"

আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি নির্দিষ্ট জায়গাটি দেখিয়ে দেন। আমরা বসি। পূজারীর বোধ হয় এখন হাতে কোন কাজ নেই। তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন কাছে। সুবিধা পেয়ে মানসী জিজ্ঞেস করে, "রঘুনাথজীর পুজো হয় কখন?"

"দুপুরে।" পূজারী উত্তর দেন। তিনি আমাদের পাশে বসেন।

মানসী আবার বলে, "পুজোর কি নিয়ম? অর্থাৎ কি ভাবে পুজো হয়?"

পূজারী বলতে থাকেন, "সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে নেন রঘুনাথজী। কিছুক্ষণ বাদে শুরু হয় স্তোত্র। তার পরে ভোগ।

"রুপোর রেকাবিতে কয়েকখানি লুচি ও একবাটি দুধ এনে রাখা হয়। সামনের ঐ পরদাখানি ফেলে দিয়ে সবাই বেরিয়ে আসি বাইরে। রঘুনাথজী আহার গ্রহণ করেন।

"ভোগের পর উৎসর্গ।"

"কি রকম?" মানসীর প্রশ্নে থামতে হয় পূজারীকে।

পূজারী বলেন, "ছোট একটি রুপোর বেদি ঐ সিঁড়ির ওপরে রেখে তাতে খানিকটা কর্পূর ঢেলে আগুন জ্বালানো হয়। তার পরে সেই আগুনে চাল ফল ঘি মধু ও মশলা আহুতি দেয়া হয়। আহুতি প্রদানকালে প্রধান পুরোহিত বলতে থাকেন—হে পরমারাধ্য রঘুনাথজী, তুমি আমাদের নিবেদন গ্রহণ করো।

"আগে কয়েক ঘণ্টা ধরে এই উৎসব হত, এখন কয়েক মিনিটে শেষ হয়ে যায়।

"উৎসর্গের পরে বাজনা বাজতে থাকে। সামনের পরদাখানি তুলে দেখা হয়। প্রধান পুরোহিত কিছুক্ষণ ধরে আরতি করে বাজনদারদের সঙ্গে নিয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করেন। অবশেষে রঘুনাথজী ও নরসিংহকে নিয়ে যাওয়া হয় শয়নকক্ষে—দিবানিদ্রার জন্য। দিনের পুজো শেষ হয়।"

থামেন পুজারী। আমরা সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ দিই তাঁকে। তিনি মন্দিরে চলে যান। এখুনি সন্ধ্যারতি শুরু হবে।

কিছুক্ষণ বাদেই ঢোল ও বাঁশির শব্দে সচকিত হয়ে উঠি। শুরু হয় আরতি। তাড়াতাড়ি উঠে আমরা মন্দিরদ্বারে আসি। বাজনার তালে তালে ঘিয়ের প্রদীপ দিয়ে রঘুনাথজীর আরতি করছেন প্রধান পুরোহিত বড় ভাল লাগছে। আমরা সমস্ত মন ও প্রাণ দিয়ে এই শুভ-উৎসব উপভোগ করি।

এক সময় আরতি শেষ হয়, বাজনা থেমে যায়। আমাদের চমক ভাঙে। রঘুনাথজীকে প্রণাম করে দুজনে বেরিয়ে আসি মন্দিরের বাইরে। বিদায় নিই পুজারীর কাছ থেকে। সংকীর্ণ উৎরাই পথ বেয়ে নেমে চলি বড় রাস্তার দিকে।

বড় রাস্তায় এসে মানসী বলে, "সেই কখন এক কাপ চা খাইয়ে মাইলের পর মাইল টহল দিইয়ে নিচ্ছ।"

"চা খাবে ?"

"নইলে আর বলছি কেন ?"

"বেশ, চলো।"

বড় রাস্তা দিয়ে খানিকটা এগিয়ে একটা চায়ের দোকানে এসে ঢুকি। বেয়ারা স্বাগত জানায়। দুজনে একটা টেবিলের দুদিকে বসি। তার পরে মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "কি খাবে ?"

"বললাম তো চা।" মানসী উত্তর দেয়।

"চা-য়ের সঙ্গে আর কি খাবে ?"

"কিছু না, কেবল চা। তুমি কিছু খাবে ?"

"ভাবছি···খেলে মন্দ হত না।"

"তাহলে আমিও খাব।"

"কী ?"

"তুমি যা খাবে।"

রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়ে বেরিয়ে আসি পথে। ঘাড় দেখে মানসী—রাস্ত

আটটা বেজে গেছে। রাস্তায় আলো আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বড়ই কম। তাহলেও পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে না, চাঁদনী রাত। মেঘমুক্ত আকাশ। আকাশে এককালি বাঁকা চাঁদ আর লক্ষ তারার দেয়ালী।

বাস স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। ঢালপুর ময়দানের ভেতর দিয়ে চলেছি হেঁটে। চলেছি মানসীর পাশে পাশে—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শ্যামল কোমল প্রান্তর পেরিয়ে।

হঠাৎ নীরবতা ভঙ্গ করে মানসী, "আরও একটা দিন ফুরিয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, জীবনের মালা থেকে একটি ফুল পড়ল খসে।"

"জীবনের কথা ভাবছি না আমি।"

"কি ভাবছ তাহলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"ভাবছি এই দিনগুলোর কথা। তোমার আর আমার কথা।"

আমি নীরবে পথ চলি। মানসীও আর কোন কথা বলছে না। না, কথা বলে মানসী। বলে, "এসো না, একটু বসা যাক। এমন সুন্দর রাত। এই স্বর্গীয় পরিবেশ। আর কদিনই বা আছি একসঙ্গে।"

"বেশ, চলো।" সম্মতি দিই।

পথ থেকে খানিকটা সরে এসে মাঠের মাঝে বসি দুজনে। সত্যিই সুন্দর। দূরে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা আর কাছে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কুলু উপত্যকা। পাশে মানসী। একটু আগে সে বলেছে, আর কদিনই বা আছি একসঙ্গে। সত্যি তাই। হিমাচল পরিক্রমার আরও একটা দিন গেল ফুরিয়ে। বাকি দিন কটিও একে একে এমনি করে যাবে চলে। তখন হয়তো আজকের এই সন্ধ্যাটিকে মনে হবে স্বপ্ন বলে।

মানসী আমার চিন্তায় ছেদ টানে। বলে "এত গল্প করলে অথচ বললে না, রঘুনাথজী মন্দিরের ইতিহাস।"

"শুনবে?"

"হ্যাঁ।"

আমি বলি, "জগৎ সিং বাদানী রাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি। তিনি ছিলেন বীর ও কর্মঠ। তাঁর নির্মিত জগৎসুখ মন্দির ও নাগর রাজপ্রাসাদ তুমি দেখেছো।"

মানসী মাথা নাড়ে। তার কানের দুল দুটি চাঁদের আলোয় ঝকমক করে ওঠে।

আমি বলতে থাকি, "রাজা জগৎ সিং একদিন সুলতানপুরের পথে

রাজকার্যে বেরিয়েছেন। মেয়েরা ঝর্ণা থেকে জল নিয়ে ঘরে ফিরছিল। রাজদর্শনের লোভ সামলাতে পারে না। পথের ধারে পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাজাকে দেখে। রাজাও দেখেন তাদের। একটি মেয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারেন না রাজা। স্বর্গের অপ্সরী। রাজা ঘোড়া থেকে নেমে এগিয়ে যান তার কাছে। ওরা ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রাজা মেয়েটিকে নাম জিজ্ঞেস করেন। সে নতমস্তকে কোনমতে জবাব দেয়।

"রাজা তার পরিচয় জেনে নিয়ে ঘোড়ায় ওঠেন। টগবগ করে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসেন রাজবাড়িতে। নগরকোটালকে ডেকে পাঠান। বলেন— দুর্গাদত্তের মেয়েকে আমার চাই।

"নগরকোটাল আসেন দুর্গাদত্তের কাছে। সসম্মানে তিনি বসতে বলেন কোটালকে। আসন গ্রহণ করে কোটাল তাঁকে বলেন সব কথা। ব্রাহ্মণ বুঝতে পারেন, রাজার কু-নজরে পড়েছে তাঁর সুন্দরী যুবতী কন্যা। মৃত্যু ছাড়া এ নজর এড়াবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু সেকথা বললে তিনি মরতেও পারবেন না, পারবেন না মেয়ের সতীত্ব রক্ষা করতে। তাই তিনি রাজার প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য সময় চাইলেন কোটালের কাছে। কোটাল সানন্দে তাঁকে একদিনের সময় দিয়ে ফিরে এলেন রাজার কাছে। রাজা ভাবলেন ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই কাল সম্মত হবে তাঁর প্রস্তাবে। কালই কোটাল দুর্গাদত্তের সুন্দরী কন্যাকে নিয়ে আসবে অন্দর-মহলে। রাজা জগৎ সিংয়ের অশান্ত-চিত্ত শান্ত হবে।

"পরদিন সকালেই কোটাল এসে খবরটা দিলেন রাজাকে। রাজা ছুটে গেলেন দুর্গাদত্তের বাড়িতে। সব শেষ হয়ে গেছে। মেয়েকে ক্ষত্রিয় রাজার কামনাবহ্নি থেকে বাঁচাতে ঘরে আগুন দিয়ে ব্রাহ্মণ দুর্গাদত্ত স্ত্রী পুত্র ও কন্যাসহ আত্মহত্যা করেছেন। তাঁদের বিকলাঙ্গ মৃতদেহগুলির দিকে তাকিয়ে রাজা বার বার শিউরে ওঠেন। অথচ ওরই একটি দেহের জন্য কাল পাগল হয়েছিলেন রাজা জগৎ সিং।

"অনুশোচনায় ক্লান্ত রাজা ফিরে আসেন রাজবাড়িতে। ব্রহ্মহত্যার পাপে দগ্ধ হতে থাকেন তিনি। চোখ মেললেই রক্ত দেখতে পান—ব্রহ্মরক্ত। যা কিছু আস্বাদন করেন, তার মধ্যেই তিনি রক্তের স্বাদ পান। যা কিছুর ঘ্রাণ নেন, তার মধ্যেই লেগে রয়েছে রক্তের গন্ধ। যা কিছু স্পর্শ করেন, তা-ই রক্তের মতো ঘন। তিনি ঘুমুতে পারেন না, চোখ মেলতে পারেন না, কোন কাজ করতে পারেন না।

"অর্ধ উন্মাদ রাজা ছুটে এলেন রাজগুরুর কাছে। রাজগুরু বললেন— ব্রহ্মহত্যার পাপমুক্ত হতে হলে তোমাকে সিংহাসন পরিত্যাগ করে বৈষ্ণব হতে হবে। বিষ্ণুর প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যশাসন করতে হবে।

"কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সেই বিষ্ণু-বিগ্রহ ?

"দামোদর দাস নামে জনৈক রাজকর্মচারী গেলেন অযোধ্যায়। সেখানকার কোন মন্দির থেকে রঘুনাথজীর এই বিগ্রহ অপহরণ করে নিয়ে এলেন। নির্মিত হল মন্দির। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহে রঘুনাথজীকে প্রতিষ্ঠিত করা হল এই মন্দিরে। রাঠোর রাজপুত রাজা বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন।

"শাক্ত জগৎ সিং হলেন বৈষ্ণব। বিষ্ণুর প্রতিনিধিরূপে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করতে থাকলেন। শান্তি ফিরে এলো তাঁর মনে।"

"বড় ভাল লাগল শুনতে। এবার চলো বাংলোয় ফেরা যাক্। নটা বেজে গেছে।" মানসী উঠে দাঁড়ায়।

আমরা ফিরে আসি পথে। পাশাপাশি পথ চলি।

একটু বাদে মানসী বলে, "একটা কথা কদিন থেকেই বলব বলব ভেবে আর বলা হয়ে উঠছে না।"

"এখুনি বলে ফেল তাহলে।" আমি বলি।

"হ্যাঁ, দেখো এই খরচ-টরচগুলো বড্ড একতরফা হয়ে যাচ্ছে। মানে প্রায় সব খরচই তুমি করছ।"

"তাই তো করার কথা।"

"কেন ? তুমি আমার কে ?"

"কেউ নই।"

"তাহলে তুমি আমার জন্য খরচ করবে কেন ? কালই একটা হিসেব করে দিও।"

"পারব না।"

"কেন ?"

"সংসারে সবাই সমান হিসেবী নয়।"

"কথাটা যে আমার।" মানসী বলে।

"তাই তো বললাম।"

"না, না। সত্যি বলছি। সেদিন মানালীতে দেখা হবার পর থেকে আমার জন্য তোমার কত খরচ হয়েছে, বলে দিও।" মানসী গম্ভীর

স্বরে বলে।

আমি বলি, "সব দেনা শোধ করে দিতে চাও?"

মানসী থমকে দাঁড়ায়। আমার দিকে একবার তাকায়। তার পরে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার চলতে শুরু করে।

নিস্তব্ধ পৃথিবী, নির্জন পথ, নীরব যাত্রী। চাঁদের আলোয় রাতের কুহেলী। মোহময়ী রাত্রি।

খানিকক্ষণ পথ চলার পরে আবার প্রশ্ন করি, "আমার কথার উত্তর দিলে না যে?"

"কি উত্তর দেব?" সে পাল্টা প্রশ্ন করে।

"আমার কাছে তোমার যদি সত্যই কোন ঋণ হয়ে থাকে, তা কি সবই শোধ করে দেবে?"

"সব ঋণ তো শোধ করা যায় না সখা!"

মানসীর একখানি হাত হাতে তুলে নিই। কোন আপত্তি করে না সে। কোন কথা বলে না। আমারও সব কথা গেছে হারিয়ে। আমি কেবল মানসীর হাত ধরে পাশাপাশি পথ চলি—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হিমাচলের পথ।

বাকি পথটুকু পেরিয়ে আসি নিঃশব্দে। ট্যুরিস্ট-বাংলোর আলো দেখা যায়। মানসী হাত ছাড়িয়ে নেয়।

হঠাৎ গম্ভীর স্বরে সে বলে ওঠে, "কারও দুর্বলতার কখনও এমন সুযোগ নিতে নেই।"

"সুযোগ?" আমি চমকে উঠি।

"নয়তো কি? রাতের নিজন পথে অনাত্মীয়া নারীকে পাশে পেয়ে তার পাণিপীড়ন করাকে সুযোগের সদ্ব্যবহার ছাড়া আর কি বলব?"

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে। তবু কোনমতে বলি, "তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না মানসী?"

"করি।" অকম্পিত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে। "আর করি বলেই ভয় পাচ্ছি। আমার এতো বড় বিশ্বাসের যদি অমর্যাদা ঘটে।"

॥ বারো ॥

আমরা ডাইনিং হলে এলাম। একেবারে খেয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকব। ময়দানে বসেই সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু খেতে বসে নিশ্চয় করে বুঝতে পারছি, কাজটা ঠিক হয় নি। ওষুধটা কিনে আনা উচিত ছিল। বছর দুয়েক হল, আমার এমনি হঠাৎ হাঁপানির টান ওঠে। আগে ধারণা ছিল হাঁপানি বৃদ্ধ বয়সের রোগ। নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারছি ধারণাটা ভুল।

কখন হঠাৎ আক্রান্ত হব, আগের থেকে বুঝতে পারি না। তাই আমি সব সময়ে ট্যাবলেট সঙ্গে রাখি। এবারও নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সেদিন খোকসারে ফুরিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম মানালীতে ফিরে কিনে নেব। কিন্তু মানালীতে মানসীর সঙ্গে দেখা। রোগের কথা তো বটেই, নিজের কথাই যে গিয়েছি ভুলে। ওষুধ কেনার কথা মনেই হয় নি এ কদিন। আর ভাবতেও পারি নি, আজ এ সময়ে হঠাৎ এভাবে আক্রান্ত হব।

কথাটা কিন্তু চেপে গেলাম মানসীর কাছে। কি হবে ওকে বলে? কেবল দুশ্চিন্তার জাল বোনা ছাড়া আর কি সাহায্য সে করতে পারে? রাত দশটা বাজে। শীতের শহর—বাজার বন্ধ হয়ে গেছে বহুক্ষণ। তাছাড়া বাজার এখান থেকে প্রায় এক মাইল—গাড়ি-ঘোড়া কিছু নেই।

'হ্যাঁ', 'না', করে কোনমতে মানসীর কথার জবাব দিয়ে সামান্য কিছু খেয়ে ঘরে এলাম। নির্মলবাবু ও তার স্ত্রী কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। মা শুয়ে শুয়ে গীতাপাঠ করছেন। আমরা আসতেই তিনি গীতাখানি রেখে দিলেন। চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা শুরু করলেন। খৃষ্টানের সামনে গীতাপাঠ! তাঁর মতে বোধ হয় শাস্ত্র-বিরুদ্ধ।

কিন্তু আমার এখন এসব ভাবার মতো শারীরিক অবস্থা নয়। আমি তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকি। কিন্তু টানটা যে ক্রমেই বাড়ছে। বড়ই শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। কি করব বুঝতে পারছি না। মানসীকে বলব কি?

কি লাভ হবে? কেবল তার দুশ্চিন্তা বাড়বে। এতো রাতে সে কোথায় ওষুধ পাবে? তাছাড়া সে-ও পরিশ্রান্ত। তার চেয়ে কষ্ট করে কোনরকমে

রাতটা কাটিয়ে দিই। কিন্তু রাত যে এখনও অনেক বাকি। পারব কি কাল সকাল পর্যন্ত সহ্য করতে, চুপ করে থাকতে?

বাথরুম থেকে ফিরে আসে মানসী। বেড়াবার জামা-কাপড় গুছিয়ে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। একটু বাদে আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, "জল খাবে?"

মাথা নাড়ি। ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে আসে মানসী। উঠে বসে জলটা নিঃশেষ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি। কোন কথা বলি না। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। মানসীর বোধ করি কোন সন্দেহ হয় নি। সে আবার আসে। বলে, "বাতি নিবিয়ে দিই?"

আমি তেমনি মাথা নাড়ি।

বাতি নিবিয়ে দেয় মানসী কিন্তু ঘর আঁধারে ঢেকে যায় না। বারান্দায় আলো জ্বলছে। কাঁচের জানালা দিয়ে সে আলোর অনেকখানি এসেছে এই বন্ধ ঘরে।

মানসী এসে তার বিছানায় বসে—শুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বলে, "গুড নাইট।"

আমি শুভ-রাত্রি জানাতে পারি না। আমার কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকি।

কিন্তু চেষ্টায় কি সব হয়? আমার যে নিঃশব্দে নিঃশ্বাস নিতে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। বাধ্য হয়ে জোরে জোরে শ্বাস নিতে শুরু করি। কতক্ষণ এভাবে সংগ্রাম করতে হবে?

চুপ করে থাকি। যে ভাবেই হোক শারীরিক কষ্টকে গোপন করে রাখতে হবে। মানসী যেন টের না পায়। কিন্তু কতক্ষণ পারব কে জানে? শ্বাসকষ্টটা ক্রমেই বাড়ছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে হচ্ছে। নিস্তব্ধ রাত্রি—বন্ধ ঘর। নিঃশ্বাসের শব্দকেই সোরগোল বলে মনে হয়।

আমার সকল চেষ্টা বৃথা হল। মানসী টের পেল। সে টর্চ জ্বালায়। বলে ওঠে, "কি হয়েছে তোমার? ওরকম করছ কেন?"

সে তাড়াতাড়ি উঠে আমার খাটিয়ায় এসে বসে। আমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলে, "কথা বলছ না কেন, কি হয়েছে তোমার?"

মানসী বোধ হয় ভুলেই গিয়েছে একটু দূরে ঘুমিয়ে রয়েছে সাহা পরিবার। কথা বলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে আমার। তবু কোনমতে বলি, "হাঁপানির টান উঠেছে।"

"হাঁপানি···?" আরও কি বলতে গিয়ে থেমে যায় সে। বোধ হয় খেয়াল হয় সাহা পরিবারের কথা। স্বামীর হাঁপানির সংবাদ স্ত্রীর অজানা থাকার কথা নয়। তাই একটু থেমে নিচু হয়ে আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, "কখন টান উঠেছে?"

"খেতে বসে।"

"এতক্ষণ বল নি কেন?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী যেন ভেঙে পড়ে। সে আমার বুকে হাত বোলাতে থাকে। ভাল লাগে, কিন্তু রোগের দাপট কমে না।

"ওষুধ নেই সঙ্গে?" একটু বাদে মানসী প্রশ্ন করে।

"না।"

"পাহাড়ী পথে একা একা ঘুরে বেড়াও। সঙ্গে ওষুধ রাখো না!"

একবার ভাবি বলি, নিয়ে এসেছিলাম, ফুরিয়ে গেছে, আর কেনা হয় নি। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। আর কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে আমার। আমি চুপ করে থাকি।

মানসী বলে, "কি ওষুধ খেলে তোমার কষ্ট কমে?"

আমি নাম বলি। মানসী নামটা দু-তিনবার আবৃত্তি করে। তার পরে সহসা উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আমি যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"ওষুধ আনতে।"

"এত রাতে কোথায় যাবে তুমি?" আমি তার হাত ধরতে চাই। সে দূরে সরে যায়। আলো জ্বালায়। মিসেস সাহার ঘুম ভেঙে যায়। আমি অসহায়।

মানসী মিসেস সাহাকে বলে, "ওর আবার হাঁপানির দোষ আছে। হঠাৎ টান উঠেছে। আমি ওষুধ আনতে যাচ্ছি। আপনি একটু সজাগ থাকবেন ভাই!"

"এত রাতে একা ওষুধ আনতে যাচ্ছেন? কোথায়?" মিসেস সাহা সবিশেষ বিস্মিতা।

"কেন, বাজারে।"

"দোকান খোলা পাবেন কি? আর একা একা যাবেনই বা কেমন করে?"

"কিন্তু না গিয়েও তো উপায় নেই। ওর যে বড়ই কষ্ট হচ্ছে। যে ভাবেই হোক ওষুধ আনতেই হবে। শহর যখন, নিশ্চয়ই কোন ডিসপেনসারীতে

নাইট সারভিসের ব্যবস্থা আছে।" মানসী ওভারকোট গায়ে দেয়। টর্চ ও টাকা নেয়।

স্বামীকে দেখিয়ে মিসেস সাহা বলে, "আমি বরং ওনাকে ডাকছি, আপনার সঙ্গে যান। আপনি একা একা এই অচেনা জায়গায় কোথায় যাবেন।"

"না, না।" প্রতিবাদ করে মানসী। "উনি ঘুমোচ্ছেন। আপনি ভদ্রলোককে ডিস্টার্ব করবেন না। আমি দেখছি চৌকিদারকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি কিনা।"

মিসেসকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে মানসী দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যায়। আমি অসহায় দৃষ্টিতে বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকি।

মিসেস আবার শুয়ে পড়ে। কিই বা করবে বসে থেকে। তার আর সাড়া পাচ্ছি না। সে কি ঘুমিয়ে পড়ল নাকি?

সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু ট্যুরিস্ট-বাংলোর এই ডরমিটারীতে নয়। গ্রামে-গঞ্জে শহরে-বন্দরে শ্রান্ত মানুষ পড়েছে ঘুমিয়ে। ঘুমের দেশে কেবল আমি রয়েছি জেগে। না, আমি একা নই। জেগে আছে মানসী। আমারই জন্য সে এই গভীর রাতে পথে বেরিয়েছে। অথচ আজই সন্ধ্যায় সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল—আমি তার কে? বলেছিল, সে নাকি আমার কাছে অনাত্মীয়া নারী ছাড়া আর কিছুই নয়।

কতক্ষণ পরে জানি না, ফিরে আসে মানসী। আমার দুশ্চিন্তার অবসান হয়। দরজায় খিল দিয়ে সে ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে আমার কাছে। ব্যগ্রকণ্ঠে বলে, "খুব কষ্ট হচ্ছে, না?"

আমি মাথা নাড়ি।

"ওষুধ নিয়ে এসেছি, এবার কমে যাবে।" মানসী আমাকে সান্ত্বনা দেয়। সে জল নিয়ে আসে। ওভারকোটের পকেট থেকে ওষুধ বের করে। আমাকে ওষুধ খাওয়ায়। আলো নিবিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসে। মাথার কাছে বসে। আমার বুকে হাত বুলিয়ে দেয়। আস্তে আস্তে বলে, "এবার ঘুমোবার চেষ্টা করো। ঘুমুতে পারলেই সব যন্ত্রণা কমে যাবে।"

"কিন্তু তুমি আমার জন্য কেন এতো কষ্ট করলে মানসী?" আমি ওর একখানি হাত ধরি।

সে আমার কানের কাছে মুখ এনে ধমক লাগায়, "চুপ। ওরা জেগে আছেন। সন্দেহ করবেন।"

"তুমি এবারে গিয়ে শুয়ে পড়ো।"

"আগে তুমি ঘুমাও। তোমাকে ঘুম না পাড়িয়ে আজ যে ঘুম আসবে না আমার।"

"কাল রাতে আমি কিছু বলি নি বাছা, কিন্তু ধন্যি মেয়ে তুমি।"

ঘুম ভেঙে যায় আমার। কাঁচের জানালা দিয়ে প্রভাতী রোদ এসেছে ঘরে। ইস, এ যে দেখছি বেশ বেলা হয়ে গেছে। খুব ঘুমিয়ে নিয়েছি। কিন্তু নির্মলবাবুর মা কাকে বলছেন ওকথা! মানসীকে? হ্যাঁ। তবে কি তিনি টের পেয়েছেন সব? আমি আবার চোখ বুজি।

না। আমার সন্দেহ মিথ্যে। বৃদ্ধা বলছেন, "ঐ রাতদুপুরে ডাক্তারকে জাগিয়ে ওষুধ নিয়ে এলে। অচেনা শহর। এতটা পথ। পথে যদি একটা বিপদ-আপদ হত?"

"ওষুধ না আনলে যে আরও বড় বিপদ হতে পারত মা!" মানসী জবাব দেয়। হয়তো বা আমার দিকে তাকায়। আমি চোখ বুজে থাকি।

বৃদ্ধা বলেন, "তাই তো বলছি, ধন্যি মেয়ে তুমি। দেখে রাখো বউমা!" শাশুড়ী পুত্রবধূকে বলেন, "স্বামীকে এমনি করেই ভালোবাসতে হয়। সাবিত্রী সত্যবানের জন্য যমালয়ে গিয়েছিল।" কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই খেয়াল হয় তাঁর। একটু থেমে তিনি মানসীকে বলেন, "কিন্তু তোমরা তো খেরেস্তান। তোমাদের মধ্যে নাকি এমন হয় না।"

"যা শুনেছেন, তা সত্য নয় মা। ভালোবাসাই সব ধর্মের মূল কথা। প্রেমের জন্যই প্রাণ দিয়েছেন যীশু।"

মানসী বোধ হয় বুকে ক্রুশ আঁকে। কিন্তু দেখতে পাই না আমি। আমি চোখ বুজে আছি। মানসীকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। আমি চোখ মেলে তাকাই। মানসী বাথরুমে চলে যায়।

আমাকে চোখ মেলতে দেখে বৃদ্ধা আমার কাছে আসেন। জিজ্ঞেস করেন, "এখন কেমন আছো?"

"ভাল।"

"থাকতেই হবে। এমন লক্ষ্মী বউ যার। সারারাত মেয়েটা মাথার কাছে বসে ছিল। তুমি সত্যি ভাগ্যবান।"

নিজের অলক্ষ্যেই বলে ফেলি, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

মানসী ঘরে আসে। মিসেস সাহা খিলখিল করে হেসে ওঠে। আমি চুপ করে থাকি। মানসী মিসেসকে জিজ্ঞেস করে, "কী?"

"আপনি ভাগ্যবতী।" মিসেস হাসতে থাকে।

কিছুক্ষণ বাদে বেরিয়ে যান সাহা পরিবার। ওঁরা আজ নাগর যাচ্ছেন। ওঁদের বিদায় দিতে মানসী বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। ফিরে এসে আমার খাটিয়ার পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞেস করে, "কষ্ট কমেছে?"

"হ্যাঁ, না কমে উপায় আছে। সাবিত্রী সঙ্গে রয়েছে যে।"

"বাজে কথা ছেড়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসো, ওষুধ খেয়ে নাও। আমি চা পাঠাতে বলে এসেছি।"

"যাচ্ছি, কিন্তু তুমি নাকি কাল সারারাত আমার শিয়রে বসেছিলে?"

"হুঁ।"

"কেন?"

"তুমি বসিয়ে রেখেছিলে বলে।"

"আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে তুমি গিয়ে শুয়ে পড়লেই পারতে।"

"হ্যাঁ, পারতাম বৈকি। যতবার হাত ছাড়িয়ে নিতে গেছি, ততবার আরও শক্ত করে ধরে রেখেছো। জোর করি নি, পাছে তোমার ঘুম ভেঙে যায়।"

"আমার জন্য তুমি কেন এত কষ্ট করলে মানসী?" আমি হাত বাড়িয়ে ওর একখানি হাত ধরতে চাই।

দূরে সরে যায় মানসী। কর্কশ কণ্ঠে বলে ওঠে, "কাল রাতের আঁধারে ঘুমের ঘোরে রোগের দাপটে যা করেছেন, আজ দিনের আলোতে জেগে থেকে সুস্থ শরীরে তা করতে চাইবেন না।"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়।

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। তার পেছনে মানসীও ঘরে ঢোকে। বলে, "যাও তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে এসো। ওষুধ খেতে হবে। চা জুড়িয়ে যাবে।"

চায়ের কাপটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে মানসী বলে, "আজ কিন্তু আমাদের কোন প্রোগ্রাম নেই।"

"কেন?" বিস্মিত হই, "কাল যে কথা হয়েছিল আজ আমরা বিজলী-মহাদেবের মন্দিরে যাব।"

"মহাদেব মাথায় থাক্‌। এবেলা তুমি এ ঘরের বাইরে পা দিতে পারবে না, আজ তোমার কমপ্লিট রেস্ট। কেবল বিকেলে একবার বাজারে যাব।"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। বোধ হয় কাল রাতের সেই ডাক্তারের নির্দেশ। তবু বলি, "সারাদিন কি করব তাহলে?"

"ঘরে থাকবে।"

"ঘরে বসে থাকব?"

"না, শুয়ে থাকবে। কমপ্লিট রেস্ট।" মানসী যেন আদেশ দেয়।

মেনে নিতে হয়। চা খেয়ে শুয়ে পড়ি। মানসী নিজের একখানি কম্বল এনে আমার গায়ে দিয়ে দেয়। আমার কম্বল নেই। কুলুতে দিনের বেলা স্লীপিং ব্যাগে ঢোকা কষ্টকর।

আমি বলি, "তুমিও তো একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো।"

"ঘুম পেলে নিশ্চয়ই ঘুমোব। আমার কথা ভাবতে হবে না, নিজের কথা ভাবো।" ব্যাগ থেকে কলম ও টেলিগ্রাম ফর্ম বের করে মানসী টেবিলের ধারে গিয়ে বসে। কাকে যেন টেলিগ্রাম পাঠাচ্ছে। আমি কোন কথা না বলে চুপ করে থাকি।

একটু বাদে মানসী বলে, "এখান থেকে আমরা তো যোগিন্দর নগর যাচ্ছি?"

"হ্যাঁ।"

"তার পরে?"

"পাঠানকোট।"

"তাহলে বাবাকে কোথায় কোন্ ঠিকানায় চিঠি লিখতে বলব?"

"যোগিন্দর নগরে ডাকবাংলোয় আর পাঠানকোটে কেয়ার অফ স্টেশন মাস্টার।"

সে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। টেলিগ্রামটা চৌকিদারকে দিয়ে কিছুক্ষণ বাদে মানসী ফিরে আসে নিজের খাটিয়ায়। বলে, "বাবার চিঠি পাচ্ছি না কেন বল তো?"

"হয়তো ব্যস্ত আছেন বলে চিঠি লিখতে পারছেন না।" আমি বলি।

"কিন্তু বাবা তো কখনও এমন করে না। শত কাজের মাঝেও আমাকে চিঠি লেখে। কিছুদিন থেকে শরীরটা ভাল নেই। তাই বড্ড চিন্তা হচ্ছে।"

"কি হয়েছে তাঁর।"

"বড়লোকের যা হয়, হার্ট-ট্রাবল্‌স।"

"তাহলে তুমি বড়লোকের মেয়ে?"

"তা বলতে পারো। কেবল মেয়ে কেন, বড়লোকদের বোন। আমার

দাদারাও গরীব নয়। কিন্তু মজা কি জানো?"

"কি?"

"আমি বড়ই দরিদ্র।" মানসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

"কেন?" বুঝতে পারি না আমি।

"তোমার মা বেঁচে আছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তুমি বুঝতে পারবে না।' মানসী আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। বলে, "শৈশবে যারা মাকে হারায় তাদের মতো দুঃখী আর হয় না এ সংসারে।" একবার থামে মানসী। তার পরে বলে, "তবে এক দিক থেকে আমার ভাগ্য বড়ই ভাল। আমার বাবার মতো স্নেহপ্রবণ মানুষ খুবই কম হয়। পিতা-মাতার যৌথ স্নেহে বাবা আমাকে মানুষ করেছে। অথচ সেই বাবাকে আমি কতো বড় আঘাত দিয়েছি।"

"কেমন করে?"

"আমি তাঁর কথা শুনি নি। তাঁর পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করি নি।"

"কেন?"

"নিজের পছন্দের ওপরে বেশি বিশ্বাস ছিল বলে।"

"সে বিশ্বাস কে ভেঙে দিল?"

"যেই দিক।" মানসী উঠে দাঁড়ায়। একটু হাসে—করুণ হাসি। তার পরে আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে, "তুমি কেন বিশ্বাসভঙ্গ করছ?"

"আমি?" বুঝতে পারি না।

মানসী আবার খাটিয়ায় বসে। তার পর শুয়ে পড়ে। বলে, "হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে শর্ত ছিল, কখনও আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করবে না।"

আমি চুপ করে থাকি।

মানসী পাশ ফিরে শোয়। বোধ হয় চোখ বোজে। সে কি ঘুমোবার চেষ্টা করছে? না, নিজের বিগত জীবনের কথা ভেবে চলেছে?

সেকথা জিজ্ঞেস করতে পারব না। আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবু আমি মানসীর কথাই ভাবতে থাকি।

আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। মানসী জিজ্ঞেস করে, "তোমার শরীর কেমন আছে?"

"ভাল।"

মানসী আমার দিকে ফেরে। বলে, "শ্বাসকষ্ট কমেছে?"

"হ্যাঁ।"

"কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?"

"না।"

"তাহলে চুপ করে আছো কেন? আর ক'দিনই বা আছি একসঙ্গে। বল না ভারমৌরের কথা।"

"ভারমৌর?"

"হ্যাঁ। কাল সেই মানালী থেকে কুলু আসার সময় মণিমহেশ যাত্রা কাহিনী বলছিলে। তোমরা দূর থেকে চাম্বা রাজত্বের সূতিকাগার ভারমৌর উপত্যকা দেখতে পেলে। ডাকরাণার দুখরিয়া সিং দু-হাত জোড় করে কাকে যেন প্রণাম করল। তোমরা বুঝতে পারলে না, কে তার প্রণম্য। তবু তার দেখাদেখি প্রণাম করলে। কিন্তু কাকে প্রণাম করল দুখরিয়া, তা কিন্তু এখনও বল নি আমাকে, বল নি ভারমৌরের কথা।"

"এখন আবার সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করব?"

"হ্যাঁ।" মানসী উত্তর দেয়, "যে দিনগুলিকে ভুলে যাবার জন্য আমি হিমালয়ে আসি, আমার সেই দুঃখময় অতীত আজ আবার আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে তুমি দূর করে দাও, আমাকে তুমি ভুলিয়ে দাও সে অতীত। তুমি হিমালয়ের কথা বলো, আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করো।"

কি সে অতীত? কেন তাকে ভুলতে চায় মানসী?

কিন্তু আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সে কথা জিজ্ঞেস করতে পারব না। তাহলেও এই গুমোট আবহাওয়াটাকে হালকা করে তোলা দরকার। তাই মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বলি, "এত ব্যস্ততার কি আছে? আমরা তো আরও কয়েকটা দিন আছি একসঙ্গে।"

"তুমি লেখক।" মানসী স্বাভাবিক স্বরে উত্তর দেয়, "পাঠক-পাঠিকার কৌতূহল বাড়িয়ে তুলতে পারলেই তোমার আনন্দ। কিন্তু আমার বেলাতে ও চালাকিটি চলছে না। শিগগীর শুরু করো, নইলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।"

কিন্তু সত্যি সত্যি মণিমহেশ যাত্রার কথা শুরু করতে হয় না আমাকে। আমি কিছু বলতে পারার আগেই মানসী সহসা বলে ওঠে, "এক্স্‌কিউজ মি।

এক মিনিট।"

আমি তার দিকে তাকাই। সে এগিয়ে যায় টেবিলের ধারে। আমি নীরব থাকি। সে ওষুধ ও জলের গ্লাস নিয়ে ফিরে আসে আমার কাছে।

প্রতিবাদ করে কোন লাভ নেই। তাই নিঃশব্দে ওষুধ খাই। গ্লাসটি টেবিলের ওপর রেখে ফিরে আসে মানসী। জিজ্ঞেস করে, "তোমার কি কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে?"

"না তো।"

"আমি বরং তোমার খাটে বসছি। তুমি একটু সরে শোও।"

"তাতে লাভ?" একটু সরে মানসীকে বসবার জায়গা দিই।

মানসী আমার বিছানায় বসে। বলে, "লাভ আছে বৈকি। তোমাকে চেঁচিয়ে কথা বলতে হবে না।"

"কিন্তু তোমাকে যে বসে থাকতে হবে?"

"হোক গে।" একটু থামে মানসী। তারপরেই বলে ওঠে, "আর আমাকে যে বসে থাকতে হবে, তারই বা কি মানে আছে? ইচ্ছে হলেই আমি তোমার পাশে শুয়ে পড়ব।"

"পারবে?"

"দেখতে চাও?'

"হ্যাঁ।"

"না।" সে সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠে। প্রশ্ন রাখে, "যা হবার নয়, তা না-হওয়াই ভাল নয় কি?"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। সকালে ঘর থেকে বেরুতে দেয় নি আর বিকেল না হতেই বেড়াবার তাড়া। মানসী আমাকে এনে হাজির করেছে ডাক্তারখানায়।

অবাধ্য হয়ে লাভ নেই। তাতে কেবল অশান্তি বাড়বে। তাই ডাক্তার বাবুকে সবিস্তারে অসুখের ইতিহাস বলি। লম্বা একখানি প্রেসক্রিপশান লিখে তিনি আমার হাতে দেন। মানসী ছোঁ মেরে সেখানি আমার হাত থেকে নিয়ে নেয়। ব্যাগ খুলে ডাক্তারবাবুর ফি দিয়ে এগিয়ে যায় কম্পাউণ্ডারের কাছে। ডাক্তারবাবুকে নমস্কার করে আমি বেরিয়ে আসি বাইরে।

কিছুক্ষণ বাদে সে ওষুধ হাতে বাইরে আসে। খুশিভরা স্বরে বলে,

"চলো।"

"কোথায়?"

"ট্যুরিস্ট বাংলোয়।"

"কিন্তু তা তো কথা ছিল না। তখন বলেছিলে, আমরা বেড়াতে বের হচ্ছি।"

"এই তো বেড়ানো হল। আবার কোথায় যাব?"

"সত্যি যাবার জায়গার বড়ই অভাব কুলুতে। তাই প্রতিদিন শত শত পর্যটক আসেন এখানে। তাঁরা সবাই ডাক্তারখানায় এসে তাদের ভ্রমণ শেষ করেন।"

হেসে দেয় মানসী। বলে, "বেশ চল, খানিকটা ঘুরে যাওয়া যাক্। কোথায় যাবে, ট্যুরিস্ট অফিসে?"

"হ্যা, যাবার জায়গা ঐ একটাই আছে এখানে। তবে তাই চলো, দেখি চিঠি-পত্র এলো কিনা।"

না, কোন চিঠি নেই। আমি প্রাণেশের খবরের প্রতীক্ষা করছি আর মানসী তার বাবার চিঠির পথ চেয়ে আছে। প্রাণেশের খবর আসার ঠিক সময় হয় নি। কিন্তু মানসীর বাবার চিঠি নেই কেন?

ট্যুরিস্ট অফিস থেকে বেরিয়ে মানসী বলে, "কোথায় যাবে, বাংলোয়?"

"না।"

"তাহলে কোথায়?"

"কোথাও যাব না, এই ময়দানে বসব।"

"এখন আবার ময়দানে বসবে?"

"হ্যা।"

"বেশ, চলো। তবে সন্ধ্যের আগেই বাংলোয় ফিরতে হবে কিন্তু।"

"না। রাত দশটা অবধি বসে থাকব।" আমি এসে একটা বড় গাছের নিচে বসি।

কাছে আসে মানসী। আমার পাশে বসে। বলে, "সন্ধ্যের পরে এখানে বসে থাকলে তোমার ঠাণ্ডা লাগবে যে।"

"লাগুক গে। এর চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা সইবার অভ্যেস আমার আছে।"

মানসী হাসে। আরও একটু কাছে এসে বলে, "রাগ করেছ?"

"তুমি আমার এই সামান্য অসুখ নিয়ে, কাল থেকে এমন বাড়াবাড়ি শুরু

করেছো······"

"অসুখটা সামান্য কিনা জানি না, হলেই ভাল। কিন্তু তুমি তো আমার কাছে সামান্য নও সখা! আর তাই আমার এতো ভয়।"

॥ তেরো ॥

পরদিন। সকাল সাতটায় বাস স্ট্যাণ্ডে এলাম। আমি ও মানসী কুলু থেকে মণিকরণ চলেছি। ট্যুরিস্ট অফিসার পরামর্শ দিয়েছেন—যাবার পথে আমরা যেন বজৌরার বিখ্যাত মন্দিরটি দেখে যাই। তাই এখন সোজা বজৌরা যাচ্ছি। মন্দির দর্শন করে ফিরে আসব ভুন্টার। সেখানে মণিকরণের বাস পাবো। ভুন্টার এখান থেকে ছ' মাইল। আরও তিন মাইল এগিয়ে বজৌরা।

একটু বাদেই বাস এলো। বসার জায়গাও পেয়ে গেল মানসী। আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম। সংসারের এই নিয়ম।

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। বজৌরা বাস স্ট্যাণ্ড ছাড়িয়ে দেবী সিংয়ের দোকানের সামনে বাস থেকে নামলাম। বজৌরার উচ্চতা ৩১০০ ফুট। ডাকবাংলো আছে। এখানেও প্রচুর আপেল হয়।

দেবী সিংয়ের দোকানের পাশ দিয়েই একটি পায়ে-চলা পথ। সংকীর্ণ মাটির পথ। পথের দুধারে ধানক্ষেত। ক্ষেতের শেষে বিপাশা। বিপাশার কূলে মন্দির।

মিনিট তিনেক হেঁটে আমরা মন্দিরের কাছে এলাম। কাঠের গেট ঠেলে মন্দির এলাকায় উপস্থিত হলাম। তারকাটার বেড়া দিয়ে একফালি তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ডকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তিনদিকে ক্ষেত ও একদিকে বিপাশা। বিপাশার কূলে মন্দির।

চতুষ্কোণ মন্দির। রচনাশৈলী হিন্দু আমলের। গ্রীক স্থাপত্যের ছাপ রয়েছে। মন্দিরশীর্ষ স্তম্ভযুক্ত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রাজা জগৎ সিং নির্মাণ করেছেন এই বশীশ্বর শিবের মন্দির। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে মন্দির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতির চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করেছে মানুষ। বিদেশী আক্রমণকারীরা বার বার

এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুলু উপত্যকার এই সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসৃষ্টির ওপরে। ফলে মন্দিরগাত্রের একটি মূর্তিও অক্ষত নেই।

এখানে নদীর ধারে আরও একটি মন্দির ছিল। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে সেটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। বশীশ্বর শিবের মন্দিরই এখন বজৌরার একমাত্র মন্দির।

পূর্বমুখী মন্দির। সেটাই স্বাভাবিক, কারণ পূবে বিপাশা। এটি মন্দিরের পেছন দিক। মন্দিরের বাইরে তিনদিকের দেয়ালে রয়েছে বড় বড় তিনটি প্রস্তরমূর্তি। এই পশ্চিম দিকে রয়েছে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। ওরা বলেন লক্ষ্মীনারায়ণ। ভারী সুন্দর মূর্তি। অলঙ্কার ও পোশাকের কারুকার্য খুবই সূক্ষ্ম ও সুন্দর।

উত্তরে কালীমূর্তি। দেবী যুদ্ধরতা—হাতে ধনুর্বাণ মশাল তলোয়ার ও ত্রিশূল। ত্রিশূলে ছিন্নমুণ্ড। চমৎকার শিল্পকলা।

অর্ধপ্রদক্ষিণ করে আমরা মন্দিরদ্বারে এলাম। ছোট চতুষ্কোণ মন্দিরদ্বার। তার পরে খানিকটা খালি জায়গা। এই অংশটিকে ক্ষুদ্র নাটমন্দিরও বলা যেতে পারে। দুদিকের দেয়ালে খোদাই কাজ।

একই আকারের আরেকটি দরজা পেরিয়ে আমরা গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করি। দরজার ওপরে শিবমূর্তি।

প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু নাতিবৃহৎ মন্দির। মন্দিরের মধ্যস্থলে বেশ বড় বেদির ওপরে বশীশ্বর মহাদেবের সুবিরাট লিঙ্গমূর্তি। চারিদিকের দেয়ালে প্রতিটি পাথরে কারুকার্য। পেছনের দেয়ালে পাঁচটি মূর্তি। খুবই সূক্ষ্ম তাদের শিল্পকলা—ভারী সুন্দর।

শান্ত সমাহিত মন্দির। নিয়মিত পূজা হয় কিনা বুঝতে পারছি না। তবে পূজার প্রমাণ কিছু কিছু রয়েছে ছড়িয়ে। পড়ে আছে শুকনো ফুল। আর রক্ষকহীন হলে মন্দির এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পারত না। কিন্তু এখন মন্দিরে কেউ নেই। পূজারী হয়তো আরও পরে আসেন।

হঠাৎ শিবের সামনে মেঝের ওপর বসে পড়ে মানসী। বলি, "এ কি, এখানে বসলে কেন?"

"বাঃ! এমন মন্দির, একবার শিবপুজো করব না?"

"কিন্তু শাড়ীটায় যে ধুলো লেগে গেল, নোংরা হল।"

"ধুলো লাগল, কিন্তু নোংরা হল না। মন্দিরের ধূলি অঙ্গে মাখলে মন পবিত্র হয়। যাক্ গে, তুমি আমার জন্য একটু কষ্ট করবে?"

"একটু কেন, অনেক কষ্ট করতে রাজী আছি যদি দেবী কিঞ্চিৎ প্রসন্না হন।"

"তথাস্তু।" মানসী বলে, "ওয়াটার-বটলটা নিয়ে বিপাশা থেকে একটু জল নিয়ে এসো।"

"জল দিয়ে কি হবে আবার?"

"শিবকে স্নান করাবো। আগে জানলে দুধ নিয়ে আসতাম।"

"সেজন্য জল আনার দরকার কি? জল তো রয়েছে ওয়াটার-বটলে।"

"আশ্চর্য! এই বুদ্ধি নিয়ে তুমি বই লেখো?"

নিজের নির্বুদ্ধিতার কারণটা বুঝতে পারছি না। কাজেই চুপ করে থাকি।

মানসী আবার বলে, "ট্যুরিস্ট বাংলোর কলের জল দিয়ে বশীশ্বর শিবকে স্নান করানো যায় না, বুঝলে বোকারাম।"

নীরবে বোতল হাতে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

জল নিয়ে ফিরে আসি মন্দিরে। চোখ বুজে বসে আছে মানসী। মহাদেবের ধ্যানমগ্না মানসী। পার্বতীও একদিন এমনি ধ্যানে বিভোর হয়ে ছিলেন। সে ধ্যান বিফল হয় নি। সেই থেকে কুমারীরা যুগে যুগে শিবপুজো করে শিবের কাছে শিবের মতো স্বামী কামনা করে আসছে। কায়মনোবাক্যে কামনা করলে ভোলানাথ নাকি মনস্কামনা পূর্ণ করেন। প্রার্থনা করি বশীশ্বর মানসীর প্রার্থনা পূরণ করুন। কিন্তু কে মানসীর সেই মনের মানুষ?

চোখ খোলে মানসী। আমার দিকে তাকায়।

"এনেছো?" সে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" আমি ওয়াটার-বটলটা এগিয়ে দিই।

উঠে দাঁড়ায় মানসী। সযত্নে শিবকে স্নান করায়। প্রণাম করে। প্রদক্ষিণ করে। তার পরে বেরিয়ে আসে মন্দির থেকে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

মন্দিরের দক্ষিণ গাত্রে গণেশমূর্তি—সিংহের ওপরে উপবিষ্ট। সিদ্ধিদাতা গণেশ। আমরা প্রণাম করি। তাঁর আশীর্বাদ না হলে যে মানুষের কোন যাত্রাই সফল হয় না। আমাদের মণিকরণ যাত্রা আনন্দময় হোক।

"কেবল আটটা বেজেছে। অনেক সময় হাতে আছে। চলো না একটু বিপাশার কাছে বসা যাক।" মানসী প্রস্তাব করে।

মন্দিরচত্বরের প্রান্তে, নদীর তীরে এসে বসি দুজনে। বসে বসে

বজৌরাকে দেখি। বজৌরা আর বিপাশা—ভারী সুন্দর। বিশাল সবুজ উপত্যকা—দূরে পাহাড়ের কালো রেখা। উপত্যকার বুকে বিপাশা—সদাচঞ্চল একটি রুপোলী রেখা।

হঠাৎ হেসে ওঠে মানসী। বিস্মিত হই। জিজ্ঞেস করি, "হাসছ কেন?"

"তোমার কথা ভেবে।"

"আমার ভাবনা তোমার হাসির উদ্রেক করল কেন?"

"সেদিন নাগর থেকে ফেরার পথে দূরত্ব বজায় রেখে সেই ঝরণার ধারে একটু বসতে চেয়েছিলাম, রাজী হও নি। আজ কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখেই বসে আছি। এখানেও কাছাকাছি কেউ নেই। আর সেদিনকার সেই ঝরণার কলতানের চেয়ে আজকের বিপাশার সঙ্গীত বেশি সুমধুর নয় কী?"

বজৌরা থেকে বাস ধরে বেলা নটার সময় ভুন্টার এলাম। পথের ধারে বিপাশার তীরে বিমানক্ষেত্র। তার পরেই বাজার। সেখানেই মণিকরণ পথের বাস-স্টেশন। আমরা বাস থেকে নেমে চা খেয়ে নিলাম।

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে একটি পথ চলে গেছে বিপাশার দিকে। বিপাশার ওপরে লোহার পুল। ছোট গাড়ি চলতে পারে। ছোট গাড়িই চলে ওপারে। আমরা পুল পেরিয়ে এলাম। এখানেও একটি বাজার। পুলের ধারে খানিকটা খালি জায়গা। সেখানেই মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্টের বাস-স্টেশন। বাস দাঁড়িয়ে আছে।

বাস দেখে মানসী বলে, "একে বাস বলছ কেন, এ তো জীপ।"

"জীপের চেয়ে একটু বড়। তবে এমনি বাসই চলাচল করে হিমাচলের অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে।"

ইচ্ছে ছিল ড্রাইভারের পাশের সিট দুটি দখল করব। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। এক পাঞ্জাবী নবদম্পতি বসে আছে সেখানে। বাধ্য হয়ে পেছনে উঠতে হয়। ভাগ্য ভাল, এক পাশের কোণটি এখনও খালি আছে। মানসী সেখানে বসল। আমি ওর পাশে বসি। সামনের পাঞ্জাবী নবদম্পতিকে লক্ষ্য করে মানসী বলে, "ভাল জায়গাটা নিয়ে নিলে ওরা।"

"ওদের প্রয়োজন যে আমাদের থেকে বেশি, ওরা সদ্য বিবাহিত।"

"আমাদের দেখেও তো সবাই তাই ভাবতে পারে।" মৃদু হেসে মানসী বলে।

"পারে নাকি ?"

"হ্যাঁ।"

"ভাবুক তাহলে।" আমি প্রসঙ্গটার ওপরে যবনিকা টেনে দিই।

বেলা দশটায় বাস ছাড়ল। দু'সারি সীটে দশজনের জায়গায় চোদ্দজন বসেছি। মাঝখানের খোলা জায়গায় আরও জন-পনেরো। একেবারে ঠাসাঠাসি অবস্থা। নড়াচড়ার উপায় নেই। পা রাখবার জায়গা নেই। এইভাবে বসে ১৯ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। দু'ঘণ্টার সফর। মানসীর খুবই কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু উপায় কি ? আসার সময় যেভাবেই হোক সামনের সীটে বসতে হবে।

অসমতল সংকীর্ণ চড়াই পথ বেয়ে বাস এগিয়ে চলেছে। মাঝে-মাঝেই জোরে জোরে দুলে উঠছে। আমরা একে অপরের গায়ের ওপর পড়ে যাচ্ছি।

বাঁদিকে বিপাশা, ডানদিকে পাহাড়। কিছুদূর এসে বিপাশা ও পার্বতীর সঙ্গম। পার্বতীর তীর দিয়ে পথ—মণিকরণের পথ।

ভুণ্টার থেকে ৬ মাইল এসে সারসারি, ৭ মাইল এসে ছানিখোর, ৯ মাইল এসে সারণি, ১০ মাইল এসে সাট, ১১ মাইল এসে ছাঞ্জাব, ১২ মাইল এসে জাহু ও ১৩ মাইল এসে বাগিয়াগু। ছোট-বড় গ্রাম। প্রত্যেক জায়গায় বাস থামল, ভিড় বাড়ল। কিন্তু বাস থেকে নামবার সুযোগ পেলাম না। একই ভাবে বসে আছি সেই থেকে। ভিড়ের চাপ বেড়েই চলেছে।

সওয়া এগারোটার সময় বাস এসে থামল জারীতে। আমরা ভুণ্টার থেকে ১৪ মাইল এসেছি। এতক্ষণে ড্রাইভারের দয়া হল। সে জানালো— এখানে দশ মিনিটের জন্য যাত্রাবিরতি। আমরা ইচ্ছে করলে বাস থেকে নেমে একটু হাত-পা খেলিয়ে নিতে পারি।

তাড়াতাড়ি পথে নেমে এলাম। বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম জারী। দোকানপাট, বাড়িঘর, ক্ষেতখামার আর আপেল বাগান। এখানে একটি বন-বিশ্রাম-গৃহ আছে। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পায়ে-চলা-পথ উঠে গেছে বিশ্রামগৃহে।

কেবল বড় নয়, সুন্দর গ্রাম জারী। উপত্যকার শেষে তুষারাবৃত একটি পর্বতশিখর। শিখরটি বড়ই সুন্দর। সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে।

আমরা পথে পায়চারি করতে থাকি। কথায় কথায় মানসী মালানার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি বলি, "নাগর থেকে যেমন চন্দ্রখানি গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে মালানায় যাওয়া যায়, তেমনি জারী থেকেও মালানা যাবার একটি পথ আছে। দুর্গম গিরি-প্রাচীরের অন্তরালে বিচিত্র গ্রাম মালানা।

গ্রামবাসীরা বলেন—রাজ্য, জামলুর রাজ্য। জামলু গ্রামের দেবতা। সারা গ্রামখানি দেবোত্তর। জামলুর নামেই গ্রামের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। চাষীরা দেবতার জমি চাষ করে ফসল দিয়ে দেয় দেবতার ভাণ্ডারে। গ্রামের কাঠ ও ওষধি বাইরে চালান যায়। টাকা জমা হয় দেবতার ভাণ্ডারে। সেখান থেকে সবাই ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ও বস্ত্র পেয়ে থাকে। এ নিয়ম চলে আসছে বহুকাল থেকে।

"মালানা কুলু উপত্যকায়। কিন্তু উপত্যকার সঙ্গে মালানার তেমন সম্পর্ক নেই। সেখানকার ধর্ম, সমাজ এমন কি ভাষা পর্যন্ত ভিন্ন। কুলুবাসীরা বলেন—জামলু দেবতা নয়, দানব। তাই জামলুকে নিমন্ত্রণ করা হয় না দশেরার সময়। কিন্তু মালানার মানুষরা বলেন—জামলু নিজের রাজ্য ছেড়ে কখনও বাইরে যান না, রঘুনাথজীর কাছে নতিস্বীকার করেন না।

"মালানার মানুষরা দাবী করেন—মহামতি আকবর জামলুকে ভক্তি করতেন। তিনি একটি সোনার হাতি প্রণামী দিয়েছেন জামলুকে। ছোট হাতিটি ওরা সবাইকে দেখায়। উৎসবের সময় এখনও তাঁরা রূপোর ঘোড়া কিংবা হাতি জামলুকে প্রণামী দেয়।

"অনেকের মতে জামলু মুসলমানের দেবতা। সন্দেহটা একেবারে অমূলক নয়। উৎসবের সময় এরা পাঁঠা কিংবা ভেড়াকে বলি না দিয়ে জবাই করেন। জামলুর কোন মন্দির কিংবা মূর্তি নেই মালানায়। সামনের দুর্গম পাহাড়টির প্রকাণ্ড একখানি পাথর দেখিয়ে বলেন—ওখানেই জামলু বাস করেন।

"জামলুর রাজ্য পবিত্র। তাই কেউ জুতো পরতে পারতেন না মালানায়। আগে বাইরের কোন লোক যেতেও পারতেন না সেখানে। বিদেশী দেখলেই গ্রামবাসীরা ঢিল মেরে তাঁদের তাড়িয়ে দিতেন। তবে সাধু কিংবা ভিক্ষুক হলে তাদের কিছু বলতেন না ওঁরা। বরং তারা এক বেলা খাবার ও একখানি করে কম্বল পেত জামলুর ভাণ্ডার থেকে। এ নিয়মটি নাকি এখনও চালু আছে।

"আগে আটজন গণ্যমান্য গ্রামবাসীকে নিয়ে এদের নিজেদেরই আদালত ছিল। তাঁদের সিদ্ধান্ত সবাই মেনে চলতেন।

"কুলুর কাছাকাছি জামলুর কিছু জায়গা-জমি আছে। মালানার অধিকাংশ মানুষরা গ্রীষ্মকালে সেখানে গিয়ে মাসখানেক কাটিয়ে আসেন। তাই বলে তাঁরা কুলুর মানুষের সঙ্গে বড় একটা মেলা-মেশা করেন না। কেন

করবেন, ওরা যে জামলুর বরপুত্র।"

বাসের শব্দে সচকিত হই। মালানার কথা ছেড়ে আমরা তাড়াতাড়ি এসে মণিকরণের বাসে উঠি। বাস চলতে শুরু করে।

ভুন্টার থেকে ১৫ মাইল এসে চুনখ্‌রা, ১৭ মাইল এসে জৈন নালা আর ১৯ মাইল এসে কসোল—বাসপথের প্রান্তসীমা। পৌনে বারোটার সময় ক্লান্তিকর বাসযাত্রার অবসান হল। আমরা তাডাতাডি নেমে এলাম পথে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

এখানে কোন জনপদ নেই। কেবল পথের বাঁদিকে নদীর ধারে দুটি চায়ের দোকান। পাশের পাহাড় কেটে গাডি ঘোরাবার জায়গা করা হয়েছে। ওপরে একটি বন-বিশ্রাম গৃহ আছে। এখানকার উচ্চতা ৫২০০ ফুট। পথের পাশে পাহাডের গায়ে বিজ্ঞাপন—

'আদর্শ কৃষিক্ষেত্র। মতিলাল, মণিকরণ।'

ভদ্রলোক কে জানি না। তবে তাঁর আদর্শ কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শনের সময় নেই। আমরা উষ্ণকুণ্ডে স্নান করতে এসেছি। বিকেলের বাসে ফিরে যেতে হবে।

বাসযাত্রায় যতি পডলেও, বাসপথ শেষ হয় নি এখানে। পথ আরও খানিকটা গেছে এগিয়ে। খাড়া পাহাড়ের গায়ে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেখানে গাড়ি ঘোরাবার জায়গা নেই। তাই গাডি আর এগিয়ে যায় না।

আমরা বড় রাস্তা ধরেই এগিয়ে চলি। রাস্তার ডাইনে পাইনবনে ছাওয়া সবুজ পাহাড আর বাঁয়ে বয়ে যাচ্ছে পার্বতী। হিমালয়দুহিতা পার্বতীর নামে শিবতীর্থ মণিকরণের মানস-নির্ঝরিণী।

পার্বতী এসেছিলেন মণিকরণে। এসেছিলেন তপস্যাচারী স্বামীর সঙ্গে। বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল তাঁদের। হঠাৎ একদিন পার্বতী দেখলেন তাঁর কানে মণিকুণ্ডল নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া গেল না। পাবেন কেমন করে? পার্বতীর কান থেকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল মণিকর্ণিকা—দুষ্প্রাপ্য কর্ণমণি। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষনাগ স্বর্গের সেই অমূল্য সম্পদ নিয়ে পাতালে চলে গেছে।

পার্বতীর আকুলতায় শঙ্কর ব্যাকুল হলেন। তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য দেখা দিল। তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। ত্রিভুবন কেঁপে উঠল। শঙ্কিত শেষনাগ নাগলোক থেকে তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে দিলেন মণিকর্ণিকা—মাটি ভেদ করে মণিকুণ্ডল এসে পড়ল পার্বতীর পায়ের কাছে, সঙ্গে এলো উষ্ণ কুণ্ডবারি। মণি পেয়ে উজ্জ্বল

হলেন পার্বতী। শান্ত হলেন শিব। ত্রিভুবন রক্ষা পেল।

মণিকর্ণিকা নিয়ে হর-পার্বতী চলে গেলেন কৈলাস। কিন্তু পাতালের সেই উষ্ণধারা আজও আসছে মর্ত্যলোকে। নাগলোকের সেই কুণ্ডবারিতে অবগাহন করে জীবন ধন্য করতে আমরা আজ মণিকরণ চলেছি।

পথের পাশে পাথরে পাথরে নানাজাতীয় মস আর রঙ-বেরঙের বনফুল। পার্বতীর কলতান, পাখির কলকাকলি আর প্রজাপতির অস্থির আনাগোনা। বড় ভাল লাগছে পথ চলতে।

অন্যান্য যাত্রীদের দেখাদেখি আমরাও বড় রাস্তা থেকে নেমে এলাম পাইন বনে। ছায়াঘন স্যাঁতস্যাঁতে পথ—সামান্য উৎরাই। বনের শেষে একটা ঝরণা। তার পরে বৃক্ষহীন প্রান্তরের ভেতর দিয়ে পথ। পথের পাশে প্রবহমানা পার্বতী। মোটরপথ প্রসারিত হবে। তারই আয়োজন চলছে। কসোল থেকে মণিকরণ আড়াই মাইল।

কসোল থেকে দেড় মাইল এসে পার্বতীর পুল। মোটরপথ এই পর্যন্ত আসবে।*

পুল পেরিয়ে পার্বতীর পরপারে এলাম। পার্বতী এখন আমাদের ডানদিকে। এখন আর আগের মতো সমতল ও প্রশস্ত পথ নয়। পাহাড়ের গা দিয়ে সংকীর্ণ চড়াইপথ। নিচে বয়ে যাচ্ছে পার্বতী।

চড়াই ভেঙে শ্রান্ত হয়ে পড়ে মানসী। পথের পাশে একখানি পাথরে বসে পড়ে সে। হেসে বলি, "এই সামর্থ্য নিয়েই মাউন্টেনিয়ার হতে চাও!"

"আমি মাউন্টেনিয়ার হতে চাই, একথা কে বলল তোমাকে?" হাঁফাতে হাঁফাতে মানসী বলে।

"সেদিন মানালীতে অতো খোঁজখবর করলে।"

"খোঁজ করলেই বুঝি ট্রেনিং নিতে হয়। তুমি সত্যিই বড্ড বোকা।"

হাসতে হাসতে বলি, "অথচ আশ্চর্য, সংসারে এত বুদ্ধিমান মানুষ থাকতে এই বোকার সঙ্গেই তুমি শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব করলে।"

"এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?" মানসী গম্ভীর।

আমি ওর দিকে তাকাই।

মানসী বলে, "আমি যে তোমার চেয়েও বোকা।"

আমি হেসে উঠি। মানসীও আমার সঙ্গে যোগ দেয়। হাসি থামলে

* কয়েক বছর হল এই পর্যন্ত বাস যাচ্ছে।

জিজ্ঞেস করে, "পরশু বিকেলে কুলুর পথে চলতে চলতে বলেছ ওয়াজিরী রুপি, ধর্মগঙ্গা আর রসকুণ্ডের কথা। কিন্তু বল নি, তার পরে কি আছে? রসকুণ্ডেই নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যায় নি পার্বতী উপত্যকা?"

"না।" উত্তর দিই, "তার পরে পালগা—একটি পাহাড়ী গ্রাম। মণিকরণ থেকে সাত-আট মাইল। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। বেশ বড় একটি বন-বিশ্রাম-গৃহ আছে সেখানে।"

"তারপরে?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"তার পরে আর তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নেই। তবে পার্বতীর তীর ধরে তুমি যেতে পারো এগিয়ে। পৌঁছুতে পারো স্পিতি উপত্যকায়। কাজটা অবশ্য মোটেই সহজ নয়। খুবই দুর্গম পথ। তবে পথ আছে।"

"দরকার নেই বাপু সে-পথে গিয়ে, মণিকরণ যেতেই যে জান কবুল করতে হচ্ছে।" মানসী উঠে দাঁড়ায়। আবার চড়াই ভাঙতে শুরু করি।

চড়াইপথের শেষে একটি কাঠের তোরণ। কিছুদিন আগে কোন কারণে কাঠ ও কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই তোরণ। বর্ষায় ও বাতাসে কাপড় ছিঁড়ে গেছে। তবে একটি খুঁটির সঙ্গে গৈরিক পতাকাটি এখনও উড়ছে। আর একটি খুঁটির সঙ্গে রয়েছে কেরোসিনের আলো। তোরণ থেকে পথের দুদিকেই বাগান ও ক্ষেত—ফুল, ফল ও শাক-সবজীর বাগান।

বাগানের শেষে পথের ডানদিকে পার্বতীর তীরে বাড়ি-ঘর। প্রথম ঘরখানিতে সরকারী দাতব্য-চিকিৎসালয়। ঘোড়া দেখলে সবাই খোঁড়া হয় কিনা জানি না, তবে আমরা কলকাতাবাসীরা হিমালয়ে গিয়ে ডাক্তারখানা দেখলে অসুস্থ হই। মানসী দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করে।

ডাক্তারবাবু সপ্রশ্ন নয়নে তার দিকে তাকায়। মানসী হিন্দীতে বলে, "একটা ওষুধ দিন তো।"

"কি হয়েছে আপনার?" ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করেন।

"চড়াই পেরোবার সময় বড্ড বুক ধড়ফড় করে।" মানসী উত্তর দেয়।

ডাক্তারবাবু মৃদু হেসে বলেন, "চড়াইপথে সবারই শ্বাসকষ্ট হয়, ওর জন্য আমার কাছে কোন ওষুধ নেই। দোকান থেকে টফি লজেন্স কিনে নেবেন।"

ডাক্তারবাবুর কথায় হাসি পাচ্ছে আমার। কিন্তু হাসতে পারছি না। মানসী রেগে যাবে।

মানসী কিন্তু মোটেই ঘাবড়ে যায় না। সে পাল্টা দাবী জানায়, "তাহলে আমাকে একটু হজমের ওষুধ দিন।"

এবারে ডাক্তারবাবু আর আপত্তি করতে পারেন না। উঠে গিয়ে আলমারি থেকে কয়েকটি কালো বড়ি এনে মানসীর হাতে দেন। তার পরে একখানি খাতা খুলে তাকে বলেন, "এখানে নাম-ঠিকানাটা লিখে ঐ দরিদ্র ভাণ্ডারের বাক্সে কয়েকটা পয়সা ফেলে দিন।"

মানসী ব্যাগ খুলে একটি টাকা ও কলম বের করে। টাকাটা বাক্সে ফেলে দিয়ে কলম খুলে খাতাটা টেনে নেয়। আমি তার কাছে এগোতেই আমাকে দেখিয়ে ডাক্তারকে বলে, "ডগদারসাব, এনাকে নাম লিখতে দেবেন না, ইনি ওষুধ নেন নি।"

হো হো করে হেসে ওঠেন ডাক্তার।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের পরেই একটি নির্মীয়মাণ দোতলা বাড়ি। কাঠ পাথর আর টিনের বাড়ি। আগামীদিনের ধর্মশালা।

মূল-পথটি প্রসারিত হয়েছে সামনে—গিয়েছে বাজারে ও গ্রামে। বাজারের পরে পার্বতীর তীরে ও পাহাড়ের গায়ে গ্রাম—প্রাচীন গ্রাম। এখন একষট্টি ঘর গৃহস্থ বাস করেন। এখানকার উচ্চতা ৫৭০০ ফুট।

গুরু নানক জনৈক শিষ্যের সঙ্গে মাণ্ডি হয়ে সুমেরু পর্বতে যাচ্ছিলেন। পথে তিনি এলেন এখানে। তখনও ছিল এই গ্রাম। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ না করে তিনি এসে বসলেন উষ্ণকুণ্ডের কাছে, একখানি পাথরের ওপরে। পথশ্রমে ক্লান্ত শিষ্য বললেন, গুরুদেব বড়ই খিদে পেয়েছে।

গুরু বললেন, এই তো তোমার সামনেই ধূমায়মান উষ্ণকুণ্ড। রুটি বানিয়ে কুণ্ডে ফেলে দাও।

তাই করলেন শিষ্য। কিন্তু সব রুটি গেল ডুবে। শিষ্য মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

গুরু নানক হেসে বললেন, হরিহরকে বল, আমরা ক্ষুধার্ত। প্রার্থনা কর, তিনি যেন একখানি রুটি রেখে বাকি সব রুটি দিয়ে দেন আমাদের।

কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিলেন শিষ্য। সঙ্গে সঙ্গে সব রুটি ভেসে উঠল। শিষ্য একখানি রুটি কুণ্ডে রেখে বাকি সব তুলে নিলেন। ভাসমান রুটিখানি আবার তলিয়ে গেল।

শিষ্য বললেন, দেবভূমি মণিকরণ।

গুরুদেব বললেন, হ্যাঁ। কলিযুগের শেষে, সত্যযুগের আরম্ভে তোমার পুনর্জন্ম হবে, তুমি এসে বাস করবে এখানে।

শিষ্য প্রণাম করেন গুরুদেবকে।

গুরু নানক যে পাথরখানির ওপর বসেছিলেন, সেখানি এখনও আছে এখানে। তিনি পরদিন ক্ষীরগঙ্গা ও মানতালাই হয়ে রওনা হয়েছিলেন সুমেরু পর্বতের দিকে।

গুরুগোবিন্দ সিংও অনেক শিষ্যকে নিয়ে মণিকরণ এসেছিলেন।

তাই মণিকরণ হিন্দুতীর্থ হলেও শিখদের পবিত্রভূমি। যাত্রীদের মধ্যে শিখদের সংখ্যাই বেশি। একজন শিখ সন্ন্যাসী এখন মণিকরণবাবা নামে পরিচিত। তাঁর নাম সন্ত নারায়ণ হরিজী। প্রায় তিরিশ বছর আগে তিনি এখানে এসে মণিকরণের উন্নয়নে আত্মোৎসর্গ করেছেন। মনে পড়ছে ভারমৌরের জয়কৃষ্ণ গিরিমহারাজের কথা।* এঁরা না হলে হিমালয় আজ তীর্থময় হয়ে উঠতে পারত না।

মূল-পথ থেকে নির্মীয়মাণ ধর্মশালার ভেতর দিয়ে এক সারি সিঁড়ি নেমে গেছে পার্বতীর বেলাভূমিতে। সেই সিঁড়ি বেয়ে আমরা নেমে এলাম সন্তজীর আশ্রমে। ডানদিকে কুণ্ড, বাঁদিকে আশ্রম। আশ্রমের কাছে উষ্ণকুণ্ডের উৎস। মাটির নিচ থেকে গরম জল ওপরে উঠে আসছে। টগবগ করে জল ফুটছে, ধোঁয়া উঠছে। জলের তাপমাত্রা ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহিট্। এটি বিশ্বের উষ্ণতম উষ্ণপ্রস্রবণ।

পার্বতীর তীরে কাঠা-পাঁচেক পাথর বাঁধানো জায়গা। তারই ভেতরে সব—ধর্মশালা, আশ্রম, সেবক-সেবিকাদের নিবাস, মন্দির ও কুণ্ড। উৎস থেকে অধিকাংশ উষ্ণজল গিয়ে পার্বতীতে পড়ছে। আর একটি ক্ষীণধারায় উষ্ণজল এসে পড়ছে কুণ্ডে। একটি নয়, দুটি কুণ্ড। প্রথমটি রান্নার, দ্বিতীয়টি স্নানের। এখানে উনুন জ্বলে না। সব কিছুই কুণ্ডে রান্না হয়। ঘড়ি ধরে রান্না করতে হয়। যেমন ভাত, ডাল, রুটি, তরকারি রান্না করতে আধ ঘণ্টা লাগে। ক্ষীর তৈরি হয় এক ঘণ্টায় আর মিষ্টান্ন রাঁধতে লাগে দু' ঘণ্টা।

স্নানের কুণ্ডটি বিশালতর। দুটি অংশে বিভক্ত। বাঁয়ে ছেলেদের ও ডাইনে মেয়েদের স্নান করার জায়গা। মেয়েদের অংশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাঁধানো জায়গার মাঝখানে বাঁধানো কুণ্ড। কুণ্ডের চারিদিকও পাথর বাঁধানো। পার্বতীর দিকে কোমর-সমান রেলিং—স্নানার্থীরা যাতে পড়ে না যায়। নিচে বিক্ষুব্ধা পার্বতী। এইদিক থেকেই সিঁড়ি নেমে গেছে কুণ্ডের জলে।

---

* লেখকের 'হিমতীর্থ-হিমাচল' দ্রষ্টব্য।

উষ্ণকুণ্ডের উৎসের কাছে পার্বতীর তীরে মন্দির। ছোট দোতলা পাথরের মন্দির। মন্দিরশীর্ষে ত্রিশূল ও গৈরিক পতাকা। ওপরতলার চারিদিকে কাঁচের দেওয়াল। ভেতরে শ্বেতপাথরের বিষ্ণুমূর্তি। নিচের তলায় শিবলিঙ্গ। ওপরে ঝুলিয়ে রাখা একটি পেতলের ঘড়া থেকে সর্বদা ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে মহাদেবের মাথায়। মন্দিরগাত্রে লেখা রয়েছে—

'তত্ত্ব মসি, অহং ব্রহ্মা। দান ধর্ম সৎসঙ্গ বিচার।'

পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

কিন্তু এ সবই সন্ত নারায়ণ হরিজীর অবদান। তিনি আসার আগে মণিকরণ ছিল একটা নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর স্থান। ধূমায়মান উষ্ণ প্রস্রবণের চারিপাশে সর্বদা স্নানার্থী ও ধোবাদের ভিড় লেগে থাকত। অথচ তখনও সাত-আটটি ছোট ছোট মন্দির ছিল এখানে। বহু দূর থেকে তীর্থযাত্রীরা আসতেন। কিন্তু কেউ মণিকরণের উন্নয়নে মনোযোগী হতেন না। সন্তজী না এলে আজও হয়তো মণিকরণ তেমনি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকরই থেকে যেত।

সন্তজী বসেছিলেন আশ্রমের সামনে। সৌম্যদর্শন কর্মযোগী মহাপুরুষ। আমরা তাঁকে প্রণাম করি। তিনি আশীর্বাদ করেন, "তোরা সুখী হ'। তোদের সংসার সুন্দর হোক্।"

নীরব থাকা ছাড়া উপায় কি? আমি নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু নীরব থাকে না মানসী। সে বলে, "আমরা কলকাতা থেকে আসছি।"

"খুব খুশি হলাম। হরিহরজী তোদের মনস্কামনা পূর্ণ করুন। কিন্তু আর দেরি নয়, অনেক বেলা হল। এখন স্নান করতে চলে যা। ভাল করে স্নান করিস। শরীরের ব্যথা-বেদনা, সর্দি-কাশি সব সেরে যাবে। কিন্তু ঝুপ করে আবার জলে নামিস না যেন। একটু একটু করে গরম জল গায়ে সইয়ে নিস। তোরা স্নান করে আসার মধ্যে আমার রান্না হয়ে যাবে।"

আমরা কুণ্ডের তীরে আসি। এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুবিন্যস্ত উষ্ণকুণ্ড আর কোথাও দেখিনি।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে জল থেকে উঠে এলাম। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। মন হয়ে উঠেছে প্রফুল্ল। মণিকরণের অমৃতধারায় দেহের অবসাদ দূর হয়েছে, মনের পাপ ধুয়ে গেছে।

একটু বাদে মানসী আসে। ভিজে কাপড় শুকোতে দিয়ে আমরা আশ্রমে আসি। বাসযাত্রীদের অনেকেই খেতে বসে গেছেন। আমরাও

বসে পড়ি তাঁদের পাশে। সন্তজী নিজে পরিবেশন করেন—ভাত ডাল ও আচার। তাই অমৃত মনে হচ্ছে। মণিকরণ যে অমৃতময়। কলিযুগের শেষে ও সত্যযুগের সূচনায় ভগবান প্রকট হবেন এই পরম-পবিত্র তীর্থে। মণিকরণ দর্শন করলে সকল তীর্থদর্শনের ফললাভ হয়।

খাবার পরে সন্তজী এক গ্লাস গরম চা হাতে দিলেন। বললেন, "আজই চলে যাচ্ছিস। অনায়াসে দু-একটা দিন থেকে যেতে পারতিস। বিছানাপত্র দিতে পারতাম। কোন অসুবিধে হত না।"

সবিনয়ে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে সন্তজীকে প্রণাম করি। মানসী একখানি পাঁচ টাকার নোট তাঁর পায়ের কাছে রাখতেই তিনি বলে ওঠেন, "এ আবার কেন?"

মানসী বিনীত স্বরে বলে, "ঠাকুরসেবার জন্য বাবা, নইলে আপনার ঠাকুরসেবা চলবে কেমন করে?"

"ঠাকুর যে নিজেই তাঁর ব্যবস্থা করে নেন মা! নইলে আমাদের সাধ্য কি, তাঁর সেবা করি।"

সন্তজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা উঠে আসি রাস্তায়। এগিয়ে চলি কসোলের পথে। বিকেল পাঁচটায় ভুণ্টারের বাস ছাড়বে।

তোরণের কাছে একটু দাঁড়াই। আর একবার ভাল করে দেখে নিই—মনিকর্ণিকার তীর্থমণি, নররূপী নারায়ণের নিবাস। মণিকরণকে প্রণাম করি।

মানসীর সঙ্গে ফিরে চলি নিজেদের পথে। আমাদের জীবন যে মায়ার বাঁধনে-বাঁধা। সন্তজীর মতো নরনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করার সাধ্য কোথায়? তীর্থ থেকে তাই আমাদের ফিরে যেতে হয় ঘরে।

॥ চোদ্দ ॥

গতকালের মতো আজও সকাল সাতটায় বাস ছাড়ল—একই বাস। এই বাসে করেই কাল গিয়েছিলাম বজৌরা আর আজ চলেছি যোগিন্দর নগর। পথে মাণ্ডিতে বাস বদল করতে হবে। মাণ্ডি থেকে এ বাসটা চলে যাবে চণ্ডীগড। আমরা পাঠানকোটের বাস ধরে যোগিন্দর নগর যাবো।

কালকের যাওয়া আর আজকের যাওয়ার মাঝে অনেক তফাৎ। কাল আমরা বজৌরা ও মণিকরণ দেখে ফিরে এসেছিলাম কুলু। কিন্তু আজ কুলু

থেকে চলে যাচ্ছি। মানসীর সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়েছি যে রমণীয় শৈলাবাসে, আজ চলে যাচ্ছি তাকে ছেড়ে। সে দিনগুলি আর আসবে না ফিরে।

কুলু থেকে যোগিন্দর নগর ৭৮ আর মাণ্ডি ৪০ মাইল। এ বাসটা আসছে মানালী থেকে, যাবে চণ্ডীগড়। মানালী থেকে চণ্ডীগড় যাবার দুটি পথ। একটি মাণ্ডি ও ভাতাপানি হয়ে। আর একটি নারকাণ্ডা হয়ে। দুটি পথ সিমলায় গিয়ে এক হয়েছে। নারকাণ্ডার বাসে যাওয়া যায় রামপুর ও কালপা। যাওয়া যায় হাতকোটি ও চারগাঁও।

"কি ভাবছ?"

মানসীর প্রশ্নে আমার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে যায়। বলি, "হিমাচলের কথা।"

"আমিও তো তাই শুনতে চাইছি। ভাবনাকে তাহলে ভাষায় রূপ দাও।"

হেসে বলি, "মণিমহেশ যাত্রার কথা তো বলা শেষ হয়েছে। আবার কি শুনতে চাইছ?"

"মণিমহেশ যাত্রার কথা শেষ হলেও তোমার যাত্রাপথ যে শেষ হয় নি।"

"হ্যাঁ। তারপরে আমরা রোতাং পেরিয়ে গিয়েছিলাম লাহুল উপত্যকায়। কিন্তু রোতাং-য়ের কথা তো সেদিন বলেছি তোমাকে।"

মানসী চুপ করে থাকে।

আর আমি নীরবে কুলু উপত্যকার অনিন্দ্যসুন্দর রূপের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কতক্ষণ পরে ঠিক বলতে পারব না। তবে বহুক্ষণ সন্দেহ নেই। মানসীর প্রশ্নে ফিরে আসি বাস্তবে। সে জিজ্ঞেস করে, "নদীর ওপারে অমন সুড়ঙ্গ কাটছে কেন?"

বিপাশার তীর দিয়ে চলেছে আমাদের বাস। আমরা কুলু থেকে মাণ্ডি চলেছি। এখানে বিপাশা বাঁধের কাজ চলেছে। তাই দেখে মানসী প্রশ্নটা করেছে।

উত্তর দিই, "বিপাশা বাঁধ প্রকল্প। ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এটি ভাকরার চেয়ে বড় প্রকল্প। ৭০০০ লোক কাজ করছেন। সব মিলিয়ে পাঁচটি টানেল কাটা হবে। সেগুলির ব্যাস হবে ৩৫ ফুট ও মোট দৈর্ঘ্য হবে ১৬,৫০০ ফুট।

"পাণ্ডো এবং পং-য়ে দুটি বাঁধ নির্মিত হচ্ছে। পং বাঁধটি হবে ৩৮০ ফুট

উঁচু ও ৫৭৫০ ফুট দীর্ঘ—ভারতের বৃহত্তম মাটির বাঁধ। জলাধারটি নির্মিত হবে একশ' বর্গমাইল জায়গা জুড়ে। কাংড়া জেলার ২৫০টি পাহাড়ী গ্রাম তলিয়ে যাবে সেই জলে। ১৯৬২ সালে এই বাঁধের কাজ শুরু হয়েছে আশা করা যায় ১৯৭১ সালের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে।

"পাণ্ডো বাঁধটি হবে এখানে। ওপারে পাহাড় কেটে জলপথ তথা টানেল তৈরি হচ্ছে। এর ভেতর দিয়ে জল নিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত করা হবে। তার পরে বাঁধ নির্মিত হবে। পাণ্ডো বাঁধটি হবে ৩৮১ ফুট উঁচু ও ৬৩৯৭ ফুট দীর্ঘ। জলাধারটি ৬৬ লক্ষ একর ফুট জল ধারণ করতে পারবে।

"বিপাশা বাঁধ প্রকল্প প্রায় সাড়ে ছ' লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করবে। হিমাচল হরিয়ানা পাঞ্জাব, এমন কি রাজস্থানের খালে পর্যন্ত এখান থেকে জল সরবরাহ করা হবে।"

পাণ্ডো পুল পেরিয়ে আমাদের বাস মাণ্ডি শহরে প্রবেশ করল। পুলটি দুর্বল বলে বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পুল পেরোতে হল। এক কালে মাণ্ডি ছিল স্বাধীন রাজ্য। ছিল সুরম্য শৈলপুরী। রাজবাড়ি এখনও আছে, কিন্তু মাণ্ডি তার ধ্যানগম্ভীর রূপটি ফেলেছে হারিয়ে। মাণ্ডি হিমাচলের প্রায় কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। তিন হাজার ফুট উঁচু একটি বিশাল জনপদ। এখান থেকে বাস যায় হিমাচলের সর্বত্র। হিমাচলের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবহন সংস্থা মাণ্ডি-কুলু রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র মাণ্ডি। মাণ্ডি এখন জনবহুল ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত।

বেলা দশটায় স্ট্যাণ্ডে এসে নিশ্চল হল আমাদের বাস। কুলু থেকে মাণ্ডি ৪০ মাইল। তিন ঘণ্টা লেগেছে।

মালপত্র নামাবার পরে মানসী বলে, "তুমি একটু দাঁড়াও এখানে, আমি জেনে আসছি কোন্ বাসটা যোগিন্দর নগর যাবে আর কখন ছাড়বে?"

"বাসের খবর নিতে তুমি যাবে কেন?" আমি আপত্তি করি, "তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি জেনে আসছি।"

"কেন, পৌরুষে আঘাত লাগছে?"

"তা একটু লাগছে বৈ কি।"

"লাগুক।" মানসী বলে, "নইলে যে পৌরুষটা মরে যাবে।"

"তুমি তো তাকে মেরে ফেলতেই চাইছ।"

মানসী চট করে কোন জবাব দেয় না। কি জানি একটু ভাবে। একটু বাদে বলে, "শিভ্যালরির যুগ যে বহু যুগ হল গত হয়েছে।"

"কথাটা আমার অজানা নয়।"

"তাহলে, আমাকে অবলা ভাবছ কেন? তোমার সঙ্গে দেখা হবে জেনে তো আমি পথে বের হই নি সখা!"

কি বলব? আমি চুপ করে থাকি। মানসী এগিয়ে আসে কাছে। জিজ্ঞেস করে, "রাগ করলে?"

"না। রাগ করব কেন?"

"তাহলে আমি যাই, তুমি একটু দাঁড়াও এখানে। কেমন?"

হাসিমুখেই বলি, "বেশ যাও। তাড়াতাড়ি এসো।'

"আচ্ছা।" খুশিমনে মানসী চলে যায়।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। একটু বাদে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে যায় মানসী। অনেক চেষ্টা করেও আর তাকে খুঁজে পাই না। কেমন একটা অভাব বোধ করতে থাকি। অথচ জানি এ অদর্শন ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু স্থায়ী অদর্শনের দিনও যে দূরাগত নয়।

মানসী ফিরে আসে। বলে, "পাশের বাসটাই যোগিন্দর নগর যাবে। আধঘণ্টা বাদে ছাড়বে। মাল চাপিয়ে দিয়ে চলো খেয়ে আসা যাক।"

বাস স্ট্যাণ্ডের পাশেই অনেকগুলি হোটেল ও রেস্তোরাঁ। কাজেই মনমত খাবার খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না মানসীর। বেশ বড় হোটেল। ছোট ছোট টেবিলের দু-পাশে চারখানি করে চেয়ার। সব টেবিলেই লোক। একটা টেবিলে দুটি জায়গা রয়েছে। আমরা সেখানে এসে বসি।

বেয়ারা খাবার নিয়ে আসে—ভাত, ডাল, তরকারি ও দই। মানসী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "মাছ কোথায় গেল? মাছের কথা বলে এলাম যে।"

"নিয়ে আসছি মেমসাব।" বেয়ারা চলে যায়।

মানসী বলে, "খুব ভাল মাছ, বুঝলে। অনেকদিন এমন ট্রাউট মাছ খাওনি।"

আমি ঘাড় নাড়ি। খেতে শুরু করি।

বেয়ারা মাছ নিয়ে আসে। মাছ দেখে মানসী খুশি হয়। তরকারি দিয়ে ভাত মেখে নিয়েছিল। মাখাভাত একপাশে সরিয়ে রেখে পাতের ওপরে মাছের বাটি উপুড় করে। তার পরেই বলে ওঠে, "আরে বাবা, এত বড় মাছ! এ আমি খেতে পারব না।"

হাসি পায় আমার। বলি, "এই তো মাছের জন্য হা-হুতাশ করছিলে।"

"তা করছিলাম, কিন্তু এত বড় মাছ আমি খেতে পারব না।……তুমি

অর্ধেকটা খেয়ে নাও।"

আমি কোন প্রতিবাদ করতে পারার আগেই মানসী অর্ধেকটা মাছ আমার পাতে দিয়ে দেয়। আমাদের উল্টোদিকে বসে যে অবাঙ্গালী ভদ্রলোকেরা খাচ্ছেন, তাঁরা মৃদু হাসছেন। আমি বিব্রত বোধ করি মানসী" আচরণে। তবু চুপ করে থাকি।

"এই দেখো, কি করে ফেললাম।" মানসী অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠে "তোমার খাওয়াটাই মাটি করে দিলাম।"

"না।" বাধ্য হয়ে বলতে হয় আমাকে, "কি আর এমন করেছ?"

"আমার এঁটো মাছ তোমার পাতে দিয়ে ফেললাম যে।" একবার থাে মানসী। তার পরে বলে, "কেন যেন মাঝে মাঝে আমার এমনি ভুল হে যায়। জানো, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে এটা আমাদের কলকাতাং বাড়ির ডাইনিং টেবিল নয়, মাণ্ডির হোটেল আর আমার পাশে তুমি আমি বাড়িতে বাবা ও দাদাদের পাশে খেতে বসে এমনি করি কিনা।"

হেসে বলি, "অভ্যেসটা ভাল নয়।"

"জানি। কিন্তু ছাড়তে পারি না।"

আমি নিঃশব্দে খেতে থাকি। মানসীও আহারে মনোনিবেশ করে।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ মুখ তোলে মানসী। আমার দিকে তাকিয়ে বলে "আমি ব্রাহ্মণকন্যা। আমার পাতেরটা খেলে তোমার জাত যাবে না। তুমি অনায়াসে ঐ মাছটুকু খেয়ে নিতে পারো।"

"তাই তো খেয়ে নিচ্ছি।"

বেলা এগারোটায় বাস ছাড়ল। আমরা মাণ্ডি থেকে যোগিন্দর নগর চলেছি।

জনবহুল শহুরে পথ। ধীরে ধীরে বাস চলেছে। বাজার ছাড়িয়ে রাজবাড়ির সামনে বাস থামল। এখানেও পথের পাশে দোকানের সারি। পথটা খুবই প্রশস্ত। পথের ওপাশে প্রাসাদ—মাণ্ডির রাজপ্রাসাদ। সেকালে সামনের দিকটা কাছারী হিসেবে ব্যবহৃত হত আর পেছনের দিকে ছিল তোষাখানা, অস্ত্রাগার এবং মহাদেও মন্দির। কারুকার্য সমন্বিত সুন্দর ও প্রাচীন মন্দির।

মনে পড়ছে হতভাগ্য রাজা পৃথ্বীপালের কথা। প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা

ছিলেন তিনি। মাণ্ডিরাজ সিধ সেন তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কোন কারণে দুজনের মাঝে মনোমালিন্য হয়। তবু শ্বশুর জামাতার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করলেন না। মেয়েকে একবার দেখতে পাবার লোভ সামলাতে পারলেন না। তিনি এলেন এখানে। এই প্রাসাদে।

কিন্তু আর যেতে পারেন নি ফিরে। বিশ্বাসঘাতক জামাতা স্নেহপ্রবণ শ্বশুরকে হত্যা করেছিলেন এই প্রশস্ত পথেরই কোন স্থানে।

দুজন যাত্রী তুলে নিয়ে বাস আবার চলল এগিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা শহরের জনবহুল অংশ ছাড়িয়ে বিপাশার পাশে এলাম। বিপাশা বেশ প্রশস্ত এখানে। পথের নিচে বেলাভূমিতে অসংখ্য মন্দির। ছোট ছোট মন্দির, প্রায় একই ধরনের। তবে বেশ মজবুত এবং সুন্দর। অধিকাংশই শিবমন্দির। বাস থেকে ছবির মতো দেখাচ্ছে।

এখানে একটি ভারী সুন্দর জাপানী মন্দির ছিল। গত বছর বিপাশার বন্যায় ভেঙে গেছে। অন্যান্য মন্দিরের অবস্থাও জরাজীর্ণ। এক যুগের জনপ্রিয় শিল্পসৃষ্টি আর এক যুগের অবহেলায় ক্ষীয়মাণ।

পুল পেরিয়ে বাস এপারে এলো। পাণ্ডোপুল থেকে এই পুল পর্যন্ত মাণ্ডি শহর। আমরা শহরের বাইরে এসেছি। এখনও বিপাশা রয়েছে পাশে। কিন্তু একটু বাদেই তার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটবে। সে আমার চোখের আড়ালে চলে যাবে।

হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "কি ভাবছ?"

"বিপাশার কথা। যাবার পথে এখানেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা। তার পর থেকে বহুদিন সে ছিল আমার সঙ্গে। আমি তার উৎস দর্শন করেছি। কিন্তু আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূরে।"

"তুমি বুঝি বিপাশাকে ভালোবেসে ফেলেছো?"

"হ্যাঁ।"

"ভালোবাসলেই তাকে চিরকাল কাছে ধরে রাখতে হবে, তার কি মানে আছে সখা? কথাসম্রাটের সেই কথাটি কখনই ভুলে যেও না, 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।"

যোগিন্দর নগর বাস স্ট্যাণ্ডে এসে থামল আমাদের বাস। এটি শহরের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল। সামনেই বাজার ও রেলস্টেশন। পথের দু-পাশে

সারি সারি দোকান আর হোটেল।

আমরা একটা চায়ের দোকানে এলাম। দোকানদার রাজী হলেন মালপত্র রাখতে।

চা খেয়ে দোকানের বাইরে আসি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখন কোথায় যাবে?"

"উল হাইডেল পাওয়ার স্টেশনে, হলেজওয়েতে চড়ার অনুমতি সংগ্রহ করতে। আড়াইটে বেজে গিয়েছে, পাঁচটায় অফিস বন্ধ হয়ে যাবে।"

"ডাকবাংলোয় কখন যাবো?"

"ফেরার পথে।"

তাড়াতাড়ি পা চালাই। বাস স্ট্যাণ্ড থেকে পাওয়ার স্টেশন প্রায় এক মাইল। পথের পাশে বাড়িঘর ও দোকানপাট। তারপরে ফাঁকা মাঠ। মাঠের শেষে বাস-রাস্তার ডাইনে পাওয়ার স্টেশনের প্রাইভেট রোড। সেই রাস্তায় খানিকটা এসে গেট। বন্দুকধারী প্রহরী পরিচয় জিজ্ঞেস করে। সব বলার পরে ক্যামেরাটি জমা নিয়ে ভেতরে যাবার অনুমতি দেয়। এটি সংরক্ষিত এলাকা। এখানে ছবি তোলা নিষেধ।

একটু এগিয়েই পাওয়ার স্টেশনের বিরাট বাড়ি। ভেতরে জেনারেটার চলেছে। এটি এশিয়ার একক বৃহত্তম এবং প্রাচীনতম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। গুমগুম শব্দে চারিদিক প্রকম্পিত। বাঁধানো পথের নিচ দিয়ে জল গিয়ে পড়ছে পাশের পাহাড়ী নদীতে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরে উল নদীর জল যোগিন্দর নগরবাসীদের তৃষ্ণা নিবারণ করছে। আগামীকাল এই জলধারার উৎস দর্শন করতে যাবো।

আমরা অফিসে এলাম। জনৈক কর্মচারীকে নমস্কার করতেই তিনি প্রতিনমস্কার করে বসতে বলেন। আমরা তাঁর সামনে বসি। আমাদের উদ্দেশ্য বলি।

ভদ্রলোক স্ট্যাম্প লাগানো একখানি ফর্ম আমাকে দিয়ে বলেন, "দেড়টা টাকা দিন আর এই বণ্ডটা সই করুন।"

কাগজখানিতে লেখা আছে—হলেজওয়ের ট্রলিতে আরোহণকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটলে, তার জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হবেন না।

ভদ্রলোক বোধ হয় আমাদের নির্ভয় করবার জন্যই আবার বলেন, "আজ পর্যন্ত কোন দুর্ঘটনা ঘটে নি, তবু আমরা এটা সই করিয়ে নিই। ট্রলি চড়ার জন্য কোন ভাড়া নিই না। কারণ ট্রলি তো রোজই যাতায়াত করছে।

আমাদের লোকজন ও মালপত্র নিয়ে যাচ্ছে। কেবল এই বণ্ডের স্ট্যাম্প খরচ বাবদ জনপ্রতি দেড় টাকা দিতে হয়।"

তিনটা টাকা তাঁর হাতে দিয়ে বলি, "আর একখানি ফর্ম দিন, আমরা দুজন।"

ভদ্রলোক একটু হাসেন। দেড়টা টাকা আমাকে ফেরত দিযে মানসীকে দেখিয়ে বলেন, "ওঁর আলাদা বণ্ড লাগবে না।"

"কেন?" বিস্মিত হই।

"স্বামী সঙ্গে থাকলে স্ত্রীকে কোন বণ্ড দিতে হয় না। আপনার নাম সই করে পাশে শুধু লিখে দিন—উইথ ওয়াইফ।"

মানসীর দিকে তাকাই।

মানসী শান্ত স্বরে বাংলায় বলে, "আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখছ? যা বলছেন ভদ্রলোক, তাই লিখে দাও।"

পারমিট নিযে অফিস থেকে বেরিযে আসি। পারমিটটা বুকপকেটে রেখেছি। বুকের ভেতরটা যেন খচখচ করে উঠছে। ওটায লেখা আছে—মিস্টার এ্যাণ্ড মিসেস……।

গেটের সামনে এসে ক্যামেরা ফেরত নিই। তারপরে নিঃশব্দে পথ চলতে থাকি। একটু বাদে মানসী বলে ওঠে, "একেবারে যে মৌনীবাবা হয়ে উঠলে?"

"না।" একটা ঢোঁক গিলে জবাব দিই, "এমনি চুপ করে আছি। বল কি বলবে?"

"দেখো সখা……" মানসী থামে।

আমি মানসীর দিকে তাকাই।

মানসী বলে, "তুমি আমার থেকে বয়সে বড়, বিদ্যাবুদ্ধিতেও বড়। জীবনের অভিজ্ঞতাও তোমার অনেক বেশি। তবু তুমি ভুলে বসে আছো, অবস্থার বিপাকে পড়ে মানুষকে অনেক সময় এমন মিথ্যাকেও মেনে নিতে হয়। এ মেনে নেওয়া নেহাতই সাময়িক। সে সময়টুকু ফুরিয়ে গেলে মিথ্যা আবার মিথ্যাতেই পর্যবসিত হযে যায়। কারণ মিথ্যা কখনও সত্য হয় না।"

সত্যই তো। মানসী মেয়ে হয়ে মিথ্যাকে মেনে নিতে পারছে আর আমি কিনা অযথা এতো অস্থির হয়ে পড়েছি। মনের সব দ্বিধাকে মুছে ফেলে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি। বলি, "এখন তাহলে কোথায় চলেছো?"

"তুমি যেখানে নিয়ে যাচ্ছ।"

"যদি বলি জাহান্নমে ?"

"তাই যাবো।"

হেসে বলি, "আমরা এখন ডাকবাংলোয় চলেছি।"

"বেশ তো, চলো।"

বাস-রাস্তা থেকে ডান দিকের পথ ধরে এগিয়ে চলি। হাইস্কুল ছাড়িয়ে ডাকবাংলো। সুন্দর পরিবেশ। গাছে-ছাওয়া চমৎকার একটি একতলা বাড়ি। সামনে বাগান। মানসী খুশি হয়।

কিন্তু মালী জানায়—দিন-দুয়েক বাদে জনৈক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আসছেন। তাই ডাকবাংলো পরিষ্কার করা হচ্ছে। ঘর পাওয়া যাবে না।

বললাম—আমরা তো তাঁর আসার আগেই চলে যাচ্ছি। অনেক বোঝালাম মালীকে। কিন্তু সে অবুঝ। কি করবে বেচারা—মন্ত্রী মহোদয় আসছেন।

ঘর পেলাম না। কিন্তু তার চেয়ে মূল্যবান বস্তু পেলাম মালীর কাছে। চিঠি—মানসীর বাবার চিঠি। মানালীর ট্যুরিস্ট অফিসার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ব্যস্ত হয়ে চিঠিটা খোলে মানসী। পড়া শেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "বাবার শরীরটা একটু ভালো। বাবা লিখেছে—তাড়াহুড়া করে ফিরে যাবার দরকার নেই। লাহুল না যাবার জন্য মন্দ বলেছেন।"

"আমরা তাহলে ফেরার পথে বৈজনাথ, কাংড়া, জ্বালামুখী ও ধরমশালা দেখে পাঠানকোট যাচ্ছি।"

"না সখা, বাবা যতই বলুক আমার আর ভাল লাগছে না। কেন জানি না, আমার বড্ড বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তুমি রাগ ক'রো না। আবার আমরা আসব হিমাচলে। এখন যা অ-দেখা রইল, তা তখন দেখব।"

"বেশ তাই হবে।"

ডাকবাংলোর বাগান পেরিয়ে আমরা বড় রাস্তায় আসি। কিন্তু বড় রাস্তা দিয়ে না হেঁটে চৌকিদারের দেখিয়ে দেওয়া সংক্ষিপ্ত পথে এগিয়ে চলি। মানসী বলে, "তাড়াতাড়ি চলো, সন্ধ্যে হয়ে এলো। রাতের একটা আশ্রয় দরকার।"

হাইস্কুলের পাশ দিয়ে, বাড়ি-ঘরের ভেতর দিয়ে, আমরা বাস স্ট্যাণ্ডে নেমে

আসি। চায়ের দোকানদারকে জিজ্ঞেস করি হোটেলের কথা। সামনের বড় বাড়িটা দেখিয়ে দেয় সে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে আসি। ম্যানেজার সহাস্যে জানান, "ঘর পাওয়া যাবে বৈ কি—ওয়েল ফার্নিশড রুম, উইথ এ্যাটাচ্‌ড্‌ বাথ।"

বেয়ারা আমাদের একখানি মাঝারি আকারের ঘরে নিয়ে আসে। ঘরটা ভালোই। কিন্তু এ তো ডাব্‌ল-বেডরুম। একসঙ্গে জোড়া দেওয়া দুখানি গদি-আঁটা খাট। এ রকম ঘর তো চাইনি, পাশাপাশি দুখানি সিঙ্গল-বেডরুম চাই। বেয়ারাকে বলি, "সিঙ্গল-বেডরুম নেই?"

"আছে। কিন্তু তাতে তো দুজন থাকতে পারবেন না।"

বিরক্তিকর। এক কথা জিজ্ঞেস করতে আর এক কথা বলছে। উষ্ণ স্বরে বলি, "দুখানি সিঙ্গল-বেডরুম খালি আছে কিনা, তাই বলো। না থাকলে আমাদের অন্য হোটেলে যেতে হবে।"

বেয়ারা কোন জবাব দিতে পারার আগেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে মানসী বাংলায় বলে ওঠে, "তোমার আজ কি হয়েছে বল তো?"

"কেন?" আমি মানসীর প্রশ্নে বিস্মিত হই।

মানসী আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হিন্দীতে বেয়ারাকে বলে, "ঐ চায়ের দোকানে আমাদের মালপত্র রয়েছে। একটা কুলি ডেকে সব নিয়ে এসো এখানে। তার পরে চা দাও। আমরা এই ঘরেই থাকব। বেশ ভাল ঘর।"

বেয়ারা চলে যায়। মানসী গিয়ে একখানি চেয়ারে বসে। আমি ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। মানসী আমার দিকে তাকায়। বলে, "একসঙ্গে এসে যদি আলাদা ঘরে থাকি, তাহলে এরা কি ভাববে বল তো। ছোট শহর, আমরা প্রবাসী। স্বামী-স্ত্রী বলে হলেজওয়ের পারমিট করিয়েছো। জানাজানি হলে একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে।"

"তাই বলে আমরা এক ঘরে রাত কাটাবো।"

"এক ঘরে তো আমরা রাত কাটিয়েছি সখা! কেবল এক ঘরে কেন, এক বিছানায় রাত কেটেছে আমাদের।"

"কিন্তু সে-ঘরে অন্য লোক ছিল, একা ছিলাম না।"

"এ ঘরেও তো একা থাকব না, দুজনে থাকব।"

"তাতেই আমার আপত্তি মানসী!"

"আপত্তিটা কি তোমার চেয়ে আমার বেশি হওয়া উচিত নয়?"

"তোমার কথা ভেবেই আমি আপত্তি করছি।"

"আপত্তি করার কিছু নেই, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি আমার সখা।"

"কিন্তু আমি যদি সে বিশ্বাসের মর্যাদা না রাখতে পারি? যদি দুর্বল হয়ে পড়ি?"

"নিজের ওপর তোমার এতো আস্থার অভাব?" মানসী একবার থামে, তার পরে বলে, "আর যদি একান্তই নিজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে থাকো, তোমার মানসীর ওপর নির্ভর করো, সে তোমাকে সব দুর্বলতার হাত থেকে রক্ষা করবে। আমি তো কেবল মানসী নই, আমি প্রকৃতি—পুরুষের পরম-আশ্রয়।"

মানসীর দিকে তাকাই। সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। মানসী আমার কতো কাছে। তবু যেন মনে হয় সে দাঁড়িয়ে আছে দূরে, বহুদূরে—আকাশের সীমা ছাড়িয়ে, লক্ষ তারার মাঝে।

"চুপ করে রইলে কেন?" মানসী জিজ্ঞেস করে। সে আমার আরও কাছে এগিয়ে আসে। আমার চোখের ওপরে চোখ রেখে বলে, "তুমি না কথার মালাকার, ভাবের তন্ত্রধারক, চরিত্রের চিত্রকর, আদর্শের স্রষ্টা—তোমার তো এমন দুর্বল হওয়া সাজে না।"

"চমৎকার!" আমি বলে উঠি, "তোমার কাছে আমি যা আশা করেছি, তুমি তার থেকে অনেক—অনেক বেশি দিতে পারো মানসী।"

কি যেন বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু পারল না বলতে। মালপত্র নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। মানসী আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। মালপত্র গোছাতে লেগে গেল। একদিনের জন্য হলেও সংসার তো বটে। আমরা আজ নতুন ঘর-সংসার পাতছি যোগিন্দর নগরে।

গোছগাছ শেষ করে মানসী বেয়ারাকে চা আনতে বলে। হাত-মুখ ধুয়ে এসে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়ায়। প্রসাধন শুরু করে। আমি প্রতীক্ষা করি। যদি সে না-বলা কথাটি বলে। কিন্তু আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। কোন কথা বলে না মানসী। সে নীরবে প্রসাধন করতে থাকে।

বেয়ারা চা নিয়ে আসে। চা খাওয়ার পরে মানসী বলে, "পোশাক পালটে নাও। চলো, একটু বেড়িয়ে আসা যাক।"

ঠিকই বলেছে মানসী। বাইরে বেরুলে ভালই হবে। শত মানুষের মাঝে নিজেদের হারিয়ে ফেলব। মনের শাসন থেকে সাময়িক মুক্তি পাবো।

উঠে দাঁড়িয়ে বলি, "বেড়াতে যাচ্ছি কিন্তু আবার পোশাক পালটাবার দরকার কি?"

"দরকার এই কারণে যে এটা নাগর নয়, যোগিন্দর নগর।" একবার থামে মানসী, তার পরে বলে, "তুমি আগে বেরিয়ে যাও। সামনের ঐ সেলুনটায় গিয়ে দাড়ি কামিয়ে নাও। আমি আসছি।"

॥ পনেরো ॥

সেলুন থেকে বেরিয়ে দেখি মানসী দাঁড়িয়ে আছে পথে। সুন্দর একখানি শাড়ি পরেছে। কপালে কুমকুমের টিপ। খোঁপায় বেলফুলের মালা—বোধহয় সামনের বাজার থেকে কিনে এনেছে। এমন বেশে ওকে আর কখনও দেখি নি। ভারী সুন্দর লাগছে। কিন্তু আজ কেন ওর এতো সাজগোজ?

আমার কাছে এসে হেসে মানসী বলে, এই তো কেমন চেহারা ফিরে গেছে। এবারে কে বলবে পাহাড়ী সাহেব।"

"কেউ বলেছিল নাকি? শুনি নি তো।" হেসে বলি।

"তোমাকে শুনিয়ে বলবে নাকি?"

"তোমার কানে কানে বলেছে বুঝি?"

"হ্যাঁ।" মানসী বলে, "বাজে কথা না বাড়িয়ে এবারে চলো দেখি।"

"কোথায়?"

"মন্দিরে।"

বাস স্ট্যাণ্ড থেকে যে কাঁচা পথটি স্টেশনে গেছে, সেই পথের ওপরেই মন্দির—পথের ডানদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে। সঙ্গে একটি ধর্মশালাও রয়েছে। মন্দিরদ্বারে একখানি প্রস্তরফলকে লেখা—

'This Hall and the back portion has, on the inspiration of his dharmapatni Shreemati Parbati, been erected by Pt Hulasa Ramji Rais, Mandi State.'

ভেতরে ঢুকেই বাঁধানো অঙ্গন। তিন দিকে সারি সারি ঘর। সামনে প্রশস্ত বারান্দা। এর কয়েকখানি ঘরে মন্দিরের লোকজন বাস করেন। বাকি ঘরগুলি যাত্রীনিবাস।

আঙ্গিনার পরে নাটমন্দির—বেশ বড়। চারিদিকের দেয়ালে গীতার শ্লোক লেখা।

নাটমন্দিরের পরে গর্ভমন্দির। মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্তি। কালো পাথরের কৃষ্ণ ও শ্বেত পাথরের রাধা। ভারী সুন্দর মূর্তি। আমরা সশ্রদ্ধ অন্তরে প্রণাম করি। মানসী ব্যাগ থেকে একটি টাকা বের করে প্রণামীর বাক্সে দেয়।

পূজারী আমাদের হাতে আশীর্বাদী ফুল ও চরণামৃত দেন। তার পরে সিঁদুরের থালা এনে আমার ললাটে তিলক কেটে দিয়ে বলেন, "মার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিন বাবুজী।"

চমকে উঠি, এ কি বলছেন পূজারী! আমি ইতস্ততঃ করতে থাকি।

পূজারী তাগাদা দেন, "নিন বাবুজী, রাধা-কৃষ্ণের আশীবাদী সিঁদুর। আপনাদের সংসার সুখের হবে, সম্পর্ক মধুর হবে।"

হাত বাড়াতে গিয়েও বাড়াতে পারি না। আর তখনই কাণ্ডটা করে বসে মানসী। থালা থেকে খানিকটা সিঁদুর নিয়ে নিজের সিঁথিতে মাখায়। পূজারী হাসেন, আমাকেও একটু হাসতে হয়।

মানসী কোন কথা বলে না। সে পূজারীকে প্রণাম করে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসে। স্টেশনের দিকে চলতে থাকে। আমি ওর কাছে এসে বলি, "কেন এমন করলে?"

একটু হাসে মানসী, যেন কিছুই হয় নি। স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করে, "কি আবার করলাম?"

"কুমারী মেয়েদের সিঁদুর পরতে নেই।"

"সিঁদুর আমার কাছে খানিকটা লাল রঙ ছাড়া আর কিছু নয়। এ রঙ আমার মনে কোন রঙ ধরাতে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।" মানসী হাসে।

আমি আর কিছু বলতে পারি না। চুপ করে থাকি।

মানসী আবার বলে, "আজ আমি যা করেছি, নেহাতই অবস্থার বিপাকে পড়ে করেছি। নিজের বিবেকের কাছে আমি কোন অন্যায় করি নি। সংসারে বাস করতে হলে, এমন একটু-আধটু অভিনয় করতেই হয়। এতে এতো বিচলিত হবার কি আছে।"

"বিচলিত আমি হই নি মানসী!"

"তাহলে কথা বলছ না কেন?"

"কি বলব?"

"যা ইচ্ছে।"

আমরা সিঁড়ি বেয়ে স্টেশনে উঠে আসি। ছোট স্টেশন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই এপ্রিল তৎকালীন রেল ও পরিবহন দপ্তরের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই রেলস্টেশনের উদ্বোধন করেন। ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রীর অক্ষয় স্মৃতির সঙ্গে এই ক্ষুদ্র রেলস্টেশন অঙ্গাঙ্গি হয়ে আছে।

মানসী বলে, "জিজ্ঞেস কর না রিজার্ভেশান পাওয়া যায় কিনা?"

"কোথাকার রিজার্ভেশান?"

"পাঠানকোট থেকে কলকাতার। পরশুদিন বিকেলে আমরা পাঠানকোট পৌঁছচ্ছি। সেদিনই রাত্তের ট্রেনে একটা বার্থ পেলে বড় ভাল হত।"

"তুমি কি সেদিনই চলে যেতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমার বাবা তো ভাল আছেন। পাঠানকোটে দু'তিনটা দিন দেরি করলে হত না?"

"কেন?"

"ইতিমধ্যে অসিতবাবুরা এসে যেতেন। একসঙ্গে কলকাতায় ফিরতাম আমরা।"

"না সখা, তা হয় না।"

"কেন?"

"আমি চাইনে তোমার কোন দুর্নাম হোক। তা ছাড়া কেন জানি না, আমার বড্ড বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। দ্যাখো না একটু চেষ্টা করে, যদি পাঠানকোটে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে একটা বার্থ রিজার্ভ করার কোন ব্যবস্থা করতে পারো?" মানসী অনুনয় করে।

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা একটা হয়ে যায়। আমরা ফিরে চলি হোটেলে। মনটা ভাল লাগছে না। মানসী চলে যাবে। এই-ই নিয়ম। সংসারে কেউ কারও পাশে চিরকাল থাকে না। তবু যাওয়ার সময় মনটা ব্যথায় ভরে ওঠে। রিজার্ভেশান করার পরে মানসীর চলে যাওয়ার চিন্তাটা আমার কাছে যেন বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে।

হোটেলের ডাইনিং-হল থেকে খেয়ে নিয়ে ঘরে চলি আমরা। কিন্তু মানসী আমাকে ঘরে ঢুকতে দেয় না। বলে, "তুমি একটু বারান্দায় দাঁড়াও, আমি শাড়িটা পালটে নিই।"

বারান্দার রেলিং-য়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই। নিচে আলো-ঝলমল রাজপথ। কতো মানুষ যাওয়া-আসা করছে। ওদের মাঝে কেউ কি আমার মতো আছে? ওরা কি কেউ আমার মতো হিমালয়ের পথে কোন মানসীকে পেয়েছে কুড়িয়ে? ওরা কি কেউ মন্দিরে দাঁড়িয়ে কোন কুমারী মেয়ের সিঁথিতে সিঁদুর পরাবার সুযোগ পেয়েছে? ওরা কি কেউ আমার মতো এমনি কোন হোটেলে নিঃসম্পর্কীয়া নারীর সঙ্গে এক ঘরে রাত্রিবাস করেছে?

"ভেতরে এসো। আমার হয়ে গেছে।"

মানসী দুয়ার খুলেছে। আমাকে ঘরে ডাকছে: আমি ভেতরে আসি। দরজাটা খোলাই থাকে।

মানসী বাথরুমে চলে যায়। খাট দুখানির দিকে নজর পড়ে আমার: জোড়াখাট। দেখে মনে হচ্ছে যেন একখানি। এই নিয়ম। ডাব্‌ল বেডরুম। স্বামী-স্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট। আমাদেরও তাই পরিচয়।

আর ভাবতে পারি না। তাড়াতাড়ি সামনের খাটখানিকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে আসি। শব্দ হয়। মানসী নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছে। থাক্ গে। কিন্তু বেশিদূর টানা যায় না। আর টানলে দোর বন্ধ করা যাবে না। তবু ফুট-খানেক ব্যবধান রচিত হয়েছে দুখানি খাটের মাঝে।

মানসী ঘরে আসে। একবার তাকিয়ে দেখে। না জানি কি বলবে এখুনি। আমি উত্তরের জন্য প্রস্তুত হই। কিন্তু না, মানসী কিছুই বলে না। সে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে। একমনে চুল বাঁধতে থাকে।

শার্টটা খুলে আলনায় রাখি। পায়জামা ও গামছা নিয়ে বাথরুমের দরজা খুলি।

"সেল্‌ফের ওপরে সাবান আছে।" মানসী বলে।

"আচ্ছা।" বলে দরজা বন্ধ করে দিই।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি মানসী চুপ করে বসে আছে। আমি ঘরে আসতেই সে বলে, "এবারে শুয়ে পড়া যাক। কাল আবার সকাল-সকাল উঠতে হবে।"

সে সটান শুয়ে পড়ে।

আমি বসে থাকি। একটু বাদে মানসী আবার বলে, "দরজাটা কি সারারাত খোলাই থাকবে?"

"কোন আপত্তি আছে কি?"

"নিশ্চয়ই। তুমি না হয় মুসাফির। কিন্তু আমার বাপু গয়না-গাঁটি আছে ড্রয়ারে। মুর্শিদাবাদ সিল্কটাও একেবারে নতুন, আজই প্রথম পরলাম।"

"কারণটা কি?"

"কিসের?"

"আজ হঠাৎ নতুন শাড়ি ও গয়না পবার?"

"পরব না! এনেছি তো পরার জন্যই।"

"কিন্তু এতো দিন পরতে দেখি নি, আজ হঠাৎ পরলে কেন?"

"ইচ্ছে হল তাই। যেমন তোমাব ইচ্ছেয় খাট দুখানি বিযুক্ত হল?"

"তোমার দিক থেকে কোন প্রযোজন ছিল না বুঝি?"

"না।" একবার থামে সে। তারপরে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, "ব্যবধানটা কি মনে আঁকা ভাল নয় সখা?"

আমি চুপ করে থাকি। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়।

মানসী আবার বলে, "তুমি পুরুষ, আমি নারী। এক ঘরে রাত্রিবাস করছি। মনের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হলে খরস্রোতা নদীর ব্যবধানও দুস্তর নয়—সামান্য এই এক ফুটে কি হবে?"

এবারেও আমি কোন জবাব দিতে পারি না।

মানসী হঠাৎ উঠে বসে। খাট থেকে নেমে এগিয়ে যায় দরজার কাছে। সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে আসে বিছানায়। আবার শুযে পড়ে। বলে, "ছাইভস্ম না ভেবে, আলো নিবিয়ে শুযে পড়ো এবারে। কাল ছটায় উঠতে হবে।"

মেয়ে হয়ে মানসী যখন এতো সহজ এতো স্বাভাবিক হতে পারছে, তখন তো আমার এমন করা সাজে না। আমি উঠে বাতিটা নিবিযে দিই। মুহূর্তের মাঝে জমাট বাঁধা কালো আঁধার ছেয়ে ফেলে আমাকে। কেবল আমাকে নয়, মানসীকেও। তবে সে তার মনের আলো রেখেছে জ্বালিযে। আর সেই আলোয় আলোময় করে তুলতে চাইছে আমাকে।

হাতড়াতে হাতড়াতে খাটের কাছে আসি। বিছানায় আশ্রয় নিই।

"শুয়ে পড়লে?" মানসী কথা বলে।

"হ্যাঁ।"

"তোমার বড্ড ভয় করছে, না?"

"ভয়? কিসের ভয়?" বুঝতে পারি না ওর কথা।

"লোকভয়, দুর্নামের ভয়। অনাত্মীয়া মেয়েকে নিয়ে এক ঘরে

রাত্রিবাসের ভয়।"

"কিন্তু তুমি তো আমার অনাত্মীয়া নও মানসী!"

"তাহলেও তুমি ভয় পেয়েছো।"

অস্বীকার করতে পারি না। চুপ করে থাকি।

আমার উত্তর না পেয়ে মানসী বলে, "আমি কিন্তু ভয় পাই নি। কেন পাই নি, জানো?"

"কেন?"

"আমার বাবা বলেন, মানুষকে অবিশ্বাস করে জেতার চেয়ে, বিশ্বাস করে ঠকা ভাল। তাই আমি সবাইকে বিশ্বাস করি। আর একজন ছাড়া এ পর্যন্ত কেউ ঠকায় নি আমাকে।"

"সে কে?"

"তার কথা জিজ্ঞেস করে এই সুন্দর রাতটা মাটি করে দিও না সখা। তার চাইতে আমার কথা শোন।"

"বেশ তাই বলো।"

মানসী বলে চলে, "জীবনে আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি খুব বড় নয়। তবু এই সামান্য জীবনের সামান্যতর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি ভক্তি ও ভালোবাসার কাছে নর ও নারীর কোন পার্থক্য নেই। তুমি তো আমার কেবল সখা নও, তুমি আমার প্রিয় লেখক। লেখা পড়ে যাঁকে একদিন মনে মনে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলাম, ভালোবেসেছিলাম, তাঁকে আজ আমি এতো কাছে পেয়েছি, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

"পাওয়া আর না-পাওয়া নিয়েই জীবন। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার দিকটা সব সময়েই বড়। কিন্তু চরম-প্রতিকূলতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানই তো জীবনধারণ।

"জীবন সম্পর্কে স্বপ্ন দেখা মানুষের সহজাত, বিশেষ করে কুমারী মেয়েদের। আমিও অনেক স্বপ্ন দেখেছি। সে-সব স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে। যা চেয়েছি, তা পাই নি। যা হতে চেয়েছি, তা হতে পারি নি। ব্যর্থতার বোঝা বহন করছি কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে মিথ্যে পাওয়ার আনন্দ উপভোগ করতে পারছি না।

"অনেক দিন পরে, অনেক দিনের ঈপ্সিতকে পেয়েছি তোমার মাঝে। এ পাওয়া যে কতো বড়, তা আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। কিন্তু আমার মানস-লোকের অধীশ্বরের কাছে আমি কোন অমানবিক

আচরণ আশা করি না। তাই আমি পরম নিশ্চিন্তে, এই আঁধার ঘরে তোমার সঙ্গে প্রায় এক বিছানায় রাত কাটাতে পারছি।

"সংসারে সব মানুষের মানসিকতা এক নয়। কিন্তু মনের জগৎ বলে মানুষের একটা কিছু আছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। সেই বিশ্বাসকে সম্বল করে আমি জীবনের সঙ্গে পরীক্ষা করে চলেছি। তোমাকে নিয়েই আমার সে পরীক্ষা। জানি এ পরীক্ষায় আমি অকৃতকার্য হব না।

"বিগত কয়েক দিনের অবাধ মেলা-মেশায় যদি আমার সম্পর্কে তোমার মনে কোন সহানুভূতি সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাকে ভাবাবেগের আতিশয্যে কিংবা উচ্ছলতার বহিঃপ্রকাশে নষ্ট করে ফেলো না। ওগুলো বড়ই তুচ্ছ। গভীর ভালোবাসা জীবনকে আলোকিত করে তোলে, মানুষকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করে না। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণের সেই কথাগুলো কখনই ভুলে যেও না— 'Love is not sex. Love has its peaks which only one in a million is able to climb through mature and responsible love.'

"আমার দিক থেকে বলব, আমি আমার পরিণত প্রেমের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। ভালোবাসার সেই গভীরতা আমি অনুভব করছি। একে আমি সযতনে রেখে দিলাম আমার মনের মণিকোঠায়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, আমার এ ভালোবাসা তোমাকে ওঠাতে না পারলেও, কখনই নামিয়ে নিয়ে যাবে না।" থামে মানসী।

সে আর কিছু বলবে কি ?

না। আর কিছু বলে না মানসী। অনেকক্ষণ ধরে অনেক কথা বলেছে সে। এবারে আমার কিছু বলা দরকার।

কিন্তু কি বলব ? মানসী তো কিছুই শুনতে চায় নি আমার কাছে।

মানসী বোধ হয় পাশ ফিরল। সে নিশ্চয়ই ঘুমোবার চেষ্টা করছে। ঘুমোক মানসী। নিশ্চিন্তে ঘুমোক। তার সব কথা বলা হয়েছে।

কিন্তু আমি ? আমি কি করব ? আমার যে কিছুই বলা হল না।

না হোক্। কতো কথাই তো বলা হল না এ জীবনে। না-বলা সেই কথার মালায় আজ না হয় আর কয়েকটি কথা যুক্ত হল।

আমিও পাশ ফিরে শুই। আমাকেও মানসীর মতো পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়তে হবে। ঘুম আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার উর্ধ্বে নিয়ে যাবে, সব দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের অবসান করবে।

॥ ষোলো ॥

পাওয়ার হাউসের পেছনে পাহাড়ের ধারে হলেজওয়ে স্টেশন—বাকার সাঁপ। এখানকার উচ্চতা ৪১৩১ ফুট। পাহাড়ের গায়ে রেল লাইন—আস্তে আস্তে ওপরে উঠে গেছে। সেই লাইনের ওপরে কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ট্রলি—স্থানীয়রা বলেন ট্রাক। কাঠের একটি ছোট কম্পার্টমেন্টের সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম। কামরায় দু-সারি সিট—জনা আটেক লোক বসতে পারে আর পাঠাতনে একখানি বেঞ্চি ও ফাঁকা জায়গা।

আমরা সেই বেঞ্চিখানিতে জায়গা নিলাম। বন্ধ কামরা আরাম বেশি কিন্তু আমরা আরাম করতে আসি নি, দেখতে এসেছি। এখানে বসে চারিদিক চমৎকার দেখা যাবে। তবে বৃষ্টি নামলে ভিজতে হবে।

"তা হোক গে।" মানসী বলে।

আর মানসী যখন বাইরে বসতে চাইছে, তখন আমার অন্দরমহলবাসী হওয়া সাজে না। তবু তাকে বলি, "শুধু জল নয়, রোদও সইতে হবে।"

"তোমাকে যখন সইতে পারছি, তখন রোদ অসহ হবে না।" মানসী উত্তর দেয়।

"আমাকে সহ্য করা কি খুবই কঠিন?" প্রশ্ন করি।

"হ্যাঁ।" মানসী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "কারণ তুমি দিবাকরের মতোই দীপ্ত, প্রভাকরের মতোই পবিত্র আর সূর্যের মতোই সুন্দর।"

"একটু যেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, কানে বাধছে।"

"বাধুক গে। আমার কাছে তুমি সুন্দর—পরম সুন্দর। তাই তো তোমাকে সইতে এতো কষ্ট আমার।"

"কি করলে তোমার এ কষ্ট লাঘব হয় সখী?"

"আপাতত এক কাপ চা খাওয়ালে। সকালে তাড়াতাড়িতে চা-টা তেমন জমে নি।"

আমার সোয়েটার ও মানসীর কোট দিয়ে জায়গা রেখে আমরা ট্রলি থেকে নেমে এলাম। পাওয়ার হাউসের সঙ্গেই কর্মচারীদের ক্যান্টিন। চা খেয়ে মানসী কিছু বিস্কুট ও মিষ্টি কিনে সঙ্গে নিল। সারা দিন থাকতে হবে। শুনেছি সেখানে বাজার আছে। কিন্তু কেমন বাজার কে জানে।

আবার ট্রলিতে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন যাত্রী এসে গেছেন। তাঁরা কেউবা বাইরে, কেউবা ভেতরে বসেছেন। আমরা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে চারিদিক দেখতে থাকি।

ট্রলির পেছনে লোহার মোটা দড়ি বাঁধা। দড়ি চলে গেছে পরবর্তী স্টেশনে। সেখানে এই দড়িটাকে গোটাবার ও ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা আছে। দড়ি গোটালে ট্রলিটা লাইনের ওপর দিয়ে উঠে যাবে ওপরে। আর ছেড়ে দিলে নেমে আসে নিচে। লাইনের ধারে টেলিগ্রাফের তারের মতো একসারি তার আছে। বিশেষ ধরনের একটা লাঠি দিয়ে ঐ তারটাকে আঘাত করলে ওপরে ও নিচের স্টেশনের ঘণ্টা বেজে ওঠে। এই ভাবে ট্রলির সঙ্গে স্টেশনের যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এই ট্রলিটা সবচেয়ে বড়, পনেরো টন মাল বইতে পারে।

সকাল আটটায় ট্রলি চালু হবার কথা ছিল। তাই আমরা অতো তাড়াতাড়ি এখানে এসেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ট্রলি ছাড়ল পৌনে নটার সময়।

লাইন বেয়ে ট্রলি ওপরে উঠছে। লাইনের ধারে গাছপালা আর বিরাট মোটা দুটি জলের পাইপ। পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে এসেছে। ঐ জলই হাইডেল পাওয়ার স্টেশনের জীবন। ঐ জলেরই উৎস দর্শনে চলেছি।

যোগিন্দর নগরকে ছবির মতো দেখাচ্ছে। আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি। নিচের বাড়ি ঘর, পথ ও প্রান্তর ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে। পাওয়ার স্টেশনের পেছনের পাহাড়টা আস্তে আস্তে আবছা হয়ে যাচ্ছে। তার পেছনের পাহাড়গুলি একে একে জেগে উঠছে। সারি সারি পাহাড়। এক সারির পেছনে আর এক সারি। পাহাড় নয় যেন আঁকাবাঁকা ধূসর রেখা।

নীলাকাশের বুকে থোকা থোকা মেঘ আর মাটিতে সবুজের আলপনা। মাঝে মাঝে নানা রঙের ছোট ছোট ঘর—শিশুর খেলনা।

তেত্রিশ মিনিট বাদে পরবর্তী স্টেশন অডিট জংশনে এসে নিশ্চল হল আমাদের ট্রলি। এখানকার উচ্চতা ৫৮০০ ফুট। তার মানে আমরা বাকার স্লপ বা যোগিন্দর নগর থেকে ১৬৬৯ ফুট উঠে এসেছি। দু স্টেশনের দূরত্ব ০.৯ মাইল।

যে লাইন বেয়ে আমাদের ট্রলি উঠে এসেছে, সে লাইনটা শেষ হয়ে গেছে

এখানে। কিন্তু পাশেই আর একটি লাইন। এখান থেকে ওপরে উঠে গেছে। সেই লাইনের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি ট্রলি—আকারে অনেক ছোট। এর বহন ক্ষমতা মোটে পাঁচ টন। তার মানে আগের ট্রলির এক-তৃতীয়াংশ। কিন্তু এ ট্রলিতেও একটি কামরা রয়েছে। তেমনি দুসারি সিট। তবে এর পাটাতনটি বড়ই ছোট। কোন বেঞ্চি নেই। কেবল কয়েকখানি সরু তক্তা লাগানো। বাইরে থাকতে হলে, তারই একখানির ওপরে বসতে হয়। মানসীকে জিজ্ঞেস করি, "এবারে কি অন্তঃপুরবাসিনী হবে?"

"না।" সঙ্গে সঙ্গে মানসী জবাব দেয়।

"তাহলে যে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের ওপরে উপবেশন করতে হবে।"

"তাই করব।"

"পারবে কি বসে থাকতে? ধরে থাকার কিছু নেই।"

"কেন, তুমি তো পাশে থাকবে, তোমাকে ধরব। তোমাকে অবলম্বন করেই তো হিমাচলের এই সুন্দর দিনগুলো কাটিয়ে দিলাম।" একবার থামে মানসী। তার পরে বলে, "আর পড়েই যদি যাই, কি আর ক্ষতি হবে? সংসারে আমার জন্যে কাঁদার মানুষ মোটে একজন।"

"কে?"

"আমার বাবা।"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "তুমি শুধু বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে খবরটা দিয়ে এসো। দুটো সহানুভূতির কথা বলো। তাঁকে একটু শান্ত করতে পারলে, সেই হবে আমার সবচেয়ে বড় উপকার। অবাধ্য এই মেয়েটা যে তার বড় বেশি প্রিয়। আমার জন্য চিন্তা করো না। হিমালয়ের বুকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার চেয়ে মহত্তর মৃত্যু আমার আর কি হতে পারে?"

কিন্তু আমি সে প্রশ্নের উত্তর দিই না। নীরবে পথ চলে ট্রলির কাছে আসি। আসন গ্রহণ করি। একটু বাদে ট্রলি চলতে শুরু করে।

পথের পাশে রডোডেনড্রন বন। অসংখ্য গাছ। তবে ফুল নেই। এখন ফুলের সময় নয়।

তখন কেমন দেখায়?

কেমন আবার দেখাবে। মনে হয় যেন বনের বুকে আগুন লেগেছে।

এবারের পথ আগের চেয়ে খাড়াই। পরবর্তী স্টেশন উইন্‌চ ক্যাম্পের

উচ্চতা ৮৩০০ ফুট। কিন্তু দূরত্ব মোটে আধ মাইল। অর্থাৎ আধ মাইলে আমাদের আড়াই হাজার ফুট ওপরে উঠতে হবে। তাই দূরত্ব কম হওয়া সত্ত্বেও পরের স্টেশনে পৌঁছতেও আমাদের একই সময় লাগবে।

অনেকটা ওপরে উঠেছি। চারিদিকে চকচকে রোদ। দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। যোগিন্দর নগর ছাড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। এই বিরাট বিশ্বের কাছে যোগিন্দর নগর কতো ছোট। আমরা কতো ছোট এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের তুলনায়।

যোগিন্দর নগরের সীমারেখায় যে পাহাড়, যে পাহাড় যোগিন্দর নগরকে বাহির বিশ্বের কাছে আড়াল করে রেখেছে, সেই পাহাড়ের পরপারে অসংখ্য সারি সারি পাহাড়—কালো ধূসর ও সাদা পাহাড়। না, পাহাড় নয়—হিমতীর্থ-হিমাচল, অনন্ত হিমালয়—

'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥'

—পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে স্নান করে, পৃথিবীর মানদণ্ডের মতো যে বিরাট দেবভূমি ভারতের উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেই নগাধিরাজই দেবতাত্মা হিমালয়।

হিমালয়ের কাছ থেকে এবারের মতো আমার বিদায় নেবার সময় সমাগত। কেবল তো হিমালয় নয়, সেই সঙ্গে বিদায় দিতে হবে মানসীকে।

এই যে সংসারের নিয়ম। সুন্দরকে চিরকাল কাছে রাখা যায় না। কিন্তু তাই বলে তারা হারিয়ে যায় না। তারা চিরকাল বেঁচে থাকে মানুষের মনের মণিকোঠায়। সুন্দর হিমাচলের মতো সুন্দরী মানসীও চিরকাল ভরে রাখবে আমার মন। আমার কাছে মানসী আর মানালী এক হয়ে রইবে।

যোগিন্দর নগর এখন ঠিক আমাদের নিচে। পাওয়ার স্টেশনের পেছনের পাহাড়টার শীর্ষে পৌঁছেছি আমরা। এই পাহাড়টার ওপারেই বারোট। সেখানেই যেতে হবে আমাদের। তাই ট্রলি থেকে নামতে হল। আমরা উইন্চ ক্যাম্প স্টেশনে এসে গেছি।

ট্রলি থেকে নেমে মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখানে কোন ট্রলি দেখছি না তো!"

"না থাকলে দেখবে কেমন করে?"

"তাহলে কি হেঁটে যেতে হবে নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে। দেখছ না সবাই হাঁটছে। সম্ভবতঃ পাহাড়ের

উপরিভাগ সমতল বলে এখানে ট্রলি চালানো হয় না। যাত্রীরা হেঁটে অপর পাশে পৌঁছন।"

"কিন্তু লাইন পাতা রয়েছে যে?" মানসী প্রশ্ন করে।

"মনে হচ্ছে মাল চলাচলের জন্য।"

অন্যান্য যাত্রীরা জোরে জোরে হাঁটছে। আমরাও পা চালালাম। কিন্তু মোটেই পরিশ্রান্ত বোধ করছি না। আমরা প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উঁচুতে।

পাহাড়ের শীর্ষদেশ ঠিক সমতল নয়। এখানে ওখানে ছোট ছোট টিলা আর উঁচু-নিচু জমি। ঝোপঝাড়ে ছাওয়া। তারই মাঝে খানিকটা অংশকে সমতল করে পাতা হযেছে ট্রলির লাইন। সেই লাইনের ধার দিয়ে আমাদের পথ। সমতল পথ।

আধ ঘণ্টায় মাইল দুয়েক পথ পেরিয়ে আমরা পাহাড়টির অপর পাশে এলাম। সামনেই স্টেশন। একই রকম চেহারা। গুটি কয়েক টিনের শেড। এখানে ওখানে পডে আছে কিছু লোহা-লক্কর ও যন্ত্রপাতি। দুসারি লাইন নেমে গেছে নিচে। লাইনের ওপর দাঁডিয়ে আছে একটি ট্রলি। এটিও আগেরটির মতো পাঁচ টন মাল বহন করতে পারে। কিন্তু এটিতে কোন কামরা নেই। সবটা জুড়েই পাটাতন। হেসে মানসীকে বলি, "এবারে যে ঘর আর বার এক হযে গেল।"

"সে তো অনেক দিন আগেই হয়েছে।" মানসী হেসে জবাব দেয়।

কামরা না থাকলেও দু-সারি বেঞ্চি পাতা আছে। তারই উপরে বসলাম আমরা।

কিছুক্ষণ বাদে ট্রলি চলল। তেমনি খাড়া পথ। এতক্ষণ ওপরে উঠেছি। এবারে নিচে নামছি। শক্ত করে বেঞ্চির হাতল ধরে থাকতে হচ্ছে। পথের পাশে গাছপালা আর ঝোপঝাড়। তবে রডোডেনড্রন নেই। একই পাহাড়। কিন্তু দু-পাশের গাছপালার পার্থক্য লক্ষ্য করবার মতো।

০.৬ মাইল পথ নেমে পরের স্টেশন পৌঁছলাম। এ স্টেশনটির নাম কাত্যার। উচ্চতা ৭১৩৬ ফুট। তার মানে ১১৬৪ ফুট নিচে নেমে এসেছি।

একই রকম ট্রলি। কেবল বেঞ্চি দু-খানি আগের মতো প্রশস্ত নয়। ধরার মতো কোন বস্তুও পাশে নেই। একটু বাদেই ট্রলি চলল।

এবারে পথটা ভীষণ খাড়া। পরবর্তী স্টেশনটির নাম—জেরো পয়েন্ট। উচ্চতা ৬১৫৩ ফুট। দূরত্ব ০.৪৫৩ মাইল। তার মানে আধ মাইলেরও

কম দূরত্বের মধ্যে আমাদের প্রায় হাজার ফুট নেমে যেতে হবে। চব্বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

ট্রলিটা একেবারে সোজা নিচে নামছে। নিচে তাকাতে ভয় করছে। মনে হচ্ছে পড়ে যাব। ভয় পায় মানসী। সে জড়িয়ে ধরে আমাকে।

খাড়া জায়গাটা শেষ হবার পরে হেসে বলি, "সবাই কিন্তু দেখছে, আমাকে ধরে নিচে নামছ তুমি।"

মানসী ছেড়ে দেয় না আমাকে। নিরুদ্বিগ্ন স্বরে বলে, "দেখুক গে। ওরা জানে, এমন সাথী পাশে পেলে জেরো পয়েন্ট কেন, নরকে নামতেও নারাজ নই আমি। আর সে নরক আমার কাছে স্বর্গের চেয়ে সুন্দর।"

"সত্যি বলছ কি?" হেসে বলি।

"হ্যাঁ। তোমার মতো মিথ্যে বলার অভ্যেস নেই আমার।"

"সে কি! তোমার পথের সাথী মিথ্যেবাদী?"

"তা মাঝে মাঝে একটু আধটু বলে বৈ কি। তাহলেও তার সঙ্গে আমি নরকে যেতে রাজী আছি। কারণ তার মিথ্যে যে আমার কাছে সত্যের চেয়ে বেশি সুন্দর।"

আমি চুপ করে থাকি। মানসীও আর কোন কথা বলে না।

সামনের দিকে তাকাই। সামনে সংকীর্ণ একটি সুন্দর উপত্যকা। এপাশের পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে নামছি আমরা। ওপাশের পাহাড়ের গায়ে গ্রাম।

উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী—উল। ইংরেজীতে লেখে—'UHL'. দেখে মনে হচ্ছে শান্তশিষ্ট স্রোতস্বিনী। কিন্তু আসলে সে ছিল বড়ই দুর্বিনীত। সে ছিল ভয়ঙ্করী। প্রতি বছর বর্ষার সময়ে প্রবল বন্যায় ভাসিয়ে দিত দেশ। তাকে সংযত করার প্রয়োজন হয়েছিল। তাই তৎকালীন পাঞ্জাব সরকার বাঁধ দিয়ে বন্দী করলেন তাকে। নির্মাণ করলেন জলাধার। পাহাড় ভেদ করে পাইপ বসালেন। জলাধারের জল নিয়ে যাওয়া হল যোগিন্দর নগরে। অসংযমী নদীর সে উচ্ছল জলধারা দিয়ে বিদ্যুৎ-উৎপাদন করা হল। দুর্বিনীত ও ভয়ঙ্করী উল দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করল।

ট্রলি নিশ্চল হল। আমাদের যাত্রা হল শেষ। ট্রলি থেকে নামলাম। সামনেই ছোট অফিস-ঘর আর পুলিস চৌকি। প্রহরারত পুলিস যাত্রীদের অনুমতিপত্র পরীক্ষা করে। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এই ব্যবস্থা। নিরাপত্তার

প্রয়োজনেই এখানে ক্যামেরা আনা নিষেধ। মীরজাফর এ দেশে আজও জন্মাচ্ছে।

একটি নয়, দুটি নদী। উল এসেছে বাঁ দিক থেকে। ডান দিক থেকে আরও একটি নদী এসেছে এখানে। ছোট এই নদীটির নাম লামবাডাগ। উলের ধারাকে একটি বাঁধানো খালের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে জলাধারে। কিন্তু লামবাডাগ নিজেই প্রবাহিত হযেছে সেই খালের ওপার দিয়ে।

খালের এপাবে বাঁধানো পথ। পথের পাশে ফুল বাগান। তার পরে খানিকটা সমতল জায়গা—ক্ষেত ও বাড়ি-ঘর। সমতলের শেষে পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে বড বড় গাছ। এই পাহাডের ওপার থেকে এসেছি আমরা। এপারে বারোট, ওপারে যোগিন্দর নগর। এপাবে জল, ওপারে বিদ্যুৎ। এপারে প্রকৃতি, ওপারে বিজ্ঞান।

জেরো পয়েন্ট স্টেশনে কিন্তু ট্রলির লাইন শেষ হয় নি। বাঁধানো পথের ওপর দিযে খালের পাশ দিযে সে চলেছে আমাদের সঙ্গে। মালপত্র বয়ে নিয়ে আসার জন্য লাইনটিকে প্রসারিত করা হয়েছে।

"দেখো, দেখো কি সুন্দর!" মানসী উচ্ছল কণ্ঠে বলে ওঠে।

সত্যি তাই। আমিও দেখি, দু নয়ন ভরে দেখি। কৃত্রিম হলেও বড়ই সুন্দর। দেখে আর আশ মেটে না।

লামবাডাগ এসে মিলিত হয়েছে উলের সঙ্গে। সঙ্গমে সৃষ্টি করা হয়েছে একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত। প্রবল বেগে লামবাডাগের জলরাশি আছাড খেয়ে পড়ছে উলের বুকে। বারিকণা নয়, যেন নীল ধোঁয়া—অনেকখানি জায়গাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আর সূর্য? তার সোনালী কিরণমালায় নীলের ওপরে সোনার আভা ছড়িয়েছে।

অনিন্দ্যসুন্দর। কিন্তু অনন্তকাল ধরে এখানে অপেক্ষা করার অবসর নেই আমাদের। আমরা পথিক। আমরা এগিয়ে চলি। মানসী কিন্তু মাঝে মাঝেই পেছন ফিরে তাকাচ্ছে। হেসে বলি, "পেছনের ডাকে সাড়া দিও না, সামনে এগোতে অসুবিধে হবে।"

মানসী মৃদু হাসে। বলে, "আজকের এই এগিয়ে যাওয়াও তো কাল পেছনে পড়ে থাকবে।"

খানিকটা এগিয়ে খালের ওপরে একটি পুল। পুলের ওপর দিয়ে পথ চলে গেছে ওপারে—বাজারে। আট-দশটি দোকান আছে সেখানে।

এপারের পথ দিয়েই এগিয়ে চলি আমরা। কিছুদূর এগিয়ে বারোট প্রাইমারী স্কুল। কিন্তু লোকালয় নেই এখানে। লোকালয় স্টেশন ছাড়িয়ে। ছেলে-মেয়েরা সেখান থেকে পড়তে আসে এখানে।

'স্কুল ছাড়িয়েই অফিস আর অফিস ছাড়িয়েই জলাধার। অফিসের সামনে ছোট বাগান। বাগানে বসেছিলেন সর্দারজী। পারমিট দেখাতেই তিনি চাবি নিয়ে চললেন আমাদের সঙ্গে।

সুবিশাল জলাশয়। যেমন গভীর তেমনি সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত। বাঁধানো দীঘি বলা যেতে পারে। চারিদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। চারিদিকে বাঁধানো পথ। সেই পথ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম সর্দারজীর সঙ্গে।

জলাধার জলহীন। বছরে একবার করে পরিষ্কার করা হয় জলাধার। এখন সেই পালা চলেছে। সর্দারজী বলেন, "আকারে যতই বড় হোক, মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একে জলে ভরে দেওয়া যায় কিংবা এর সব জল বের করে নেওয়া যায়।"

"এখন তাহলে কাজ চলছে কেমন করে?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

সর্দারজী উত্তর দেন, "এখন খাল থেকে জল সোজা চলে যাচ্ছে টানেলে।"

"টানেল! টানেল কোথায়?" মানসী বলে।

"একটু দূরে, এই পাহাড়ের ভেতর দিয়ে। যোগিন্দর নগর থেকে রওনা হবার পরে যে দুটি জলের পাইপ দেখেছেন, টানেল থেকে জল চলে যাচ্ছে তাদের ভেতরে।"

"কটা টানেল আছে?" জিজ্ঞেস করি।

"দুটি। তবে একটি কাজ করছে এখন। আর একটি কেবল তৈরি হয়েছে। সেটির কাজ শুরু হলে দ্বিতীয় জলাধার নির্মিত হবে।" সর্দারজী বলেন।

"আর একটি জলাধার নির্মিত হচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ। সামনে ঐ যে উপত্যকার মতো সমতল জায়গাটা দেখছেন ওখানেই তৈরি হবে দ্বিতীয় জলাধার। তখন আমরা দ্বিগুণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারব।"

কথা বলতে বলতে পাহাড়ের গায়ে একটা দরজার সামনে এসে থামলাম। দরজায় তালা ঝুলছে। সর্দারজী তালা খুললেন।

আমরা গুহার ভেতরে ঢুকলাম। আলো আছে কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় বড় কম। তাই ভেতরে আলো-আঁধারের লুকোচুরি চলেছে। তার ওপর

আমরা রোদ থেকে এসেছি। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু সর্দারজী এগিয়ে চলেছেন। বাধ্য হয়ে আমাদের তাঁকে অনুসরণ করতে হয়। সর্দারজী অবশ্য বলেন, "সাবধানে চলবেন। দেখবেন আছাড় খাবেন না যেন।"

আর তাঁর বলার জন্যই কিনা জানি না, সঙ্গে সঙ্গে হোঁচট্ খায় মানসী। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলি ওকে।

"ভাগ্যিস পাশে ছিলে।" সামলে নিয়ে মানসী বলে।

"না থাকলে?"

"আমার অধঃপতন অনিবার্য ছিল।"

"তাহলে তোমাকে অধঃপতনের হস্ত থেকে রক্ষা করছি আমি।"

"হ্যাঁ। তুমি যে আমার রক্ষক।"

হেসে বলি, "তাই নাকি?"

"হ্যাঁ। আর তাই তো বলি, ভুলেও ভক্ষক হতে চেয়ো না।"

টানেলের প্রান্তে পেঁ ছিই। সর্দারজী বলেন, "পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে চারশ' পঁচাত্তর ফুট নিচে রয়েছি আমরা। এখানে কন্ট্রোলিং মেশিন বসবে।"

"কিন্তু কন্ট্রোলার এখানে আসবেন কেমন করে?" মানসী জিজ্ঞেস করে। "তখন তো টানেল জলে বোঝাই থাকবে।"

"পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে সুড়ঙ্গ তৈরি করে এই পর্যন্ত লিফট চালানো হবে। সেই লিফটে করে কন্ট্রোলিং স্টাফ এখানে আসবেন, কয়লার খনিতে যেমন কর্মীরা খাদে নামেন।"

"আচ্ছা আমরা কি পাহাড়টির প্রায় প্রান্তে পৌঁছে গেছি?" জিজ্ঞেস করি সর্দারজীকে।

"হ্যাঁ। সামান্য কয়েক শ' ফুট পরেই পাহাড় শেষ হয়ে গেছে। আর এই পাহাড়ের ওপারেই যোগিন্দর নগর। তবে যোগিন্দর নগরের থেকে প্রায় দু হাজার ফুট ওপরে রয়েছি আমরা। এখান থেকেই পাইপ লাইন আরম্ভ হবে।"

সেই নল দিয়ে আরও জল যাবে যোগিন্দর নগরে। আরও বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। আরও শক্তি, আরও আলো, আরও প্রগতি। দেশের উন্নয়নে আরও বড় ভূমিকা নেবে যোগিন্দর নগর ও বারোট। এ যুগের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে ছোট এই গ্রামটির নাম।

বিকেল সাড়ে ছটার সময় ফিরে এলাম যোগিন্দর নগরে। ট্রলি থেকে নেমে এগিয়ে চললাম বড় রাস্তার দিকে। মানসী বললে, "যাবার পথে একবার ডাকবাংলো হয়ে যাবে নাকি ?"

"কেন ?"

"যদি প্রাণেশের কোন চিঠি আসে।"

আশ্চর্য। তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে। কিন্তু মানসীর ঠিক মনে আছে। বলি, "আসবে কি ? কে জানে সে কোথায় আছে, কেমন আছে ? আমার টেলিগ্রাম পেয়েছে কিনা ?"

"তাহলেও চলো। আমার মন বলছে চিঠি আসবে। আসতেও তো পারে।"

"বেশ চলো।" আমরা ডাকবাংলোর পথে এগিয়ে চলি।

না, মানসী সত্যই মানসী। সে মনস্বিনী, মনশ্চক্ষুর অধিকারিণী। মনস্কামনা পূর্ণ হল আমার। দেখা হতেই চৌকিদার একখানি চিঠি দিল আমাকে। প্রাণেশের চিঠি।

তাড়াতড়ি খুলে ফেলি। পড়তে যাই। মানসী বাধা দেয়। বলে, "এখানে নয়, চলো বাগানের ঐ বেঞ্চিখানায় গিয়ে বসা যাক। তুমি জোরে জোরে পড়ো, আমি শুনি। আমারও আর তর সইছে না। যদিও আমার মন বলছে—সে ভাল আছে।"

বাগানে এসে বসি। আমি জোরে জোরে চিঠিখানি পড়তে শুরু করি। প্রাণেশ লিখেছে—

শ্রদ্ধেয় শঙ্কুদা,

আপনার টেলিগ্রাম পেলাম। আপনার নির্দেশমতো যোগিন্দর নগরের ঠিকানায় এ চিঠি দিলাম।

পাঁচ নম্বর শিবিরে সুজয়াদির ও অসিতদার চিঠি পেয়েছিলাম। তাতেই জানতে পারি আপনারা ডালহৌসি থেকে খাজিয়ার হয়ে চাম্বা পৌঁচেছেন। আপনাদের এবারকার হিমাচল ভ্রমণ নাকি নতুনত্বের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনার ভ্রমণ আনন্দময় হোক।

এবারে আমার কথা বলি। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর আমাদের অভিযানের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। ২৩,৮৬০ ফুট উঁচু মানা শীর্ষে আমরা ভারতের

জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবার গৌরব অর্জন করেছি। এই গৌরব শুধুমাত্র সদস্য, শেরপা ও কুলীদেরই নয়, এ গৌরব আপনাদের সকলের—আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতাই আমাদের সাফল্য এনে দিয়েছে।

৭ই সেপ্টেম্বর মদন মণ্ডল, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জি ও চারজন শেরপা মানার উত্তর-পশ্চিমে ২০,৪০০০ ফুট উঁচুতে চতুর্থ শিবির প্রতিষ্ঠা করেন। কথা ছিল তাঁরা পরের দিনই পঞ্চম শিবিরের রাস্তা দেখবেন এবং সম্ভব হলে তাঁবু ফেলবেন। কিন্তু প্রকৃতির খামখেয়ালির জন্য তাঁরা আর অগ্রসর হতে পারেন না। অত্যধিক বাতাস ও তুষারপাতের দরুন তাঁরা তৃতীয় শিবিরে নেমে আসতে বাধ্য হন।

কিন্তু ১০ই তারিখে আবহাওয়ার অকস্মাৎ পরিবর্তন দেখা যায়। তাই দলনেতা বিশ্বদেব বিশ্বাসের নির্দেশ অনুযায়ী সহনেতা নিমাই বসু ও আমি কয়েকজন শেরপাসহ উক্ত শিবির পুনর্দখল করি। পরের দিনই আমরা সেখান থেকে ২২,৮০০ ফুট উঁচুতে পঞ্চম ও সর্বশেষ শিবির প্রতিষ্ঠা করি।

চতুর্থ থেকে পঞ্চম শিবিরের রাস্তা খুবই খারাপ ছিল। একটা খাড়া শক্ত বরফের পাঁচিল উঠে গেছে উপরে—৮০° থেকে ৮৫° হবে হয়তো। তিব্বতের উপত্যকা থেকে প্রবলবেগে বাতাস এসে আছড়ে পড়ছে তার গায়ে। ফিকসড্ রোপ লাগিয়ে ধাপ কেটে আরোহণ করা যে কতো কঠিন তা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন। হিমসিম খেয়েছি আমরা সকলে।

পাঁচ নম্বর শিবির থেকে মানা-শীর্ষ মাত্র এক হাজার ষাট ফুট। কিন্তু ফুট মেপে এ-দূরত্ব পরিমাপ করা ভুল। এই দূরত্বটুকু অতিক্রম করার জন্য একাদিক্রমে আমাদের নয় রাত্রি কাটাতে হয়েছে ২২,৮০০ ফুট উঁচু পঞ্চম শিবিরে। তাতে এই অভিজ্ঞতাই হয়েছে, মানুষ প্রকৃতির কাছে নেহাৎ শিশু হলেও মানুষের অসাধ্য কিছু নেই।

দিনের পর দিন আশা-নিরাশার দোলায় কেটেছে আমাদের দিন। রোজই ভেবেছি হয় আজ, নয়তো আগামীকাল আমরা শৃঙ্গে আরোহণ করব। কিন্তু প্রতিদিনই বাদ সেধেছে প্রকৃতি। সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে অবিশ্রান্ত তুষারপাত, তুষারঝঞ্ঝা চলেছে। তাঁবুর বাইরে তো দূরের কথা, ভেতরে বসে থাকাও দুর্বিসহ মনে হয়েছে এক-এক দিন।

পঞ্চম শিবিরে ন'দিনের মধ্যে আমরা দুটি দিন মাত্র আবহাওয়া মোটামুটি ভাল পেয়েছিলাম। এই দুটি দিনের সদ্ব্যবহার করতে আমরা একটুও কার্পণ্য করি নি। আর তা করি নি বলেই আজ আমরা জয়যুক্ত।

১৪ই সেপ্টেম্বর আমরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে শীর্ষদেশের সম্ভাব্য পথ খুঁজতে যাই। একটি দলে ছিলেন নিমাইদা, শেরপা ও আঙনিমা। অপরটিতে শেরপা পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা, পাসাং শেরিং ও আমি। আমরা সরাসরি পুবদিক থেকে মানার পদপ্রান্তে হাজির হয়ে উত্তরগাত্র দিয়ে পথ খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হই। ঘণ্টাছয়েক পরিশ্রমের পরে আমরা ফিকসড রোপ লাগিয়ে ধাপ কেটে মোটামুটি একটা রাস্তা খুঁজে বের করতে সমর্থ হই। যদিও মানা-শীর্ষের কাছাকাছি টন টন ওজনের ঝুলন্ত বরফের চাঁইগুলি প্রতি মুহূর্তেই বিপদের ইঙ্গিত করছিল, তবু আমরা বলব এছাড়া আর সহজতর পথ বলে কিছু ছিল না। অপরদিকে নিমাইদারা আশানুরূপ পথের সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর দলনেতার নির্দেশমতো শীর্ষারোহণের পথকে আরো প্রশস্ত ও সুগম করবার জন্য পাসাং ফুতার, শেরিং লাকপা ও পাসাং শেরিং আরো কিছু দড়ি লাগিয়ে, ধাপ তৈরী করে ফিরে আসে। কিন্তু রাত থেকে তুষারপাত শুরু হল। পরদিন কয়েক মুহূর্তের জন্যও থেমেছিল কি না মনে পড়ে না। তবু তারই মধ্যে নিচ থেকে প্রদ্যোৎদা উঠে এসেছিলেন, শেরপারা এসেছিল রসদ নিয়ে।

নেতা ও তাপস ভট্টাচার্য আরো উপরে একটি বাড়তি তাঁবু প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তুষারধ্বসের কবলে পড়ে তাঁরা কোনমতে প্রাণ নিয়ে পঞ্চম শিবিরে ফিরে এসেছিলেন। এইভাবে প্রকৃতি আঘাত করেছে বারে বারে। তবে আমরা কখনই নিরুৎসাহ হই নি।

অবশেষে এলো সেই শুভদিন—১৯শে সেপ্টেম্বর। ঝকঝকে তকতকে দিন। কালবিলম্ব না করে আমরা তৈরী হয়ে নিই। চারজন শেরপা—আঙ্‌গিরতা, সোনা, ফু তেনজিং আর গ্যালজেন আমাদের আগে চলবে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে। কারণ একদিনের তুষারপাতের ফলে আমাদের রক্তজলকরা পরিশ্রমে তৈরী রাস্তা নরম তুষারের নীচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু বিপুল উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে আমরা চারজন যাত্রা শুরু করি। তখন সকাল আটটা বেজে পঁয়ত্রিশ।

কিন্তু উত্তরগাত্রের কাছাকাছি পৌঁছুতেই অভাবনীয় ভাবেই শুরু হল তুষারপাত। আর তার সঙ্গে সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের আক্রমণ। নরম তুষারকণা উড়ে এসে চোখেমুখে বিঁধতে থাকে। আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি।

ঠিক হল অবস্থা যত শোচনীয়ই হোক না কেন আমরা এগিয়ে যাব। শুরু

হল ফিকসড্‌ রোপ খুঁজে বের করার পালা। আমরা আটটি প্রাণী রাশি রাশি নরম তুষারের নীচ থেকে সেই দড়ি বার করতে লেগে যাই। সে এক প্রাণান্তকর শোচনীয় পরিস্থিতি, সমস্ত দেহ আমাদের তুষারের অতলে তলিয়ে গেল। নিমজ্জমান ব্যক্তির মত মাথা ভাসিয়ে রেখে হাত পা ছুঁড়তে লাগলাম সকলে।

অবশেষে দড়ি পাওয়া গেল। সেই দড়ি ধরে আমরা ধীরে ধীরে তুষারপাতের মধ্যেই আরোহণ করে উঠে এলাম উপরে। ঘড়িতে তখন বিকেল তিনটের ইঙ্গিত করছে।

শেরপা চারজনকে নীচে ফিরে যাবার নির্দেশ দিয়ে আমরা খানিকটা বিশ্রাম নিলাম। এমন সময় তুষারপাত হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা কালবিলম্ব না করে পুনরায় শীর্ষাভিমুখে যাত্রা করলাম।

মানাশীর্ষের শেষপথটুকু অত্যন্ত ভয়াবহ ও বিপজ্জনক। অপ্রশস্ত শিরার বেশির ভাগই পাথুরে। ছিটেফোঁটা তুষার লেগে তা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। আমরা বেশ হুঁশিয়ার হয়ে সে পথটুকু শৈলারোহণ করি। অত উঁচুতে প্রবল ঠাণ্ডার মধ্যে শৈলারোহণ করা যে কি দুরূহ কাজ তা আপনার সহজেই বোধগম্য হবে। হাত পা অসাড় হয়ে গেল। কথা বলবার মত ফুসফুসের জোর ছিল না।

শেষ পর্যায়ের শ'খানেক ফুট কঠিন বরফের আস্তরণে ঢাকা ছিল। এত শক্ত যে ক্র্যাম্পন ধরে না। সে বরফে তুষারগাঁইতি বিদ্ধ হতে চায় না।

কিন্তু অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রামের অবসান হয়। বেলা ৪-৪৫ মিনিটে আমরা মানা-শীর্ষে উপনীত হই। সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হয় তুষারপাত। তারই মধ্যে আমরা সেখানে ভারতের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিই। উড়িয়ে দিই পর্বত অভিযাত্রী সঙ্ঘের পতাকা। ভগবানের উদ্দেশে আমরা আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করি—আপেল নাশপাতি চকোলেট ইত্যাদি দিয়ে। বরফ খুঁড়ে শীর্ষদেশে রেখে আসি মদনদার দেওয়া একখানি কালীর ছবি আর আমার হর-পার্বতীর ফটো। পাসাং ফুতার ওই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে হাতের দস্তানা খুলে ছবি নিতে ভুল করে না। বেচারার আঙুলগুলো আজও সাড়শূন্য। দেখতে দেখতে কেটে যায় পঁয়ত্রিশটা মিনিট—আমার জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত।

তুষারপাতের দরুন মানা-শীর্ষ থেকে আশেপাশের দৃশ্য তেমন উপভোগ করতে পারি নি। চারিদিকে ঘষা কাঁচের মত আবছা ছিল। আবছা

ছায়ার মতো আশেপাশে যে-সব শৃঙ্গ দেখেছি তাদের মধ্যে দেওবন, মুকুট ও কামেট প্রধান। আর সোজা উত্তরে ধূসর তিব্বতের উপত্যকা। ইতিপূর্বে যাঁর কাছে মানা হার মেনেছে, তিনি বিখ্যাত পর্বতারোহী, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী, আলোকচিত্রকর ও সুলেখক ফ্রাঙ্ক এস. স্মাইথ। তিনি সহযাত্রী অলিভারের সঙ্গে ১৯৩৭ সালে মানা-শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁরা এখান থেকে একশ' মাইল দূরে অবস্থিত তিব্বতের গুরলা-মান্ধাতা (২৫,৩৫৫´) শিখর দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁরা ভাগ্যবান।

শীর্ষ থেকে পঞ্চম শিবিরে ফিরে আসার সময় অন্ধকারের কবলে পড়ি। মাত্র দুটি টর্চ সম্বল করে আমরা দুর্ঘটনা এড়িয়ে কিভাবে যে সেদিন ফিরে এসেছি, তা ভাবলে আজও বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। নেতা অবশ্য উদ্ধার-কারীদল পাঠিয়েছিলেন। রাত প্রায় এগারোটার সময় পঞ্চম শিবিরে ফিরে আসি কোনমতে।

অসম্ভব পরিশ্রম ও ক্ষুধাতৃষ্ণার ফলে দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। হাতপায়ে কোন সাড় ছিল না। তাঁবুতে ঢুকে ক্লাইম্বিং বুট খুলতেই আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। দুপায়ের বুড়ো আঙুল দুটি নীল হয়ে গেছে। অন্য আঙুলগুলোও কেমন যেন ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। তুষারক্ষত ছাড়া ওটা যে আর কিছু নয়—আমি ভাবতেই পারলুম না। কান্নায় আমার বুক ভেঙে এলো।

শঙ্কুদা, পরের দিনের ঘটনা আরো মর্মান্তিক। ২০শে সেপ্টেম্বর পাঁচ নম্বর শিবির গুটিয়ে নিচে নামবার সময় যে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটে তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এই দুর্ঘটনার ফলে শৃঙ্গ বিজয়ের বিজয়োল্লাস চাপা পড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে।

নীচ থেকে শেরপারা যথারীতি সকালে এসেছিল। একদল মালপত্র নিয়ে নেমে যায়। আমার হাঁটার ক্ষমতা ছিল না। তাই শেরপা নিমা থনডুপের পিঠে আমাকে বেঁধে নেওয়া হয়। সামনে ও পেছনে যথাক্রমে পাসাং শেরিং ও পাসাং ফুতার আমাকে নামাতে সাহায্য করে। অপর একটি দড়িতে নামেন নেতা শেরপা সর্দারকে নিয়ে। তৃতীয় দড়িতে নামে চারজন শেরপা—শেরিং লাকপা, ফু তেনজিং, আঙরিতা ও সোনা। ওদের পিঠে ভারী বোঝা ছিল। তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে পেছন থেকে আঙরিতার পা ফসকে যায়। অতর্কিত টানের জন্য ওরা কেউ প্রস্তুত ছিল না। ভারসাম্য বজায় না রাখতে পেরে চারজনই শক্ত বরফের পাঁচিল

বেযে গড়িযে পড়ে যায় প্রায় হাজার ফুট নিচে। গুঁড়ি গুঁড়ি তুষার পড়ছিল। তিনজন সংজ্ঞা হারিযে ফেলে। কিন্তু ফু তেনজিং-এর জ্ঞান ছিল। 'কলার-বোন' ভেঙে যাওযা সত্বেও সে কোন রকমে চতুর্থ শিবিরে নেমে খবর দেয। সেখানে সুজন কোলে ও তাপস ভট্টাচার্য ছিলেন। তাঁরা শেরপাদের পাঠিয়ে আহতদেব উদ্ধার করেন।

শেরিং লাকপা ও আঙরিতার আঘাত গুরুতর। বরফে মুখ থুবড়ে পড়ায লাকপার মুখ গলিত মাংসপিণ্ডের আকার ধারণ করেছে। আঙরিতার দুটো পাযের হাঁটু পর্যন্ত নীলাভ হযে গেছে। সোনার পাযের গোড়ালি বোধ হয ভেঙে গেছে।

দুর্ঘটনাব খবব দিল্লীতে ইণ্ডিযান মাউণ্টেনিযারিং ফাউণ্ডেশনের সভাপতি শ্রীএইচ. সি. সারিন ও সম্পাদক শ্রীরোহিণীমোহন চক্রবর্তীকে ওযারলেস মারফৎ পাঠানো হযেছে। তাঁবা ইণ্ডিযান এযার ফোর্সের একটি বিশেষ হেলিকপ্টার ও উদ্ধাবকারীদল পাঠিযেছেন। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে এসেছি। আহতদের বেরিলীতে নিযে যাওযা হযেছে। আমাদের শেরপা ও কুলির পিঠে করে নামানো হচ্ছে। আমরা নেমে আসছি—ফিবে আসছি আপনাদের মাঝে।

আমাদের জন্য কোন চিন্তা করবেন না। যা ঘটবার তা ঘটেছে। আমার তুলনায ওদের চারজনেব আঘাত অনেক গুরুতর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন ওরা যেন শীঘ্র আরোগ্যলাভ করে।*

আশা করি আপনারা ভালই আছেন। কলকাতায ববে নাগাদ ফিরছেন? শুভেচ্ছান্তে

বিনীত
প্রাণেশ

॥ সতেরো ॥

কথা ছিল সকাল সাড়ে পাঁচটায গাড়ি ছাড়বে। গাড়ি মানে মোটর নয, রেলগাড়ি—যোগেন্দ্র নগর পাঠানকোট প্যাসেঞ্জার। আজ বহুদিন বাদে রেলগাড়ির সওয়ার হযেছি। আমরা হিমাচলের কাছ থেকে বিদায নিচ্ছি।

* এই অভিযানেব বিস্তৃত বিবরণের জন্য প্রাণেশ চক্রবর্তীব 'মানসী মানা' বইখানি দ্রষ্টব্য।

কিন্তু এদিকে যে রেলের চাকা নড়ছে না। অথচ ভোর চারটায় ঘুম থেকে উঠেছি। মানে মানসীর ডাকাকাকিতে বিছানা ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। মালপত্র গুছিয়ে, বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে নিয়েছি। একটু বাদে ব্রেকফাস্ট এসে গেছে। প্রাতঃরাশ শেষ করে কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে স্টেশনে এসেছি। তখন সকাল সওয়া পাঁচটা। হিসেবমতো গাড়ি ছাড়ার মাত্র পনেরো মিনিট বাকী। কিন্তু স্টেশন যাত্রীশূন্য। অনেক বেছে পছন্দসই ছোট একটি কামরায় জাঁকিয়ে বসেছি দুজনে। ভেবেছিলাম একটু বাদেই গাড়ি ছাড়বে। কিন্তু হায়! যেখানকার গাড়ি, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে এখনও। রেলের চাকা নড়ছে না।

স্থানীয়দের কাছে কিন্তু অজানা নয় এ ঘটনা। তাই তাঁরা হেলে-দুলে মজলিসী চালে স্টেশনে এসেছেন। তবে তাঁদেরও অনেকে এখন যেন অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। এতো 'লেট' নাকি কোনদিন করে না। সাধারণত সাড়ে পাঁচটার গাড়ি ছ'টা নাগাদ ছাড়ে।

কিন্তু সংসারের সকল অনিয়মের মতো 'লেট' বস্তুটিরও একটা সীমারেখা আছে। সাড়ে ছটার সময় গাড়িটা দুলে উঠল। যাত্রীরা জয়ধ্বনি করে উঠলেন। করাই উচিত। মানসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে উঠল, "বাঁচা গেল।"

অনেক দিন বাদে রেলগাড়ির সওয়ার হয়েছি। সাধারণতঃ আমরা রেলগাড়ি বলতে যেমন বুঝি, এ গাড়ি তেমন নয়। 'ন্যারো গেজ ট্রেন'—ছোট লাইনের গাড়ি। তাহলেও ভাল লাগছে। আঁকাবাঁকা উৎরাই পথে প্রচণ্ড শব্দ করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে।

যোগিন্দর নগর থেকে সোজাসুজি পাঠানকোটের দূরত্ব ১০৩ মাইল, কিন্তু ১৫৪ মাইল উৎরাই পথ পেরিয়ে আমাদের এই গাড়িকে যাত্রার যতি টানতে হবে। যোগিন্দর নগর স্টেশনের উচ্চতা ৩৯০৮ ফুট আর পাঠানকোট মোটে ২৭৩০ ফুট। তার মানে আসার সময় ১১৭৮ ফুট চড়াই ভাঙতে হয় এই রেলগাড়িকে, এখন ভাঙতে হবে উৎরাই।

আগে নাগরোতা পর্যন্ত এই রেলপথ ছিল। পাওয়ার স্টেশন নির্মাণের সময় মাল পরিবহনের প্রয়োজনে সেই রেলপথকে প্রসারিত করা হয় যোগিন্দর নগর পর্যন্ত। তখন অবশ্য কেবল মালগাড়ি চলাচল করত। তার পরে লালবাহাদুর শাস্ত্রী যোগিন্দর নগর স্টেশনের উদ্বোধন করেন—যাত্রী চলাচল শুরু হয়।

হিমতীর্থ-হিমাচলের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব বাড়ছে। হিমাচল অচল, সে যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। আমি চলে যাচ্ছি দূরে। কিন্তু কেবল তো হিমাচলকে নয়, আজ যে মানসীকেও দিতে হবে বিদায়। আজই সে চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। ভালই হল, আমার কাছে মানসী আর হিমাচল এক হয়ে রইলো।

বাইরে তাকাই। গাড়ি ছুটে চলেছে পাহাড়ের গা বেয়ে, পাহাড়ী নদীর তীরে তীরে আর সবুজ উপত্যকার বুক চিরে।

মানসীও তাকিয়ে ছিল বাইরে। হঠাৎ চোখ ফেরায় সে। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আমাদের পথ তো ফুরিয়ে এলো, কিন্তু তোমার হিমাচল পরিক্রমার কথা পূর্ণ হল না—শোনা হল না লাহুল উপত্যকার কথা।"

"সে কথা আর আজ নয় মানসী। সে কাহিনী না-বলা থাক।"

"তাতে লাভ?"

"আশা করা যাক, সেই কাহিনী বলার জন্যে আবার একদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে আমার।"*

"কিন্তু জীবনে যে সব আশা পূর্ণ হয় না সখা।"

"তবু সে সত্যকে মানুষ মেনে নিতে পারে না। মানুষ আশা করে।"

"আর তাই মানুষ ব্যথা পায়, বিরহ-বেদনা ভোগ করে।"

"ব্যথা আর বিরহ আছে বলেই তো আজও পৃথিবীটা একঘেয়ে হয়ে যায় নি, এই যান্ত্রিক যুগেও জীবনে কিছু বৈচিত্র্য আছে।"

মানসী চুপ করে আছে।

আমিও নীরব থাকি। কি বলব? আলোচনাটা যে অন্য খাতে বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেন? হয়তো এই নিয়ম।

"চমৎকার।" মানসী হঠাৎ হেসে ওঠে। হাসতে হাসতেই বলে, "এই না হলে লেখক। কিন্তু দোহাই তোমার গায়ক হয়ো না। সুর করে বলে উঠো না—প্রেম যদি জেগে রহে, দূর কভু দূর নহে।"

"কথাটা তো মিথ্যে নয়।" আমি বলি।

"একটা উদাহরণ দাও।"

"আজ আমরা পাশাপাশি বসে আছি, কিন্তু আগামীকাল এমন সময় —তুমি শেয়ালদা একস্প্রেসে কলকাতার যাত্রী আর আমি পাঠানকোটে

* লেখকের 'লীলাভূমি-লাহুল' দ্রষ্টব্য।

আমার সহযাত্রীদের প্রতীক্ষায় বসে আছি।"

"অর্থাৎ তোমার ও আমার মাঝে বিস্তর ব্যবধান, এই তো।"

"না। প্রকৃত ব্যবধান তো দূরত্ব দিয়ে স্থির হয় না মানসী। তুমি শেয়ালদা এক্সপ্রেসে বসে আজকের কথা ভাবছ, আমিও পাঠানকোটে বসে আজকের কথা ভাবছি। আমরা দুজনে দুজনের কথা ভাবছি, আমরা তখনও এমনি কাছাকাছি।"

মানসী বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ি চলেছে ছুটে। চলেছে যোগিন্দর নগর থেকে পাঠানকোটে।

গাড়ি থামল বৈজনাথ মন্দির স্টেশনে। যোগিন্দর নগর থেকে প্রকৃত দূরত্ব মাত্র ১৭ মাইল আর পাঠানকোট এখান থেকে ৯০ মাইল। এখানকার উচ্চতা ৩১০০ ফুট। দূরত্ব যাই হোক যোগিন্দর নগর থেকে এই পথটুকু আসতে আমাদের দু ঘণ্টা লেগেছে।

হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "একটু চা খাবো।"

আমি উঠে দাঁড়াই। এগিয়ে চলি দরজার দিকে।

মানসী জিজ্ঞেস করে, "কোথায় চললে?"

"চা আনতে।"

"আমিও নামব তোমার সঙ্গে।"

"কি দরকার? ঐ তো সামনেই দোকান, আমি নিয়ে আসছি।"

"দরকার আছে বৈ কি। অভ্যেসটা যে খারাপ করে দিয়েছ এ ক'দিনে। কাল শেয়ালদা এক্সপ্রেসে তো আমাকে কেউ চা এনে দেবে না, নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হবে।"

জনৈক সহযাত্রীকে আমাদের মালের ওপর একটু নজর রাখতে বলে আমরা গাড়ি থেকে নামি। বৈজনাথ মন্দির ছোট স্টেশন। শহর এখান থেকে একটু দূরে—পরের স্টেশন বৈজনাথ পাপরোলায়। কিন্তু মন্দির এখান থেকে খুবই কাছে। মন্দিরের জন্যই পর্যটকরা আসেন এখানে। প্রাচীন মন্দির। মন্দিরের গঠনশৈলী অসাধারণ না হলেও, মন্দিরগাত্রের কারুকার্য বড়ই সুন্দর। মন্দিরের প্রধান বিগ্রহ শিবলিঙ্গ। একটি রুপোর সাপ লিঙ্গমূর্তিকে বেষ্টন করে আছে।

চা খেয়ে আমরা ফিরে আসি গাড়িতে। একটু বাদে গাড়ি ছাড়ে। মানসী বলে, "এক বৈজনাথের কথা পড়েছিলাম তোমার 'গিরি-কান্তারে'..."

"হ্যাঁ।" আমি বলি, "কুমায়ুনের বিখ্যাত উপত্যকা, কাত্যুরী রাজাদের

রাজধানী বৈজনাথ।"

"আর এক বৈজনাথে এলাম তোমারই সঙ্গে। সেদিন তো ভাবতে পারি নি যে এমনটি হতে পারে?"

"এই তো জগতের নিয়ম মানসী! গতকালের কল্পনা আজ বাস্তবে রূপায়িত হয়।"

"আর আজকের বাস্তব আগামীকালের কল্পনায় পর্যবসিত হয়।" মানসী যোগ করে। সে আবার বাইরে তাকিয়ে আছে। এমন অপরূপা প্রকৃতিকে দু চোখ ভরে দেখা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু মানসী বোধ হয় কিছুই দেখছে না —কেবল চোখ দুটিকে আমার দিক থেকে সরিয়ে রাখার জন্যই যেন বাইরে তাকিয়ে আছে।

আমরা শব্দহীন কিন্তু গাড়িটা সশব্দে চলেছে এগিয়ে—চলেছে আমাদের নিয়ে। যাত্রীদের হাসি-কান্নায় ওর কি যায় আসে?

কিন্তু মানসী কথা বলছে না কেন? তার মনের আকাশে কি মেঘ জমছে? এই নীরবতা কি তার না-বলা কথা বলারই পূর্বাভাস?

অনেক মেঘ পুঞ্জীভূত হোক মানসীর মনে। তার পরে অবিশ্রান্ত ধারায় বর্ষণ শুরু হোক্। আমি চাতকের মতো সেই শ্রাবণধারার প্রতীক্ষায় থাকি।

আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়। মানসী কথা বলে। কিন্তু যে-কথা শুনতে চাই, সে-কথা নয়। সে বলে, "এখানে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ গাড়ি থামবে। চলো নেমে একটু পায়চারি করা যাক।"

ইতিমধ্যে গাড়ি এসে থেমেছে বৈজনাথ পাপরোলা স্টেশনে। বেশ বড় স্টেশন। এখানকার উচ্চতা ৩১৩১ ফুট।

মানসীর সঙ্গে গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসি। দুজনে পায়চারি করতে থাকি।

হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "রাগ করলে?"

"না, রাগ করব কেন?"

"তাহলে কথা বলছ না যে!"

"এমনি। তুমিও তো বলছ না কিছু।"

"আমার যে বলার পালা নয়।" মানসী হাসে। "আমি তো শুনব।"

"আরও শুনতে ইচ্ছে করছে?"

"হ্যাঁ। সারা জীবন ধরে তোমার কথা শুনতে রাজী আছি আমি।"

"তোমার অসীম ধৈর্য।" আমি হেসে বলি।

মানসীও হাসে, "আশীর্বাদ করো চিরকাল যেন এমনি ধৈর্যশীলা হয়ে থাকতে পারি।"

নাগরোতা পেরিয়ে গাড়ি এসে থামে কাংড়া মন্দির স্টেশনে। যোগিন্দর নগর থেকে আমরা ৪২ মাইল এসেছি। এখান থেকে পাঠানকোট ৬১ মাইল। এখানকার উচ্চতা মাত্র ২১৫০ ফুট। কাজেই বেশ গরম লাগছে। কিন্তু সে কথা না বলে মানসী জিজ্ঞেস করে, "বজ্রেশ্বরী মন্দির এখান থেকে কত দূর?"

"খুবই কাছে। গাড়ি ছাড়লে দেখা যাবে মন্দিরচূড়া।"

"আমার তো আর দেখা হল না। সংক্ষেপে একটু বল না কেমন মন্দির।" মানসী বলে।

"ইচ্ছে করলেই দেখে যাওয়া যায়। দয়া করে দুটো দিন সময় দিলে কাংড়া ও জ্বালামুখী মন্দির দেখিয়ে পাঠানকোটে পেঁাছে দিতে পারি।"

"কিন্তু আমার যে রিজার্ভেশান হয়ে গেছে।"

"ওটা ক্যানসেল করা যায়।"

"আমার যে বড্ড বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করছে।" মানসী আমার দিকে তাকায়।

"তাহলে থাক্। আমি সংক্ষেপে কাংড়া মন্দিরের কথা বলছি।"

"বলো।" মানসী মনোযোগী হয়।

আমি বলি, "সুবিরাট তোরণ পেরিয়ে সুপ্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ—পাথর বাঁধানো। চারিদিকে উঁচু পাঁচিল। প্রাঙ্গণের মাঝখানে সুন্দর নাটমন্দির। চারিদিকে পেতলের রেলিং। কেন্দ্রস্থলে ধর্মশিলা।

"নাটমন্দিরের শেষে গর্ভমন্দির। ছোট কিন্তু ভারী সুন্দর। কারুকার্য খচিত। কাংড়া স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মন্দিরে পাথরের বিগ্রহ। মূর্তি নয়, একখানি নিরেট পাথরে কেবল দুটি চোখ আঁকা। রুপোর বেদীর ওপরে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরে ঝুলছে অসংখ্য রুপোর ছত্র। পূজার উপকরণও সব রুপোর।

"গর্ভ-মন্দিরের পেছনে রয়েছে বিরাট একটি বটগাছ। তারই ছায়ায় আরও দুটি মন্দির—শিব ও কালী মন্দির।"

কাংড়া স্টেশনে এসে গাড়ি থামে। মানসী বলে, "এখান থেকে কিছু খেয়ে নিলে হত।"

আমি নেমে গিয়ে খাবার নিয়ে আসি। একসময় গাড়ি ছেড়ে দেয়।

কাংড়া উপত্যকার ভেতর দিয়ে গাড়ি চলেছে ছুটে। বিচিত্র এই উপত্যকা। জেনারেল ক্রসের ভাষায়—'a district of small broken hills usually well-clothed with jungle and of rich cultivation, and presenting a great contrast to the deadly plains of Punjab.'

সেই বিচিত্র কাংড়া উপত্যকার ভেতর দিয়ে পাঞ্জাবের দিকে এগিয়ে চলেছি। হিমাচল প্রদেশের কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তটি নিকটতর হচ্ছে। হিমালয়ের কাছ থেকে চলে যাচ্ছি দূরে। আবার আগামী বছর আসব হিমালয়ে। কিন্তু হিমাচলে কি আর আসা হবে? হিমালয় অসীম ও অনন্ত, জীবন সীমিত, যৌবন স্বল্পতর, সুযোগ নেহাতই সামান্য। বছরে একবারের বেশি হিমালয়ে আসা সম্ভব হয় না। প্রতি বছর নতুন জায়গায় গিয়েও হিমালয়ের কতটুকুই বা দেখতে পেরেছি, কতটুকুই বা দেখতে পারব বাকী জীবনে? কাজেই এক জায়গায় দুবার আসার প্রশ্ন অবান্তর। হিমালয়ে আসব কিন্তু মানালীর মালঞ্চে হয়তো আর আসা হবে না।

নজর পড়ে মানসীর দিকে। সে আবার তেমনি তাকিয়ে আছে বাইরে। সে-ও কি আমারই মতো হিমাচলকে দেখছে, মানালীর কথা ভাবছে?

আস্তে আস্তে ডাক দিই, "মানসী!"

"এ্যাঁ, হ্যাঁ……কিছু বলছো?" মানসী যেন অন্য কোন জগতে চলে গিয়েছিল, আমার ডাকে ফিরে আসে কাছে।

"কার কথা ভাবছিলে?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তোমার কথা।" মানসী আমার দিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়।

"হঠাৎ আমার এ সৌভাগ্য?"

"আমি তোমার দুর্ভাগ্যের কথা ভাবছিলাম।"

"দুর্ভাগ্য?"

"হ্যাঁ। আমাকে এতো কাছে পেয়েও তুমি আটকে রাখতে পারলে না।"

"স্বেচ্ছায় কেউ দূরে সরে গেলে, কেমন করে তাকে কাছে রাখি?"

"কেন—জোর করে?"

"সংসারের সর্বত্র কি জোর খাটে মানসী?"

"নিশ্চয়ই খাটে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

"তাহলে বলতে হয়, আমি তেমন বীর নই।"

"কে বললে এ কথা? তুমি যেমন তেমন বীর নও, তুমি মহাবীর।"

"প্রশংসা করছ কি? ঠিক বুঝতে পারছি না।"

মানসী হাসে। বলে, "বুঝবে কেমন করে? তুমি যে বড্ড বোকা।"

"শুনেছি প্রেমে পড়লে, মানুষ নাকি বোকা হয়ে যায়।"

"দোহাই তোমার, এই বয়সে আর প্রেমে পড়ো না, বড্ড বে-মানান হবে।" মানসী গম্ভীর ভাবে বলে ওঠে।

আমি হেসে জবাব দিই, "জ্ঞানীরা বলেন, হিমালয়ের মতো প্রেমেরও নাকি বয়স বলে কিছু নেই।"

"উদাহরণ স্বরূপ তাঁরা বোধ হয় চার্লি চ্যাপলিনের নাম করেন।" সঙ্গে সঙ্গে মানসী মন্তব্য করে, "তবে তুমি তাঁদের বলো, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। তাঁরা যদি মনে করেন, তোমার এখনও প্রেমে পড়ার বয়স আছে, আমার বলার কিছু নেই। তবে আমি কিন্তু মনে করি আমার প্রেমে পড়ার বয়স অতিক্রান্ত হয়েছে।"

"তাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

"তার মানে তুমি আমার প্রেমে পড়তে বদ্ধপরিকর।"

"তা ছাড়া আর উপায় কি? তুমি যে আমাকে ভালবেসে ফেলেছো।"

মানসী যেন চমকে ওঠে। সে একবার আমার দিকে তাকায়, তারপরে মাথা নিচু করে নীরব থাকে।

একটু বাদে আমি আবার বলি, "চুপ করে রইলে কেন? বলো সত্যি কিনা?"

"হ্যাঁ।" মানসী শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"তাহলে আজ আমাকে পাঠানকোটে রেখে তুমি চলে যাচ্ছ কেন? এসো, আমরা আরও কয়েকটা দিন একসঙ্গে থাকি, তারপরে একই সঙ্গে কলকাতায় ফিরব।"

"তা হয় না সখা! চিরস্থায়ী কোন জিনিসই মধুর হয় না। মানুষ মরণশীল বলেই জীবনটা মধুর। শেষ হয়ে যাচ্ছে বলেই আমাদের এই হিমাচল-পরিক্রমাকে আজ এত মধুর বলে মনে হচ্ছে।" একবার থামে মানসী। তার পর আবার বলে, "তোমাকে আমি ভালোবেসেছি আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে। তবু আমি আজ চলে যাচ্ছি তোমাকে ছেড়ে।"

"কেন?" আমি অসহিষ্ণু স্বরে বলি।

"যাচ্ছি কারণ আমি আমার ভালোবাসাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তুমি আমার ভালোবাসাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করো, আমাকে হাসিমুখে বিদায়

দাও।"

মানসী তাকায় আমার দিকে। সে আমার প্রতিশ্রুতি চাইছে।

কি বলব? কেমন করে আমি তাকে বিদায় দেব?

মানসী এখনও তাকিয়ে আছে। আমি চোখ নামিয়ে নিই।

"কথা বলছো না কেন?" মানসী কথা বলে, "আমি তো হারিয়ে যাবো না তোমার জীবন থেকে। আমি তোমার মনের মণিকোঠায় মণিদ্বীপ জ্বালিয়ে রাখব। কর্মব্যস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের অবসরক্ষণে তোমার মনে পড়বে আমার কথা। মনে পড়বে তোমার মানসীর সঙ্গে পথ চলে তুমি হিমাচল-পরিক্রমা পূর্ণ করেছো।"

গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে জ্বালামুখী রোড স্টেশনে। আমি উঠে দাঁড়াই। মানসী বলে, "কোথায় চললে?"

"একটু প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করা যাক্।"

"চলো, আমিও যাবো।"

দুজনে নেমে আসি প্ল্যাটফর্মে। ছোট স্টেশন। আমরা নীরবে পায়চারি করতে শুরু করি। হঠাৎ মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখান থেকে জ্বালামুখী মন্দির কি ভাবে যায়?"

"বাসে করে।" আমি উত্তর দিই।

"কতক্ষণ লাগে?"

"প্রায় ঘণ্টাখানেক।" একবার থামি। তার পরে একটু হেসে বলি, "এখুনি তো বলবে জ্বালামুখীর কথা বলো।"

মানসী হাসে। বলে, "তুমি সত্যই অন্তর্যামী। তা জানতেই যখন পেরেছো, তখন সংক্ষেপে শুনিয়ে দাও দেখি জ্বালামুখীর কথা।" একবার থামে সে। তার পরে করুণ স্বরে বলে, "সময় তো ফুরিয়ে আসছে সখা! কাল তো আর কেউ তোমার কাছে এমন করে গল্প শুনতে চাইবে না।......"

আরও যেন কিছু বলার ছিলো। কিন্তু বলতে পারল না সে। কেবল বুঝতে পারলাম অনেকগুলি না-বলা কথা তার বুকের মাঝে বন্দী হয়ে রইল।

থাক্ গে। যা বলে নি, তা-না হয় নাই বা শুনলাম। যা বলেছে তা-ও তো মিথ্যে নয়। সেদিন মানালীতে দেখা হবার পর থেকে এ ক'দিন কতো গল্প বলেছি ওকে, আজ সে চলে যাচ্ছে। কাল আর মানসী আমার কাছে হিমাচলের কথা শুনতে চাইবে না।

আমি বলতে শুরু করি, "এই জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে নিয়মিত বাস যাতায়াত করে জ্বালামুখী মন্দিরে। বাস গিয়ে থামে গোপীনাথ কুঠিয়াল ধর্মশালার সামনে। আরও দুটি ধর্মশালা আছে জ্বালামুখীতে। আশ্রয়ের অভাব হয় না।

"ধর্মশালার সামনেই পাহাড়ের গায়ে মন্দির—শ্বেত পাথরের মন্দির। মন্দিরশীর্ষ সোনালী পাত দিয়ে মোড়া—সোনার মতোই উজ্জ্বল।

"মূল-মন্দিরে কোন মূর্তি নেই। নেই কোন আলো। তার দরকারও নেই। জ্যোতিস্বরূপা দেবী বিরাজ করছেন মন্দিরে। দেওয়ালে ও মেঝেতে জ্বলছে অনির্বাণ শিখা—মায়ের অগ্নিজিহ্বা। সেই আলোয় আলোকিত মন্দির।

"পেছনের দেওয়ালের মধ্যস্থলে জ্বলছে একটি স্থির অকম্পিত শিখা—দেবীর আসল রূপ। অন্যান্য শিখাসমূহ আদ্যাশক্তির এক-একটি অংশ। দেবীর এমন জাগ্রত রূপ আর কোথাও নেই। দেবী নিজেই ভোগ গ্রহণ করেন জ্বালামুখী মন্দিরে।"

"এই, গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে।" মানসী হঠাৎ বলে ওঠে।

সত্যই তাই। তাড়াতাড়ি দুজনে এসে গাড়িতে উঠি। গাড়ি চলতে শুরু করেছে। আমরা নিজেদের জায়গায় বসি। মানসী বলে, "পাঠানকোট আর কতদূর?"

"কেন?" পাল্টা প্রশ্ন করি।

"আর কতক্ষণ আমরা এমন কাছাকাছি থাকব?"

"বড় জোর ঘণ্টা-চারেক। জ্বালামুখী রোড স্টেশন থেকে পাঠানকোট ৫২ মাইল। আমরা যোগিন্দর নগর থেকে ৫১ মাইল এসেছি।"

"ও।" স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে মানসী। "তাহলে অর্ধেক পথও ফুরোয় নি। আরও চার ঘণ্টা, না চার ঘণ্টাই বা বলি কেন, রাত সাড়ে আটটায় শেয়ালদা একস্প্রেস ছাড়বে। আরও সাত ঘণ্টা আমরা একসঙ্গে থাকব।" মানসী বলে।

আমি চুপ করে থাকি। ভাবি মানসীর কথা। আজ যেন এক নতুন মানসীকে দেখছি। মাঝে মাঝেই সে কেমন ধৈর্যহারা, বিচলিতা। তবে কখনই তার সংযমের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে না।

গাড়ি চলেছে ছুটে। এক সময় তার চলার পালা সাঙ্গ হবে। আমাদেরও পথ যাবে ফুরিয়ে।

হঠাৎ মানসী বলে ওঠে, "এ কি! এমন চুপ করে আছো কেন?"

এই নিয়ে কয়েকবার সে একই কথা বলল। সে যেন নীরবতাকে সইতে পারছে না। তবু আমাকে স্বীকার করতে হয়, "বলার মতো কোন কথাই যে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"তাহলে কি এমনি মুখোমুখি বসে নিঃশব্দে এই অমূল্য সময়টুকু কাটিয়ে দেব?"

"মন্দ কি?"

"না।" মানসী বলে, "আমার একদম ভালো লাগছে না। আমি এমন চুপচাপ বসে থাকতে পারব না। তুমি বলো, যা হোক কিছু বলো, আমি শুনি।"

"বলার মতো কোন কথাই যে আমার মনে আসছে না মানসী। তার চেয়ে তুমি বলো, আমি শুনি। তুমি আজ আমাকে তোমার কথা বলো।"

মানসী চুপ করে থাকে।

আমি আবার বলি, "জানি, তোমার সঙ্গে আমার শর্ত আছে। তোমাকে ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন করতে পারব না। আমি আজ সে শর্ত ভঙ্গ করছি। তোমার কথা আজ আমার বড্ড শুনতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি থাকে, তাহলে বরং থাক্।"

"আপত্তি?" মানসী হাসে, "সেদিন ছিল, আজ নেই। কেন জানো?"

"না।"

"সেদিনকার তুমি আর আজকের তুমি এক নও। সেদিন যে-কথা তোমাকে বলব না ভেবেছিলাম, আজ তোমাকে সে-কথা বলা একান্তই প্রয়োজন। তোমার জানা দরকার, কেন আমি এমন একা একা হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছি। জানা দরকার আমার এই জীবনটার কথা। জানা দরকার সেই বঞ্চনার ইতিহাস, যা তোমার মানসীর মধুর জীবনটাকে বিষাক্ত করে দিয়েছে।" মানসী থামে।

আমি ওর দিকে তাকাই। দুজনে চোখাচোখি হয়। মানসীর চোখ দুটি ছলছল করছে। সে চোখ নামিয়ে নেয়। তার পরে বলতে শুরু করে, "সখা, আমার চেয়ে ভাগ্যহীনা বড় বেশি জন্মায় না পৃথিবীতে। নিজের জীবনের বিনিময়ে মা জন্ম দিয়েছেন আমাকে। আমার জন্মক্ষণে মা মৃত্যু বরণ করেছেন। আশ্চর্য, আমি কিন্তু মরি নি, আজও আছি বেঁচে!

"যে মেয়ে জীবনে মুহূর্তের তরে মাতৃস্নেহের আস্বাদ পেলো না, তার চেয়ে বেশি দুঃখী এ সংসারে কে আছে বলো! অথচ সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছিলাম আমি। বাবা বিলেতফেরত ডাক্তার। বাড়ি-গাড়ি, বেয়ারা-বাবুর্চি ও গভর্নেস কিছুরই অভাব হয় নি। তাদের তদারকির জন্ম ছিল আমার বিধবা পিসিমা। সে কোন দিন আমাকে মায়ের অভাব বুঝতে দেয় নি। সবার ওপরে বাবা আর তাঁর সীমাহীন স্নেহ। এখনও আমার কোন ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে বাবা রক্ষা রাখে না। বাড়িসুদ্ধ সকলের কৈফিয়ত তলব করে।

"বাবা ও পিসীমার মাত্রাহীন আদরের মধ্যে বড হয়েছি আমি। ফলে যেমনটি হবার তেমনটি হযেছি। ছোটবেলা থেকেই আমি অত্যন্ত একগুঁয়ে ও জেদী। যা একবার মনে হয় তা করতে না পারলে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করি। আর এই একগুঁয়ে স্বভাবের খেসারত দিতেই আজ আমাকে হিমালয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে।"

"কি রকম?" মানসীর মুখের দিকে তাকিযে প্রশ্ন করি।

মানসী হাসে। বড়ই করুণ হাসি। এমনি হাসি আমি সেদিন দেখেছিলাম মানালীতে। তার পরে মানসীর অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু সেই করুণ হাসির হয় নি কোন পরিবর্তন।

তবে সে-হাসি সেদিনকার মতো আজও ক্ষণস্থায়ী। একটু বাদেই মিলিযে যায় মানসীর মুখ থেকে। সে গম্ভীর স্বরে বলে, "যে কথা এমন করে আর বলি নি কাউকে, সেই কথাই আজ বলব তোমাকে। কেন জানো?"

"না।"

"বাড়ির বাইরে যে এমন আপন-জনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয় নি।"

আমি চুপ করে থাকি।

মানসী বলে, "সে কথা শুরু করতে হবে দশ বছর আগের এক বাসন্তী বিকেল থেকে।" মানসী থামে। একবার বাইরের দিকে তাকায়। গাড়ি ছুটে চলেছে, আমরা চলেছি। মানসীর মানসপটে ভেসে উঠেছে তার ফেলে-আসা জীবনের ছবি।

মানসী মুখ ফিরিয়ে নেয়। আমার দিকে তাকায়। সে শুরু করে, "হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। বাবা ছুটি নিতে পারবে না। কোথাও যেতে পারি নি। সিনেমা থিয়েটার লেক আর রেস্তোরাঁয় বসে দিনগুলি কাটিয়ে দিচ্ছি। এমন সময় ছোড়দা একদিন কলেজ থেকে ফিরে

এসে জিজ্ঞেস করে—"পুরী যাবি নাকি? কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছি দিন সাতেকের জন্য।"

"যাবো।" বলে চেঁচিয়ে উঠলাম।

ছোড়দা পরামর্শ দিল—"বাবাকে বল তাহলে।"

"সন্ধ্যার পরে বাবা চেম্বার থেকে ফিরে এলে তাঁকে বললাম কথাটা। বাবা ছোড়দাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন সব। আমার সমুদ্র সৈকত ভ্রমণ মঞ্জুর হল।

"কয়েকদিন বাদেই ছোড়দা ও তার বন্ধুদের সঙ্গে রওনা হলাম নীলাচলে, পূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্র সৈকতে। সেই আমার প্রথম সমুদ্র দর্শন। জীবন-সমুদ্রের সৈকতে দাঁড়িয়ে যৌবনকে আবিষ্কার করলাম।"

"কি রকম?"

"ছোড়দা ও তার চার বন্ধু গিয়েছিল আমার সঙ্গে। ওরা সবাই বি. এ. ক্লাসের ছাত্র, সবে যৌবনের বেলাভূমিতে পা রেখেছে। ওরা সবাই সমান উৎসাহী হয়ে উঠল আমার সম্পর্কে। গাড়িতে ওঠার পরই আমার সর্ববিধ সুখ-সুবিধার প্রতি প্রখর নজর দিতে আরম্ভ করল। আমার মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেল ওদের মধ্যে।

"বিমলেন্দু সে প্রতিযোগিতায় ক্রমেই পেছিয়ে পড়তে থাকল। না পড়ে উপায় কি। সে যে ছিল সবার চেয়ে লাজুক ও মুখচোরা। তার বাবা নেই, সে বড়ই গরীব। ছোড়দারা চার বন্ধু মিলে তার পুরী বেড়াবার খরচ দিয়েছে। সে দেখতে সুন্দর, লেখাপড়ায় ভাল—ছোড়দারা ভালোবাসে তাকে।

"আমারও ভাল লেগেছিল বিমলেন্দুকে। তাই সেদিন সন্ধ্যায়···" হঠাৎ থেমে যায় মানসী।

"থামলে কেন?" আমি বলে উঠি।

মানসী হাসে, তেমনি করুণ হাসি। বলে, "একটু আগের থেকে, মানে সেদিন বিকেল থেকে বলতে হবে।"

"বেশ বলো।"

"সেদিন বিকেলে তাস নিয়ে বসল ওরা। ভালো ছেলে বিমলেন্দু। সে তাস খেলতে পারে না। একখানা বই নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। আমি ওদের তাস খেলা দেখতে থাকলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল, কিন্তু ওদের তাস খেলা শেষ হল না। শেষ ডিলে ড্র হওয়ায় ওরা আবার নতুন করে

খেলতে বসল। আমি বিরক্ত হয়ে একাই বেরিয়ে পড়লাম।

"একলা ঘুরতে ভাল লাগল না বেশিক্ষণ। একটু নিরিবিলি দেখে একটা উঁচু বালিয়াড়ির কোলে বসলাম, যাতে ছোড়দারা খুঁজে না পায় আমাকে।

"কিন্তু যে পথ চেয়ে বসে থাকে, তার কাছে কি হারিয়ে যাওয়া যায়? আঁধার-ছাওয়া সাগরবেলায় সে আমাকে খুঁজে পেলো। মুখচোরা বিমলেন্দু মুখর হল। সোজাসুজি প্রেম নিবেদন করল। লাজুক বিমলেন্দু আমার সব লজ্জা দূর করে দিল। আমি যৌবনকে আবিষ্কার করলাম। পুরুষের প্রথম পরশে আমার কুমারী জীবন পল্লবিত হয়ে উঠল।

"আঁধার সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সেদিন আমি আলোকময় ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর হয়েছিলাম। বিমলেন্দুকে মনে হয়েছিল আমার যৌবনের আলো, জীবন-নায়ের কাণ্ডারী। জানতাম না যে সেই সুদর্শন ও মেধাবী ভাল ছেলেটি আমাকে একদিন মাঝ-দরিয়ায় ডুবিয়ে দিতে পারে, আর সেই আঁধার ঘেরা সাগরের মতো আমার জীবনটাও অন্ধকারময় হয়ে যেতে পারে।"

"কেন এমন হোল?" আমি মাঝখান থেকে প্রশ্ন করি।

"কেন?" মানসী আবার হাসে। তেমনি করুণ হাসি। "উচ্চ-মধ্যবিত্ত মহলে জীবনটা যে পয়সার শেকলে বাঁধা। মায়া-মমতা স্নেহ-ভক্তি প্রেম-ভালোবাসা সবই সে সমাজে টাকা দিয়ে ওজন করা হয়।"

"কিন্তু এ-কথা তো বিমলেন্দুর বেলায় খাটে না। সে গরীবের ছেলে।"

"সব গরীবই তো চিরকাল গরীব থাকে না। কোন কোন গরীব বড়লোক হয়। বিমলেন্দু আর গরীব নেই, সে এখন মিস্টার বি. মিত্র, বার-এ্যাট্-ল।"

"বিমলেন্দু কি ব্রাহ্মণ নয়?" আমি প্রশ্ন করি।

"না।"

"তাই কি তোমার বাবা আপত্তি করেছিলেন?"

"না। আমার বাবা বিলেতফেরত ডাক্তার। বামুন-কায়েতের কোন পার্থক্য নেই তার কাছে। তবে কেন জানি না—বাবা বিমলেন্দুকে কোন দিনই খুব একটা সুনজরে দেখে নি। তবু বাবা বাধা দেয় নি আমাকে। সব শুনে শুধু জিজ্ঞেস করেছিল—তুই কি সব কিছু ভাল করে ভেবে দেখেছিস মা? আমি মাথা নেড়েছিলাম। বাবা মত দিয়েছিল বিয়ের।"

"বিয়ের?" আমি চমকে উঠি।

মানসী হাসে। বলে, "হ্যাঁ সখা, তোমার মানসী বিবাহিতা।" সে একবার থামে। তার পরে বলে, "সাত পাক ঘুরে, শাঁখা সিঁদুর পরে বিয়ে

হয়েছিল আমার। তাই সেদিন বলেছিলাম সিঁদুর আমার কাছে খানিকটা লাল রঙ ছাড়া আর কিছুই নয়। সিঁদুরের রঙ আমার মনকে আর কোনদিন রাঙাতে পারবে না।"

"ক'বছর বাদে বিয়ে হল ?" আমি প্রশ্ন করি।

"চার বছর। বিমলেন্দু তখন এম. এ. পাস করে ল-কলেজের ছাত্র আর আমি এম. এ. পড়ি। মহা ধুমধাম করে বাবা বিয়ে দিলেন আমাদের। বিয়ের পরে বিমলেন্দু রইলো আমাদের বাড়িতে, আমার কাছে। মিথ্যে বলে বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিমলেন্দুকে দেবার পালা শেষ হল। বিয়ের পরে সে নিজেই বাবার কাছ থেকে টাকা নিত।"

"তোমার বাবার অনিচ্ছার কি কোন বিশেষ কারণ ছিল ?"

"কেমন করে বলব, বাবা কখনও বলে নি সেকথা। তবে বাবার ইচ্ছে ছিল তার এক বন্ধুর ডাক্তার ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে দেয়। বাবা নাকি কথাও দিয়েছিল বন্ধুকে। কথা না রাখতে পারার জন্য বন্ধুমহলে বাবাকে একটু অপদস্থ হতে হয়েছিল। তবু বাবা কখনই আমার ওপরে তার ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দেয় নি।" মানসী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে, "আজ ভাবি বাবা যদি সেদিন তা করত, তাহলে হয়তো আজ আমার জীবনটা এমন পথে পথে কাটত না।"

"কিন্তু কেন এমন কাটছে ?"

"কেন ?" মানসী একটু থামে। তারপরে বলে, "তাহলে শোন—এল. এল-বি পাস করার পর বিমলেন্দু ব্যারিস্টারী পড়তে বিলেত চলে গেল। বাবাকে বলে আমিই তাকে বিলেত পাঠিয়েছি। বাবা তার ব্যারিস্টারী পড়ার যাবতীয় খরচ যুগিয়েছে। আর খরচটা সে একটু বেশিই করেছে— পরের পয়সা কি না! প্রথম দিকে বছরখানেক নিয়মিত চিঠি লিখেছে। কিন্তু ক্রমেই চিঠির সংখ্যা কমে আসতে থাকল। শেষদিকে টাকার তাগাদা ছাড়া কোন চিঠি আসত না। টাকা মানে নিয়মিত অঙ্কের ওপরে অতিরিক্ত দাবী। আমি ভাবতাম দাবীটা যুক্তিসম্মত। বাবা হয়তো সবই বুঝতে পারত, তবু বিনা প্রতিবাদে বিমলেন্দুর সে দাবী মিটিয়ে যেত, পাছে মেয়ের মনে কোন আঘাত লাগে।"

"তার পরে ?"

"তার পরে ব্যারিস্টারী পাস করে দেশে ফিরে এলো বিমলেন্দু। এলো আমাদের না জানিয়ে। কয়েক দিন বাদে বাবা জানতে পারলো খবরটা।

সে তখন হাইকোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করে দিয়েছে।"

"সে কি! সে তোমাদের বাড়িতে এলো না?"

"না।" মানসী আবার একটু হাসে। বলে, "কারণ তখন আর আমাকে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া আমার কাছে আসার বাধাও ছিল তার। সে একা বিলেত গেলেও, একা ফিরে আসে নি দেশে। সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে।"

"স্ত্রীকে! আবার বিয়ে করেছে বিমলেন্দু?"

"হ্যাঁ। আর তা করেছে দু বছর আগে। তার মানে সেই বিয়ে করার পরেও বাবার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা নিয়েছে সে।"

"প্রতারক।" আমি নিজের অজ্ঞাতে বলে উঠি।

"না।" মানসী বলে, "প্রতিভাবান, জিনিয়াস। জাতে উঠতে হলে মানুষকে এমন করতে হয়। শ্বেতাঙ্গিনীর স্বামী হবার একটা আলাদা মর্যাদা আছে আমাদের সমাজে। তবে মেয়েটির কোন দোষ নেই। সে আমার কথা কিছুই জানত না।"

"তুমি আইনের আশ্রয় নাও নি?"

"নেবার ইচ্ছে ছিল না তবে দাদাদের জন্য মামলা করতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিমলেন্দু যে প্রতারণা করেছে, তার অকাট্য প্রমাণ ছিল আমাদের কাছে। বিয়ের ফটো ও তার চিঠি-পত্র। বিচারে হয়তো শাস্তি হত তার। কিন্তু..."

মানসী হঠাৎ থামে। আমি তার মুখের দিকে তাকাই। মানসী বলে, "কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেবল বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করিয়ে মামলা মিটিয়ে ফেলেছি আমি।"

"কেন?"

"নিরপরাধ ভিনদেশী অসহায়া মেয়েটির কথা ভেবে বিমলেন্দুকে শাস্তি দিতে পারলাম না। আমার তো বাবা আছে, দাদারা আছে, আত্মীয়-স্বজন সব আছে। কিন্তু ওর কে আছে? ভালোবাসার জন্য যে নিজের সমাজ ও দেশ ছেড়ে এতদূরে এসেছে, তার এত বড় সর্বনাশ আমি কেমন করে করি বলো?"

"কেবল তার কথাই ভাবলে, নিজের কথাটা ভাবলে না!"

"বিমলেন্দুকে শাস্তি দিলে যে মারিয়ার জীবনটা জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যেত। তাছাড়া শুনানীর আগের দিন আমাদের বাড়িতে এসে সে যে তার স্বামীর সম্মান ও নিজের শান্তি প্রার্থনা করেছিল আমার কাছে। আমি

তাকে ফিরিয়ে দিতে পারি নি। কেমন করে পারি বলো? মেয়ে হয়ে কোন মেয়ের এত বড় সর্বনাশ কি করা যায়? তাই আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, আমার যতো বড় ক্ষতিই সে করে থাক্, আমি তার কোন ক্ষতি করব না।

"আমার দরখাস্তে বিমলেন্দুর শাস্তি প্রার্থনা করেছিলাম। কিন্তু পরদিন আদালতে দাঁড়িয়ে আমি জজ সাহেবকে বললাম—আমি ওকে শাস্তি দিতে চাই না ধর্মাবতার! আপনি দয়া করে আমার বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করে বিমলেন্দুকে মুক্তি দিন।

"কেবল জজ সাহেব নন, আমার বাবা দাদা ব্যারিস্টার সলিসিটার, এমন কি বিমলেন্দু নিজে পর্যন্ত, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল। জজ সাহেব আমার এই অদ্ভুত আবেদনের কারণ জানতে চেয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম—বিমলেন্দু শাস্তি পেলে তো আমার সমস্যার সমাধান হবে না হুজুর! মাঝখান থেকে মারিয়ার জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। তার জীবনটাকে নষ্ট করে দেবার কোন অধিকার নেই আমার। আর বিমলেন্দু আমার যত ক্ষতিই করে থাক্ তার কোন ক্ষতি হোক, এ তো আমি চাইতে পারি না। তাকে যে আমি ভালোবেসেছিলাম, স্বামী বলে বরণ করেছিলাম।"

"চমৎকার! এমন আদর্শ রমণী হলে যে জীবনটা সুখের হবে না, এ তো জানা কথা।" আমি বলে উঠি।

আমার কথার কোন জবাব না দিয়ে মানসী বলে, "তুমি শুনে অবাক হবে, মারিয়া এখনও মাঝে মাঝে আমার কাছে আসে। আমাকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তবে আমি আর বিমলেন্দুর মুখদর্শন করি নি। সে-ও সাহস করে কোন দিন আমার সামনে আসে নি, আসবেও না।" থামে মানসী।

আমি কোন কথা বলি না। কি বলব? কিছুক্ষণ নীরবে কেটে যায়। হঠাৎ হেসে ওঠে মানসী। আমি তার দিকে তাকাই। সে বলে, "বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর হবার পরে আবার বাবার পদবীটা লিখতে শুরু করে দিলাম। প্রথম দিকে বেশ একটু অসুবিধে হত। কিন্তু আস্তে আস্তে অভ্যেস হয়ে এলো। মানুষ অভ্যেসের দাস।

"দাদারা অবশ্য আবার পদবী পাল্টাবার প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু আমি তা সমর্থন করি নি। কেন করব বলো? যে জীবনে এতো বঞ্চনা, সে জীবনের প্রতি কি আর কোন আসক্তি থাকতে পারে?"

"বাড়িতে তোমার কে কে আছেন?"

"বাবা আছে। আর কে থাকবে? দাদা ও ছোড়দা বাইরে থাকে,

দুজনেই বিয়ে করেছে। মাঝে মাঝে আসে। আমার কাছে বাবাই সব। আমার সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়, আমার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তুমি আমার বাবাকে দেখো নি সখা, অমন মানুষ হয় না। তাই তো মাঝে মাঝে বাবা বলে—আমি চোখ বুজলে, কে দেখবে তোকে? আচ্ছা, এ সব অগ্রিম চিন্তার কোন মানে হয়, তুমিই বলো। কতই বা বয়স হয়েছে। গত মাসে পঁয়ষট্টিতে পা দিয়েছে। আজকাল তো আশি নব্বুই বছর সবাই বাঁচে। আমার তো ধারণা বাবা আরও বেশি বাঁচবে।"

"তোমার পিসীমা কোথায়?"

মুহূর্তে মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে মানসীর। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ভারী স্বরে বলে, "স্বর্গে গেছে। বিমলেন্দু বিলেত থেকে বিয়ে করে এসেছে শুনে পিসীমা সেই যে বিছানা নিয়েছিল, আর তা ছাড়তে পারে নি। আমার পিসীমাকে মেরে ফেলেছে বিমলেন্দু। সে খুনী।"

কি বলব আমি? চুপ করে থাকি আর ভাবি—সেই খুনীকে ক্ষমা করেছে মানসী।

॥ আঠারো ॥

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন পাঠানকোট পৌঁছল। মানসীর সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দুজনে ক্লোক্‌রুমের সামনে আসি। মানসী জিজ্ঞেস করে, "এখানে কেন?"

"আমার রুকস্যাক ও কিটটা জমা রেখে দেব।"

"তার মানে, এবারে দুজনের মালপত্র আলাদা হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ। কিছুক্ষণ বাদে যে আমাদেরও আলাদা হয়ে যেতে হবে।"

"তা বটে।" মানসী শান্তস্বরে বলে।

মানসীর মুখের দিকে তাকাই। জিজ্ঞেস করি, "তোমার কি আজ না গেলেই নয়?"

মানসী আমার দিকে তাকায়। তার চোখে চোখ পড়ে আমার। আমি আবার বলি, "তোমার বাবা তো ভালই আছেন। দিন দুয়েক পরে রওনা হলে সবাই একসঙ্গে কলকাতায় ফিরতে পারতাম।"

"তাতে কি লাভ হত সখা?"

"আরও কয়েকটা দিন একসঙ্গে থাকা যেতো।"

"কয়েকটা দিন নিয়ে তো জীবন নয়। বিদায় যখন নিতেই হবে, তখন তাড়াতাড়ি নেয়াই ভাল। তাছাড়া তোমার সহযাত্রীদের কাছে আমার কি পরিচয় দেবে?"

আমি চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "তোমাকে তো বলেছি সখা, সংসারে আমার বাবা ছাড়া আর কেউ নেই। আমাকে তুমি বাবার কাছে ফিরে যেতে দাও।"

"বেশ, তাই যাও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর শতায়ু হোক্‌ কিন্তু একটা কথা—তোমার ঠিকানাটা দিয়ে যেও আমাকে।"

"কি হবে আমার ঠিকানা দিয়ে?"

"কলকাতায় ফিরে দেখা করব।"

"পথের পরিচয়কে কি পথেই শেষ করে দেওয়া ভাল নয়? কলকাতা যে বড়ই কঠিন।"

"তা হোক্‌ গে। তুমি ঠিকানাটা দাও।"

"না নিয়ে ছাড়বে না দেখছি।"

"না।"

"বেশ দেব। তুমি চাইলে কি আমি না দিয়ে পারি। যাক গে, এখন তো তোমার মালপত্র জমা রেখে আমাকে নিয়ে চলো ওয়েটিংরুমে। আমি স্নান সেরে নেব। তার পরে একবার বাজারে যেতে হবে।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করি।

"বাবার জন্য এক বাক্স আপেল নিয়ে যাবো।"

আর কথা না বাড়িয়ে মাল জমা দিতে ক্লোক্‌রুমের ভেতরে ঢুকি। কাজ সেরে মানসীকে নিয়ে আসি আপার ক্লাস লেডিজ ওয়েটিং রুমের সামনে। বলি, "ভেতরে যাও। মালপত্র বেয়ারার জিম্মায় রেখে স্নান করে নাও। আমি একটু বাদে আসছি।"

"কোথায় যাচ্ছ?" মানসী জিজ্ঞেস করে।

"একবার প্যাসেঞ্জার্স মেল-বক্সটা দেখে আসি। যদি কোন চিঠি-পত্র এসে থাকে।"

"হ্যাঁ, যাও। দেখো তো আমার কোন চিঠি আছে কি না? বাবার একটা চিঠি পেলে নিশ্চিন্তে গাড়িতে উঠে বসতে পারতাম। তাই বলে তুমি দেরি করো না যেন, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো কিন্তু।"

"আচ্ছা।" হাঁটতে থাকি। হাসি পায় আমার। এখনও আমার জন্ম ওর কতো উৎকণ্ঠা! অথচ আর কতক্ষণই বা আছি একসঙ্গে! সাড়ে ছ'টা বাজে, সাড়ে আটটায় ওর গাড়ি ছাড়বে।

স্টেশন মাস্টারের অফিসের সামনে দেয়ালের সঙ্গে ঝুলানো রয়েছে কাঠের একটা শেল্ফ্। তিনটি তাকই চিঠি-পত্রে বোঝাই। বহু টেলিগ্রামও রয়েছে। স্টেশন মাস্টারের কেয়ারে যাত্রীদের যতো চিঠি-পত্র আসে, সবই রেখে দেওয়া হয় এখানে। যাত্রীরা যাতায়াতের পথে নিজেদের চিঠি-পত্র নিয়ে যান। বহু যাত্রী নিতে আসেন না। তাঁদের চিঠি-পত্র পড়ে আছে। কয়েকজন যাত্রী নিজেদের চিঠি খুঁজছেন। আমিও হাত লাগাই।

দাশুর চিঠি পেলাম। মানালী থেকে লেখা আমার চিঠি ও টেলিগ্রামের উত্তর। প্রাণেশ ও বিশ্বদেব ভাল আছে। শেরপারা বেরিলী হাসপাতালে। তারা সেরে উঠছে। ইচ্ছে করলে আমরা যাবার পথে বেরিলীতে নেমে তাদের দেখে যেতে পারি।

মানসীর কোন চিঠি নেই। টেলিগ্রামগুলো দেখা যাক একবার। আমি খুঁজতে থাকি। এটা কার? হ্যাঁ, তারই নাম—মানসী মুখোপাধ্যায়। কিন্তু টেলিগ্রাম কেন? টেলিগ্রাম তো থাকার কথা আমার। মানসীর নামে টেলিগ্রাম? তাড়াতাড়ি খুলে ফেলি।

"তুমি এখনও চিঠি খুঁজছো?"

চমকে উঠি। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটা পকেটে রাখি। মানসী কাছে আসে। বলে, "দেখলে তোমার চিঠি খোঁজার মাঝে আমার স্নান হয়ে গেলো।"

"হ্যাঁ।" স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করি।

"পেলে কোন চিঠি?

"এঁ্যা, হ্যাঁ। দাশুর চিঠি এসেছে।"

"কি লিখেছেন?"

"বিশ্বদেব ও প্রাণেশ ভাল আছে। শেরপারা ভাল আছে।"

"আমার কোন চিঠি নেই?"

"না।" একবার থামি। তার পরে হেসে বলি, "আজ যে হঠাৎ যোগিনীর বেশ ধারণ করেছ?" সাদা খোলের শাড়ি ও সাদা জামা পরেছে মানসী।

"আজ যে মনের মানুষকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তাই মনের সঙ্গে রঙ

মিলিয়ে পোশাক পরেছি।"

"কিন্তু সাদা পোশাক তো গাড়িতে নোংরা হয়ে যাবে।"

"তাই তো পরলাম। নোংরাটা যাতে পোশাকের ওপর দিয়েই শেষ হয়ে যায়, মনের ওপরে কোন দাগ কাটতে না পারে।"

চুপ করে থাকি। মানসী আবার বলে, "চলো, চা খেয়ে বাজার থেকে ঘুরে আসি। বাবার জন্য আপেল নিতে হবে।"

চা খেয়ে স্টেশনের বাইরে এলাম। একটা রিকশায় উঠে বসলাম। মানসী হাসতে হাসতে বলে, "শেষবারের মতো ঘনিষ্ঠ হয়ে নাও।"

আমি চুপ করে বসে থাকি।

মানসী আবার বলে, "তাই বা বলি কেমন করে? হয়তো কোন এক শীতের সন্ধ্যায় আবার আমরা এমনি পাশাপাশি পথ চলব। মানুষ যে আগের থেকে কিছুই জানতে পারে না।"

আমি নীরব।

মানসী বলে, "মন খারাপ করছো কেন? এই তো জীবন। পৃথিবীটা যে পান্থশালা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই হাসিমুখে প্রিয়জনকে বিদায় দিতে হয়।"

আমি হাসি। মানসী হাসে। তেমনি করুণ হাসি।

আপেল কিনে ফিরে আসি স্টেশনে। রিজার্ভেশান কাউণ্টার থেকে মানসীর বার্থ নম্বর নিই। তার পরে বলি, "চলো, কিছু খেয়ে নেবে।"

"তুমি?"

"আমিও খাবো বৈ কি।"

"আচ্ছা, তোমার থাকার জায়গার তো কোন ব্যবস্থা করলে না?"

"করেছি। তোমার ট্রেন চলে যাবার পরে একটা রিটায়ারিং রুম পাবো।"

"ঠিক বলছো তো?"

"হ্যাঁ।" হাসি পায় আমার। স্বেচ্ছায় আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তবু আমার জন্য ওর কতো উৎকণ্ঠা। হয়তো এরই নাম ভালোবাসা।

মানসী বলে, "সাবধানে থেকো। ঠাণ্ডা থেকে গরমে এসেছো, একা একা কাটাতে হবে। নিজের ওপর একটু নজর রেখো।"

আমরা রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ঢুকি। মুখোমুখি দুখানি চেয়ারে বসি। বেয়ারা খাবার দেয়। মানসী বলে ওঠে, "এ কি, নিরামিষ?"

"তাই দিতে বলেছি।"

"কেন ?"

"যাত্রাপথে নিরামিষ খাওয়াই ভাল, বিশেষ করে রেলে মাছ-মাংস না খাওয়াই উচিত।" আমি খেতে শুরু করি।

মানসীও হাত লাগায়। বলে, "তাহলে কি গাড়িতেও আমি ভেজিটারিয়ান খাবার নেব।"

"তাই তো ভাল।"

"বেশ। আর তোমার অবাধ্য হব না।" মানসী খেতে শুরু করে।

"কখনও হয়েছো নাকি ?" জিজ্ঞাসা করি।

"হ্যাঁ। বহুবার।" মানসী উত্তর দেয়, "মানালীতে দেখা হবার পর থেকে অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি, অনেক অত্যাচার করেছি, অনেকবার অবাধ্য হয়েছি তোমার। তবু তুমি কিছু মনে করোনি। তুমি উদার তুমি অসীম, অসাধারণ তোমার ভালোবাসা। তবু তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার সব অপরাধ মার্জনা করো লক্ষ্মী।"

মানসীর চোখে জল। আমি মুছিয়ে দিতে পারি না। এখানে অনেক লোক। কেবল বলি "ছিঃ, তুমি কাঁদছ মানসী। যদি কখনও আমাকে অপ্রিয় কথা বলে থাকো, তুমি আমার পরমপ্রিয় বলেই বলতে পেরেছো। অত্যাচার যদি কিছু করে থাকো, তোমার সে অধিকার আছে বলেই করেছো। আর যে যার যতো বেশী বাধ্যের, সেই তো তার ততো বেশী অবাধ্য হয়। তোমার ক্ষমা চাওয়ার বা আমার ক্ষমা করার আর যে কোন সুযোগই নেই।"

প্ল্যাটফর্মে গাড়ি এসে গেছে। মানসীর মালপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট কামরার সামনে আসি। গাড়িতে উঠি। ওর মালপত্র গুছিয়ে রাখি। বিছানা খুলতে দেখে মানসী প্রতিবাদ করে ওঠে, "তুমি আবার হাঙ্গামা করছ কেন ? গাড়ি ছাড়ুক, আমিই বিছানা পেতে নেব। আজকাল আমি তো একাই চলা-ফেরা করি। এ-সব করার অভ্যেস আছে আমার।"

"এখনও তো একা নও তুমি। যতক্ষণ কাছে আছি, আমিই করে দেব। একটু আগে কথা দিয়েছো আর আমার অবাধ্য হবে না।"

মানসী কোন কথা বলে না। আমি ওর বিছানা পেতে দিয়ে বলি, "রাতে জানালা খুলে রেখো না। একটা চাদর ওপরে রেখে দিলাম, শেষরাতে শীত লাগলে গায়ে দিও। খাবারগুলো এখানে রইল, কাল সকালে খেয়ে নিও।"

মানসী ঘাড় নাড়ে। স্টেশনের ঘণ্টা পড়ে—ঢং ঢং ঢং। সময় সমাগত। আর পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ি ছাড়বে। যাঁরা আপনজনকে গাড়িতে তুলে দিতে

এসেছিলেন, তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে যাচ্ছেন। মানসী বলে ওঠে, "তুমি এখুনি নেমো না, এখনও তো পাঁচ মিনিট বাকি আছে।"

তবু আমি উঠে দাঁড়াই। মানসীও উঠে দাঁড়ায়। আমি কিছু বুঝে উঠবার আগেই সে সহসা নিচু হয়ে প্রণাম করে আমাকে।

বেরিয়ে আসি গাড়ি থেকে। প্ল্যাটফর্মে নেমে জানলার কাছে এসে দাঁড়াই। মানসীর চোখে জল। মানসী কাঁদছে। আমি?

আমি পারি নি কিন্তু মানসী পারে। এতো মানুষের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে সে আমার চোখ মুছিয়ে দেয়। আমার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। কান্না-মাখানো স্বরে বলে, "আমি তোমার সব কথা শুনবো, তুমি আমার একটা কথা রাখবে বলো।"

"রাখব।"

"নিজের শরীরের দিকে একটু নজর দিও। কলকাতায় ফিরে গিয়েই ভাল করে চিকিৎসা ক'রও। এখনও তোমার অনেক কাজ বাকি। তোমাকে যে আরও বড় হতে হবে।"

"তোমার কথা আমার মনে থাকবে মানসী।"

গার্ডের বাঁশি বেজে ওঠে। চমকে উঠি। পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এখুনি গাড়ি চলতে শুরু করবে। মানসী চলে যাবে আমাকে ছেড়ে। মানসী আমার হাতখানি দুহাতে আরও জোর করে ধরে।

গাড়ি চলতে শুরু করে। আমি মানসীর দিকে তাকাই। মানসী আমার দিকে তাকায়। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে থাকি। মানসী দুহাতে আমার হাত ধরে থাকে।

গাড়ির বেগ বাড়ে। মানসী আমার হাত ছেড়ে দেয়।

আমি পেছিয়ে পড়ি। মানসী এগিয়ে যায়। মানসী হাত নাড়ে। আমি হাত নাড়ি।

দূরে আরও দূরে। মানসী দূরে চলে যায়। মানসী অদৃশ্য হয়।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল নেই। খেয়াল হতে দেখি প্ল্যাটফর্ম প্রায় জনশূন্য। যাঁরা প্রিয়জনকে বিদায় দিতে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই চলে গেছেন ঘরে। আমি কেবল ঘরছাড়া, সঙ্গীহারা। মানসী চলে গেছে। আমি পড়ে আছি একা।

কিন্তু তাকে যে কোনমতেই আর ধরে রাখা সম্ভব ছিলো না। তেমন জোর করে বললে হয়তো সে থেকে যেতো, কিন্তু টেলিগ্রামটা পাবার পরে আমি কেমন করে ধরে রাখি ওকে। পকেট থেকে টেলিগ্রামটা বের করি। মানসীর দাদার টেলিগ্রাম—

'Father expired Come immediately.'

নেই। যাঁর জন্য মানসী আমাকে ফেলে চলে গেল, তিনি আর ইহলোকে নেই। যাঁর জন্য মানসী আপেল নিয়ে গেল, তিনি নেই। মানসীর বাবা আর নেই এ পৃথিবীতে।

এতো বড় দুঃসংবাদ আমি কেমন করে দেব তাকে? সব জেনেও আমি তাকে কিছুই জানাই নি। জানালে তার পক্ষে একা কলকাতায় ফেরা অসম্ভব হয়ে পড়ত। তাছাড়া কাঁদতে তো তাকে হবেই। আজও সে বলেছে, সংসারে বাবাই তার একমাত্র সম্বল। মানসীর জীবনের সেই অবলম্বন আর নেই। মানসী আজ সর্বহারা। তবু তার কান্নাকে দুটো দিনের মতো থামিয়ে রেখেছি আমি। তাকে টেলিগ্রামের কথা বলি নি।

কিন্তু মানসী বাড়িতে পৌঁছে যে একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়বে। সে যে কিছুই জানে না। হয়তো সে ট্যাক্সি থেকে নেমে 'বাবা' 'বাবা' বলে চিৎকার করতে করতে ভেতরে ঢুকবে। তার দাদারা এসে গেছেন, তাঁদের ঐ বেশে দেখে মানসী হয়তো অজ্ঞান হয়ে যাবে।

না, না, কাজটা ঠিক হয় নি। মানসীকে খবরটা দেওয়া উচিত ছিল। তাকে দু-এক দিন এখানে রেখে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতায় পাঠানো উচিত ছিল। অথবা আমার সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল।

এতো বড় ভুল আমি কেন করলাম? এতোখানি নির্দয় আমি কেমন করে হলাম?

এখন উপায়?

একটা কাজ করা যেতে পারে। আমি মানসীর দাদাকে একটা টেলিগ্রাম করে দিই। জানিয়ে দিই মানসী যাচ্ছে, তাঁরা যেন স্টেশনে লোক পাঠান। আর মানসীকে একখানি চিঠি লিখে দিই। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একখানি চিঠি লেখা আমার একান্তই প্রয়োজন।

কিন্তু……। ঠিকানা? মানসীর ঠিকানা?

মানসী তো তার ঠিকানা দিয়ে যায় নি আমাকে। আমি চেয়েছিলাম, সে বলেছিল দেবে। কিন্তু দেয় নি। আমিও চেয়ে রাখতে ভুলে গেছি।

চরম ভুল। হয়ত এ ভুলের মাশুল দিতে হবে সারা জীবন।

আশ্চর্য! সেদিন মানালীতে তার সঙ্গে দেখা হবার সময়ও যেমন ভাবতে পারি নি, মানসীকে আমি এতো আপন করে কাছে পাবো, আজ গাড়ি ছেড়ে দেবার সময়ও তেমনি ভাবতে পারি নি, মানসীকে আমি এমন করে হারিয়ে ফেলব।

এই বুঝি জগতের নিয়ম। না চাইতেই পায়—আবার পাওয়ার পরেও হারিয়ে যায়। মানসী হারিয়ে গেল।

কিন্তু মানসী বোধ হয় এই চেয়েছিল। আমি না হয় টেলিগ্রামটা পাবার পর থেকে বড়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। কোনমতে তার সামনে সহজ থেকেছি, অভিনয় করেছি। ফলে ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে ভুলে গেছি। কিন্তু মানসীর তো ভুল হবার কোন কারণ নেই। সে ইচ্ছে করেই তার ঠিকানা দেয় নি। সে যে বলেছিল—একসঙ্গে এই পথ চলার পালা পাঠানকোটে সাঙ্গ করে দিতে হবে। একে আমি কিছুতেই কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব না। কলকাতা বড়ই কঠিন।

তাই করেছে মানসী। সে হয়তো ভালই করেছে।

কিন্তু আমি? আমি এখন কি করব? যাকে একদিন দিনের আলোয় মানালীর মালঞ্চে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, আজ এই রাতের আঁধারে তাকে যে পাঠানকোট স্টেশনে ফেললাম হারিয়ে।

মানসী কি মিলিয়ে গেল? মানসী কি হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে?

নির্ঘণ্ট

কুলু উপত্যকা ভ্রমণের দিনপঞ্জী

১/৪	দিন	কলকাতা থেকে চণ্ডীগড়/পাঠানকোট অথবা শিমলা হয়ে মানালী (একদিন শিমলায় থাকা যেতে পারে)।
৫	„	মানালী দর্শন।
৬	„	রোতাং গিরিবর্ত্ম ভ্রমণ ও মানালীতে প্রত্যাবর্তন।
৭	„	মানালী থেকে নাগর দর্শন করে কুলু (সুলতানপুর)
৮	„	কুলু দর্শন
৯	„	বজৌরা ও মণিকরণ দর্শন করে কুলুতে প্রত্যাবর্তন।
১০	„	কুলু থেকে যোগিন্দর নগর
১১	„	বারোট ভ্রমণ করে যোগিন্দর নগরে প্রত্যাবর্তন।
১২	„	যোগীন্দর থেকে কাংড়া, পথে বৈজনাথ দর্শন।
১৩	„	কাংড়া থেকে পাঠানকোট, পথে জ্বালামুখী দর্শন।
১৪/১৬	„	পাঠানকোট থেকে কলকাতা।